ইসলাম ও হিন্দুধর্ম

এ.জেড.এম. শামসুল আলম

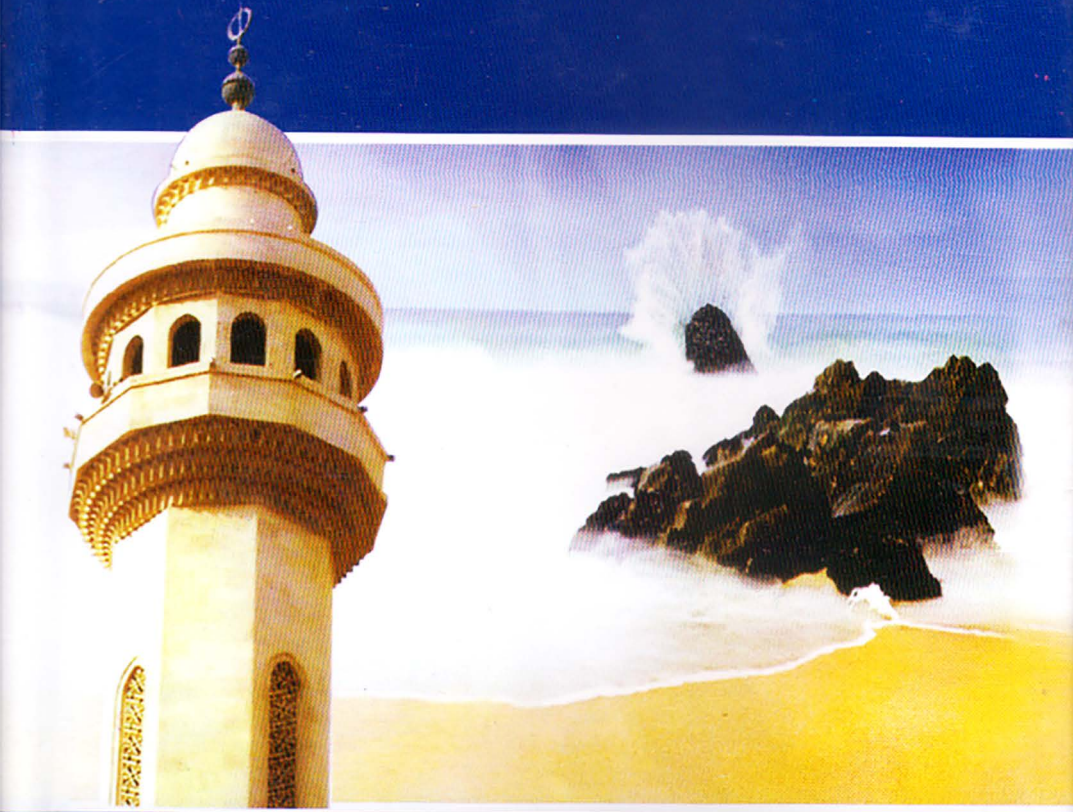

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম

(ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে পারস্পরিক জানা এবং
বুঝার সহায়ক গ্রন্থ)

এ.জেড.এম. শামসুল আলম

(গবেষক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, সাবেক সচিব)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম

(ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে পারস্পরিক জানা এবং বুঝার সহায়ক গ্রন্থ)

এ.জেড.এম. শামসুল আলম

মূল স্বত্ব ঃ আবূজর গিফারী লাওয়া ট্রাস্ট

প্রধান কার্যালয়

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩, মোবাইল ঃ ০১৭১১-৮১৬০০২

মতিঝিল কার্যালয়

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

মোবাইল ঃ ০১৭১১-৮১৬০০১

প্রকাশকাল

১ম প্রকাশ ঃ এপ্রিল/২০১১

২য় সংস্করণ ঃ জুলাই ২০১৫

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০

প্রচ্ছদ

ডিজাইন ওয়ান

পল্টন টাওয়ার

৮৭ পুরানা পল্টন লাইন (৮ম তলা) ঢাকা

ফোনঃ ৮৩৫০৮৪৫, মোবাইলঃ ০১৭৩০১৭৭৫৫৫

মূল্য ঃ ২২০/- (দুইশত বিশ) টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০

ফোন- ৬৩৭৫২৩, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০২

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

পিএবিএক্স- ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০১

১৫০-১৫২ গভ. নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫ ফোন-৯৬৬৩৮৬৩

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-ফোন -৯৫৭৪৫৯০

ISLAM O HINDU DHARMA by A.Z.M. SUMSUL ALAM, Published by: S.M. Raisuddin, Director Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000. Price: Tk.220.00 US : 8.00

ISBN. 984-70241-0028-3

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ সমবায়ের সর্বনিম্ন পর্যায়ের একটি প্রাথমিক সমিতি।

এটা প্রতিষ্ঠিত হয় ৩১-৮-১৯৪৯।

২০১০ সালে বাংলাদেশে প্রাথমিক সমবায়ের সমিতির সংখ্যা প্রায় ১৭১৪১৩ (এক লক্ষ একাত্তর হাজার চারশত তের) টি। তার মধ্যে একটি হলো বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ একটি সমবায় জগতে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ অনন্য সংস্থা। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তদানীন্তন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার নিয়াজ মোহাম্মদ খাঁন- আই.সি.এস.। তিনি একটি প্রাইমারী সোসাইটি স্থাপন করেই তার অবদান শেষ করেন নি। এই বুক সোসাইটির জন্য তিনি অকল্পনীয় অনুদানের ব্যবস্থা করে যান যা হতে এ সংস্থাটি ফলগুধারায় উপকৃত হচ্ছে।

এরূপ ব্যতিক্রমধর্মী অবদান আমার মনে হয় উপমহাদেশের আমলা জগতের অন্য কোন কর্মকর্তা দ্বারা সম্পাদিত হয়নি।

২০১১ সালে বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক তালিকায় আছে ১৫০ পুস্তকের নাম, লেখকের সংখ্যা ৯২ জন।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি শুধু বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পুস্তক প্রকাশ করে না। বিভিন্ন শিক্ষামোদি, ব্যক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করে। ২০০৫-২০০৬ ও ২০০৬-২০০৭ সালে অনুদানকৃত পুস্তকের সংখ্যা ছিল ৪০,৫২৪টি।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা বৃত্তি দিয়ে থাকে। নবীন লেখকদেরকে কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি বিভিন্নভাবে উৎসাহ দেয়। নিয়মিত লেখক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি মাল্টিপারপাস হলে অনুষ্ঠিত হয় লেখক সমাবেশ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি বর্তমান পরিচালক বৃন্দ অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ। কর্মচারী ও কর্মকর্তাবৃন্দ দায়িত্বশীল এবং কর্মঠ।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির আলোকে অনুরূপ আরো বহু বুক সোসাইটি গড়ে উঠুক, গবেষণা ও চিন্তা জগতে অবদান রাখুক, নিবেদিত প্রাণে এ কামনা করি।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির কর্মকর্তা কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্টদের কল্যাণ ও সাফল্য কমনায় আমার লেখা "ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম" শীর্ষক গ্রন্থটি তাদের উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা ও বিনয়ের সঙ্গে উৎসর্গ করা হলো।

এ.জেড.এম. শামসুল আলম
"ইসলাম ও হিন্দুধর্ম" গ্রন্থটির
অক্ষম লেখক।

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

প্রখ্যাত লেখক এ. জেড. এম. শামসুল আলম পরিচিত ইসলামী গবেষক এবং চিন্তাবিদ হিসেবে। তাঁর বহু গ্রন্থ পাঠক সমাদৃত হয়েছে। লেখকের রচনার একটি বৈশিষ্ট হচ্ছে কোন বিষয় তথ্য ও যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ করা এবং সহজবোধ্য ভাষায় পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপন করা।

"ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম" শীর্ষক পুস্তকটি পাঠকদের জন্যে লেখকের একটি নতুন ধরনের উপস্থাপনা। এ পুস্তকে তিনি ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের তথ্য, শিক্ষা, দর্শন, তত্ত্ব, ইত্যাদি উপস্থাপন করেছেন। এ বিষয়ে লেখায় আবুল হোসেন ভট্টচার্য এবং মুন্সি জমিরুদ্দীন ও মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ছিলেন আমাদের পথিকৃত। তাছাড়া আরো অনেকে এ বিষয়ে মূল্যবান অবদান রেখেছেন। লেখক এ বিষয়ে নবাগত। কিন্তু তাঁর লেখায় ধরণ ও বিশ্লেষণে নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায়।

ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের উপর রচিত পুস্তকটির পাঠক টার্গেট মূলত হিন্দু নয়, বরং মুসলিম সমাজ। লেখক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে হিন্দু ধর্ম বুঝতে চেয়েছেন এবং মুসলিম পাঠকদেরকে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে অবগত করাতে চেয়েছেন।

হিন্দু-মুসলিম প্রতিবেশীদের পারস্পরিক অধিকার এবং প্রতিবেশী সুলভ দায়িত্ব রয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী সাইয়েদেনা মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, প্রতিবেশী অভূক্ত জেনেও যারা ভরা পেটে আহার করে তাদেরকে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তায়ালার কাছে দায়ী হতে হবে। এ হাদীসে মুসলিমদের দায়িত্ব শুধুমাত্র মুসলিম প্রতিবেশী সম্পর্কে সীমিত রাখা হয়নি।

যে ধর্মাবলম্বীই হোক না কেন– হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলিম– প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর হক এবং দায়িত্ব রয়েছে। এ হাদীসটি সকল প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একই সমাজের বাসিন্দা হয়ে হিন্দু প্রতিবেশীদের প্রতিও মুসলিমদের অনেক দায় দায়িত্ব রয়েছে। এ দায়িত্ব কি আমরা মুসলিমগণ পালন করি !

অমুসলিমদেরকে ইসলাম সম্বন্ধে অবহিত করা কি মুসলিমদের দায়িত্ব নয়? এ পুস্তক হিন্দু ও মুসলিমদের ধর্ম বিশ্বাসের কি কি বিষয় পরস্পরকে অবহিত করতে হবে তার কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। অমুসলিমদের প্রতি মুসলিমদের দায়িত্ব পালন করতে হলে অমুসলিমদের ধর্ম সম্বন্ধে জানতে হবে। তাঁদের ধর্মবিশ্বাস ও মুসলিম বিশ্বাসের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে– তাও বুঝতে হবে। এ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন।

www.nagorikpathagar.org

এ পুস্তকে লেখক হিন্দু ধর্ম পাঠ কালে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে যা জেনেছেন তা প্রতিবেশী মুসলিমদেরকে জানাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর বুঝার মধ্যে ভুল ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। যদি তেমন কিছু ভুল থেকে থাকে, তা অমুসলিমগণই বেশী অনুধাবন করতে পারবেন।

আলোচ্য 'ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম' সম্পর্কীয় পুস্তকটি হিন্দু এবং মুসলিমদের পারস্পরিক আলোচনা ও দাওয়াতের ভিত্তি হিসেবে প্রভূত সহায়ক হতে পারে। আর যদি ধর্মীয় ব্যাপারে তেমন কোন ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তাহলে হিন্দুভাইগণ মৌখিক অথবা লেখার মাধ্যমে তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে লেখকের ভুল সংশোধনে সহায়তা করবেন আমরা আশা করি।

এ পুস্তকটি মুসলিম সম্প্রদায়কে হিন্দুদের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে অবহিত হতে অনেকাংশে সহায়ক হবে। হিন্দুগণ এ পুস্তক পাঠ করে বুঝতে পারবেন তাঁদের ধর্ম সম্বন্ধে একজন মুসলিমের ধারণা কতটুকু সঠিক এবং কতটুকু ভুল। ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞানতার কারণেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও দাংগা হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়।

আশা করা যায় ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরো অন্যান্য বহু পুস্তক রচিত হবে–যাতে ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক হিন্দুদের কাছে উপস্থাপন করা হবে।

যেহেতু লেখকের এ পুস্তকটি প্রধানত হিন্দু ধর্ম সর্ম্পকীয়, তাই মুসলিম পাঠকগণ হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে অবহিত হতে এবং জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে পাঠ করতে পারেন।

এ পুস্তকটি মুসলিমদের জন্য হিন্দু ধর্ম এবং হিন্দুদের জন্য মুসলিম ধর্ম তথা ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে জানার ও বুঝার সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এতে আশা করা যায়, হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি দূরীভূত হয়ে পারস্পরিক সুসম্পর্ক ঘটিত হবে ইন্‌শা আল্লাহ্‌।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

প্রথম ভাগ

ভূমিকা: ধর্মীয় পুস্তক পাঠের প্রয়োজনীয়তা

	প্রথম অধ্যায়	**১৭-৩৩**
১	হিন্দু ও মুসলিম ধর্মীয় সাদৃশ্য	১৭
২	বেদে ও আল-কুরআনে একই সুর	২৬
৩	আল-কুরআন এবং বেদ এর সাদৃশ্য	৩৩
	২য় অধ্যায়	**৩৮-৫৩**
৪	আল্লাহ্ ও ঈশ্বর	৩৮
৫	আল্লাহ্ তা'য়ালা ও পরমেশ্বর	৪২
৬	তাওহীদ ও একেশ্বরবাদ	৪৭
৭	ঈশ্বর নিরাকার	৫৩
	৩য় অধ্যায়	**৫৭-৭৬**
৮	কল্কি পুরানে মুহাম্মাদ (সা.)	৫৭
৯	কল্কি অবতার ও মুহাম্মাদ (সাঃ)	৬৪
১০	রাজা ভৌজ এবং অবতার মুহাম্মাদ (সা.)	৭২
১১	অগ্নি দেবতা	৭৬
	৪র্থ অধ্যায়	**৮০-১০০**
১২	ঋগবেদে নরাশংস মুহাম্মাদ (সা.)	৮০
১৩	ঋগ বেদে মামাহ ঋষি	৮৩
১৪	শুক্ল যজুর্বেদে নরাশংস মুহাম্মাদ (সাঃ)	৮৬
১৫	শুক্ল যজুর্বেদে উদার যোদ্ধা মুহাম্মাদ (সাঃ)	৯১
১৬	অথর্ব বেদে মামাহ ঋষি মুহাম্মাদ (সা.)	৯৬
১৭	অথর্ব বেদের কুন্তাপ মন্ত্রে মামাহ্ ঋষি	১০০
	৫ম অধ্যায়	**১০৬-১১০**
১৮	সামবেদে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)	১০৬
১৯	বেদ গ্রন্থে আহমাদ	১১০
	৬ষ্ঠ অধ্যায়	**১১৫-১২৩**
২০	ভবিষ্য পুরানে মুহাম্মাদ (সা.)	১১৫
২১	ভবিষ্য পুরানে বিশ্ব নবী	১১৯
২২	পুরানে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বর্ণনা	১২৩
	৭ম অধ্যায়	**১২৭-১৩৬**
২৩	ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম	১২৭

www.nagorikpathagar.org

২৪	বিশ্ব সভ্যতায় হিন্দু ধর্মের অবদান	১৩৪
২৫	হিন্দু ধর্মের ছয় (ষড়) দর্শন	১৩৬
	৮ম অধ্যায়	**১৪২-১৪৯**
২৬	হিন্দু জাতিভেদ প্রথা	১৪২
২৭	হিন্দু ধর্মের উপদল	১৪৭
২৮	হিন্দু ধর্মের সংস্কার আন্দোলন	১৪৯
	৯ম অধ্যায়	**১৫৪-১৬০**
২৯	মানব জাতির চার পর্যায়	১৫৪
৩০	জীবনের চতুস্তর	১৫৬
৩১	পরকাল ও পুনর্জন্মবাদ	১৬০
	১০ম অধ্যায়	**১৬৮-১৭৭**
৩২	হিন্দু ধর্মে নারীর মর্যাদা	১৬৮
৩৩	হিন্দু নারীর ধর্মীয় অধিকার	১৭১
৩৪	হিন্দু নারীর আর্থ-সামাজিক অধিকার	১৭৩
৩৫	বিধবা ও বাল্য বিবাহ	১৭৭
	১১তম অধ্যায়	**১৮০-১৮২**
৩৬	দেব দাসী প্রথা	১৮০
৩৭	সতীদাহ ও নরবলী	১৮১
৩৮	মৃত দেহ সৎকার	১৮২

দ্বিতীয় ভাগ

	১২তম অধ্যায়	**১৮৬-১৯৪**
৩৯	হিন্দু ধর্ম	১৮৬
৪০	হিন্দু শব্দের উৎস	১৯০
৪১	সনাতন ধর্ম ও একেশ্বরবাদ	১৯৪
	১৩তম অধ্যায়	**১৯৭-২০২**
৪২	ধর্ম গ্রন্থ বেদ	১৯৭
৪৩	বেদ এর শ্রেণী বিভাগ	২০০
৪৪	বেদের রচয়িতা ও সংকলন	২০২
	১৪তম অধ্যায়	**২০৫-২১০**
৪৫	ঋগ বেদ	২০৫
৪৬	উপনিষদ	২০৭
৪৭	পুরাণ	২১০
	১৫তম অধ্যায়	**২১৩-২১৫**

www.nagorikpathagar.org

৪৮	শ্রুতি, স্মৃতি ও বেদ	২১৩
৪৯	ঋগ বেদে সূরা আর রহমানের প্রতিধ্বনী	২১৪
৫০	৯৯ নাম বনাম ৯৯ গুন	২১৫
	১৬তম অধ্যায়	**২১৭-২২১**
৫১	ভগবত গীতা	২১৭
৫২	ভগবত গীতার মর্ম কথা	২১৮
৫৩	গীতা ও পুরাণে সৃষ্টি প্রক্রিয়া	২২১
	১৭তম অধ্যায়	**২২৭-২৩৩**
৫৪	পরমেশ্বর ব্রহ্ম পূজা	২২৭
৫৫	হিরণ্য গর্ভ ও ব্রহ্মান্ড	২২৮
৫৬	বিষ্ণু নারায়ন পূজা	২৩১
৫৭	তুলসী ও শালগ্রাম শীলা পূজা	২৩৩
	১৮তম অধ্যায়	**২৩৫-২৪১**
৫৮	মহাদেব শিব লিঙ্গ	২৩৫
৫৯	শিব লিঙ্গ পূজা	২৩৬
৬০	দূর্গা-কার্তিক পূজা	২৩৮
৬১	মহামায়া ভগবতী দূর্গা	২৪১
	১৯তম অধ্যায়	**২৪৩-২৪৭**
৬২	পূজা পার্বন	২৪৩
৬৩	বিভিন্ন প্রকার পূজা	২৪৫
৬৪	পূজা পদ্ধতি	২৪৭
	২০তম অধ্যায়	**২৫০-২৫৩**
৬৫	বৈদিক দেবতা পূজা	২৫০
৬৬	দেবতা পূজার বৈশিষ্ট্য	২৫২
৬৭	দেবতাদের বাহন পূজা	২৫৩
	২১তম অধ্যায়	**২৫৬-২৫৯**
৬৮	প্রকৃতি পূজা	২৫৬
৬৯	মূর্তি পূজা	২৫৮
৭০	গো-পূজা	২৫৯
	২২তম অধ্যায়	**২৬৩-২৬৮**
৭১	তীর্থ যাত্রা ও তীর্থ স্থান	২৬৩
৭২	এক লক্ষ নরক	২৬৫
৭৩	স্বর্গ	২৬৬
	গ্রন্থপঞ্জি	**২৬৮**

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

ধর্মীয় পুস্তক পাঠের প্রয়োজনীয়তা

প্রতিদিন অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষই কিছু না কিছু পাঠ করেন। পাঠ করা শিক্ষিত মানুষের স্বভাব এবং প্রকৃতি। পাঠ করতে না পারলে শিক্ষিত মানুষ অস্বস্তি অনুভব করেন। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা যেমন মানব প্রকৃতি এবং প্রয়োজন, পাঠ করাও তেমন শিক্ষিত মানব প্রকৃতি ও প্রয়োজন।

সাম্মখে পড়ার মত কিছু পেলে শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিমনা ব্যক্তির না পড়ার ইচ্ছা বা অনীহা অস্বাভাবিক। দৈনিক পত্রিকায় বহু ব্যক্তির ব্যক্তিগত অথবা প্রয়োজনীয় তথ্য থাকে না। তবু দৈনিক পত্রিকা পড়া যাদের অভ্যাস, তারা দৈনিক পত্রিকা হাতের কাছে পেলে বা সহজলভ্য হলে তা সংগ্রহ করে পড়তে চেষ্টা করেন। এটা হচ্ছে শিক্ষিত মানুষের একটি মমস্তাত্বিক প্রয়োজন।

পাঠ করা মানব প্রকৃতি

একজন শিক্ষিত মানুষ সমগ্র জীবনে বিভিন্ন ধরনের শত শত পুস্তক পাঠ করেন। একটি পুস্তকের সবগুলো পৃষ্ঠা পাঠ না করলেও আংশিক অনেকে পড়ে থাকেন। হাজার হাজার পুস্তক স্পর্শ করেছেন, পাঠ করেছেন–কিছু কিছু পাতা উল্টিয়েছেন, এমন বহু মানুষ পাওয়া যাবে–যে কোন শিক্ষিত সমাজে। কারো কারো পাঠকৃত পুস্তকের সংখ্যা হাজার হাজার অতিক্রম করে। শিক্ষিত মানুষের পুস্তক পাঠ করা মানব প্রকৃতির একটা বৈশিষ্ট্যই বলা যেতে পারে।

ধর্ম সম্পর্কীয় প্রবন্ধ, পুস্তক, পুস্তিকা একজন মুসলিম কেন পাঠ করবে? সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, জ্ঞান অন্বেষণে মুসলিমদের জন্যে হিন্দু ধর্মের বই পুস্ত ক পাঠ করার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই রয়েছে, এমন কি সীমাহীন। যারা ইসলাম ভিন্ন অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষ, মুসলিমদের সাথে তাদের সম্পর্ক কী? এ সম্পর্ক কি শুধু হিন্দুর সঙ্গে মুসলিমের সম্পর্ক? এক ধর্মাবলম্বীদের সাথে আর এক ধর্মাবলম্বীর সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত তা জানার জন্যই বিভিন্ন ধর্মের পুস্তক পাঠ করা অত্যাবশ্যক। এতে অনেক দিক থেকেই লাভবান হওয়া যায়।

আদমের আওলাদ

কোন মুসলিমের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, সকল মানুষ আদি পিতা হযরত আদম (আ.) এবং আদি মাতা হযরত হাওয়া (আ.) এর বংশধর। হিন্দুগণও আদম (আ.) এবং মা হাওয়া এর আওলাদ। মুসলিমগণ যেমন মানুষ, হিন্দু ধর্মীয় এবং অন্যান্য ধর্ম অনুসারীগণও মানুষ।

www.nagorikpathagar.org

হযরত আদম (আ.)-এর আওলাদ হিসেবে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃস্টান সকলেই ভাই ভাই। একজন আর এক জনের দুশমন নয়, বরং আদমের রক্তের সম্পর্কীয় স্বজন। সকল মানুষ রক্তিয় ভাই। আদি মানব আদম (আ.) এবং মনু এর বংশধরগণ মনুষ্য নামে খ্যাত।

মানবিক সম্পর্ক

মনুর বর্ণনা যা পাওয়া যায় তাতে ধারনা হয়, হিন্দু শাস্ত্রে বর্ণিত মনুর অপর নাম আল-কুরআনে উল্লেখিত নাম নুহ (আ.)। মুসলিমদের নবী নূহ (আ.) হিন্দু আদি পিতা মনু বা নুহু একই ব্যক্তি হওয়া স্বাভাবিক। আদি মানবের নাম যদি মুসলিমদের মতে আদম (আ.) এবং হিন্দুদের মতে মনু হয় অথবা অন্য যা কিছুই হোক না কেন, আদি মানুষের বংশধর হিসেবে সকল মানুষ পরস্পর ভাই বোন।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা আরো বেশী প্রয়োজন একটি বিশেষ কারণে। উপ-মহাদেশের মুসলিমদের পূর্ব পুরুষদের খুব কমই আরব তুরান থেকে এসেছিলেন। বর্তমান উপমহাদেশীয় মুসলিমদের মধ্যে যারা কৃষ্ণবর্ণীয় অথবা শ্যামবর্ণীয়, তাদের পূর্ব পুরুষগণ অনেকেই ছিলেন কৃষ্ণবর্ণ দ্রাবিড় জাতীয়। ইরানীয়ান এবং ভারতের আর্যদের গাত্রবর্ণ ছিল গৌর। এখনো ভারতীয় দ্রাবিড় এবং আর্যদের মধ্যে পার্থক্য অতি ব্যাপক। তাদের মধ্যে আন্ত গোত্র বিবাহ সীমিত।

পিতৃকূলের আত্মীয়

মুসলিমগণ সকল মানুষকে হযরত আদম (আ.) এবং মানব জননী হযরত হাওয়ার বংশধর মনে করায় সকল মুসলিমদের মধ্যে সাম্যের চেতনা অতি প্রবল এবং তাদের মধ্যে আন্ত গোত্র বিবাহ ব্যাপকতর। উপমহাদেশে মুসলিম আর্য এবং দ্রাবিড়দের আন্ত বিবাহের ফলে এক শঙ্কর নৃতাত্বিক জাতি স্বত্ত্বা সৃষ্টি হয়েছে। তাই একই পরিবারে একজন এখনো দ্রাবিড়দের মত কৃষ্ণ বর্ণীয়, অন্য জন আর্যদের ন্যায় ফর্সা।

হিন্দুদের প্রতি মুসলিমদের মমত্ব বোধ থাকা স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছনীয়। কারণ তারা শুধুমাত্র আদি আদম হাওয়ার আওলাদই নন, আরব, ইরান, তুর্কি, আফগানী আর্য এবং ভারতীয়দের বংশধর। তাদের সাথে আমাদের রয়েছে ঘনিষ্টতর রক্তের সুসম্পর্ক।

হিন্দু মুসলিমগণ মাতৃকূলের আত্মীয়

আফগান, তুর্কী, ইরানিয়ান এবং আরব মুসলিমগণ তাদের আদি বাসভূমির মরুময় উষ্ণতা এবং হিমালয়ের পাদমূলের শৈত্যতা ত্যাগ করে ভারতীয় ঐশ্বর্য এবং ভাগ্যের সন্ধানে উপমহাদেশে প্রবেশ করেন। তাদের অনেকেই পথে স্ত্রী ও নারীকুল সাথে নিয়ে আসেন নি। যারা আসতে চেষ্টা করেছিলেন তাদের অনেককেই বিপদসঙ্কুল পথযাত্রায় স্ত্রী, কন্যা– শুধু এ দেশীয় নয়, সহযাত্রীদের কাছেও কখনো কখনো হারাতে হয়।

www.nagorikpathagar.org

সুপুরুষ আর্য এবং ককেশীয় স্বামীদের সঙ্গে কৃষ্ণকায়া উপমহাদেশীয় নারীদের সাথে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। আরব, তুর্কী, ইরানী, তুরানীগণ ভারতীয় মুসলিমদের মাতৃসম্পর্কীয় আত্মীয় নয়, বরং, পিতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়। প্রাচীন ভারতীয় দ্রাবিড় ও আর্য হিন্দুগণ আমাদের মাতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়।

মাতুল এর পিতৃব্য

আধুনিক উপমহাদেশীয় সামাজিক পরিবেশ এবং সংস্কৃতিতে দেখা যায়– পিতৃব্য এবং পিতৃব্যপুত্র অপেক্ষা যে কোন মুসলিমদের মাতুল এবং মাতৃ সম্পর্কীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড়তর। কারণ পিতৃ সম্পর্কের আত্মীয়দের সাথে সম্পত্তির চুলচেরা ভাগ হয়। মাতৃ-প্রজাতি দেবর, ভাসুর অপেক্ষা ভ্রাতৃদের প্রতি ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে অধিকতর সহানুভূতিশীল।

স্বামীর সাথে সম্পর্ক হয় 'কবুল' জাতীয় এক শব্দে। আবার এ সম্পর্ক ভেঙ্গে যায় 'তালাক' জাতীয় শব্দে। কিন্তু কারো মাতুলের সাথে মাতার সম্পর্ক চিরন্তন এবং অবিচ্ছেদ্য। তাই মাতৃপ্রজাতি তাদের পিতৃসম্পত্তির অংশ ভাইদেরকে যত বেশী দিয়ে আসতে পারে ততই খুশী। অন্যদিকে পিতৃব্য পত্নী কি কি বেশী নিয়ে গেলেন এর হিসাবে মাতা অধিকতর সচেতন।

যেহেতু উপমহাদেশীয় হিন্দুদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক মাতৃ সম্পর্কীয়– তাই তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি সম্পর্কে মুসলিমদের অধিকতর উৎসাহ নেয়া প্রয়োজন। এটা আমাদের কর্তব্য এবং তাদের হক। আমি ব্যক্তিগতভাবে হিন্দুদেরকে সে দৃষ্টিতে দেখে থাকি।

এর সবচেয়ে বড় সাক্ষী হচ্ছে, আমার চাকুরী জীবনে আমার জুনিয়র হিন্দু সহকর্মীগণ। তাদের প্রতি আমার পারস্পরিক অনুভূতি এবং মমত্ববোধ ছিল অনেক ক্ষেত্রেই আমার বহু স্বধর্মীয়দের থেকে অধিক। তাদের মনুষ্যত্ববোধ ও মমত্বেও আমি ছিলাম বিমুগ্ধ।

আত্মার আত্মীয়

আমাদের পূর্ব পুরুষগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলে আমাদের অনেকেই উপমহাদেশীয় শুদ্রদের স্তরেই থেকে যেতাম। উপমহাদেশের হিন্দুগণ এ দেশীয় মুসলিমদের কারো না কারো দৈহিক আত্মীয়। তাদের সাথে আমাদের নেই ধর্মীয় বিশ্বাসের সম্পর্ক। কিন্তু রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। হিন্দুদের কাছে ইসলামের সাম্যের বাণী পৌঁছানো আমাদের উপর ফরয। ইসলাম কবুল করার পর তাঁদের প্রতি

www.nagorikpathagar.org

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মধুর সম্পর্ক স্থাপন এত সহজ যে পরবর্তী হাজার বছরেরও হিন্দু আর্যদের সাথে হিন্দু শুদ্রদের সম্পর্ক ততটুকু সহজ এবং সুমধুর হবে না।

হিন্দু মহাজাতি থেকে শিক্ষনীয়

হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ সমূহ পাঠ করতে হবে। কারণ, হিন্দুদের কাছে মানুষ হিসাবে আমাদের বহু শিক্ষনীয় বিষয় এবং অনুকরণীয় অনেক কিছু রয়েছে। হিন্দুগণ একটি বিরাট জাতি। মানব জাতির এক ষষ্টাংশ। আর একটি প্রাচীন জাতি এবং প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী। তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে জানার ইচ্ছা স্বাভাবিক।

স্বভাবতই হিন্দুদের ইতিহাস ঐতিহ্য এবং সভ্যতা থেকে আমাদের জানার অনেক কিছু রয়েছে। আরব মুসলিমদের সংখ্যা হিন্দুদের থেকে অনেক কম। আরব মুসলিমগণ খন্ড খন্ড ভাগে বিভক্ত। আরবী ভাষাভাষীগণ মুসলিম হয়েও এক থাকতে পারেন না, তারা বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত।

প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মীয় চেতনা হিন্দু অপেক্ষা মুসলিমদের মধ্যে প্রবল তর। ভারতীয় হিন্দুগণের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা থাকা সত্ত্বেও তারা একটি বিরাট দেশের অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারেন। কিন্তু, আরব মুসলিমগণ ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও সকল আরবদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ এবং এক রাষ্ট্রে অন্তর্ভূক্ত হওয়া সম্ভব হল না।

আরব মুসলিমগণ যদি এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হতে পারত তাদের পক্ষে একটি বিশ্ব শক্তি হওয়া সম্ভব হত। ধর্মের ভিত্তিতে ঐক্যবোধ হিন্দু ধর্মের নানান দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা থাকা স্বত্ত্বেও, হিন্দুদের মধ্যে পারস্পরিক রাজনৈতিক সম্পর্ক মুসলিমদের থেকেও গভীরতর।

উপমহাদেশীয় মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ

শুধু যে আরবদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য চেতনা নেই–তা নয়। ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে হিন্দুদের ন্যায় ঐক্য চেতনা নেই। ভারতীয় মুসলিমগণ দু'শত বছরের সংগ্রাম ও সাধনার ফলে স্বাধীনতা লাভ করেন। কিন্তু তাদের মধ্যে চিরন্তন ঐক্য দূরের কথা, এক সিকি শতাব্দীও পরস্পরের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত থাকা সম্ভব হল না।

বহুরূপ ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্য এবং বৈষম্য থাকা স্বত্ত্বেও ভারতীয় হিন্দুগণ তাঁদের জাতীয় সংহতি বজায় রাখতে সক্ষম হচ্ছে। এ বিষয়টি থেকে ভারতীয় মুসলিমদের জন্য শিক্ষণীয় অনেক কিছু রয়েছে। বাংলাদেশে পাকিস্তানী মুসলিমদের সাথে ঐক্যের কথা বললে কারো পক্ষে জীবিত থাকাও হয়ত সম্ভব হবে না। এমন ছিল বাঙ্গালী মুসলিমদের প্রতি পাকিস্তানী মুসলিমদের রাষ্ট্রীয়

www.nagorikpathagar.org

আচরণ। যাদের আঞ্চলিক এবং ধর্মীয় অনুভূতি ও ঐক্য চেতনা এরূপ– তাদের অবশ্যই হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে শিক্ষণীয় অনেক কিছু রয়েছে।

জাতীয় ঐক্য চেতনার শিক্ষা

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ধোপা, নাপিত, মেথর, ইত্যাদি নিম্নবর্ণের শুদ্রদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ এবং মর্মস্পর্শী। হিন্দু সমাজে যেরূপ অস্পৃশ্যতা এবং জাতিভেদ প্রথা রয়েছে–পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মধ্যে তা নেই। তা সত্ত্বেও বিশ্বের হিন্দুদের মধ্যে ঐক্যের চেতনা কি কারণে এবং কিভাবে এত গভীর হল– তা অনুধাবন করা এবং অবহিত হওয়া প্রয়োজন। ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য চেতনার কারণে–এ ধর্ম সম্পর্কে জানা উপমহাদেশীয় মুসলিম–তথা সমগ্র পৃথিবীর মুসলিমদের পক্ষে অবহিত হওয়া মুসলিমদের জাতীয় স্বার্থেই প্রয়োজন এবং প্রাসঙ্গিক।

কিছুই নিরর্থক সৃষ্টি নয়

মুসলিম দর্শনে পরম স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'য়ালা কোন কিছুই নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। সকল বস্তুই তিনি প্রাণীর কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। প্রাণীর প্রাণ এবং অনুভূতি রয়েছে। গ্রহ নক্ষত্রের প্রাণ নেই এবং অনুভূতিও নেই। এগুলো প্রাণীর সেবক। বস্তু সামগ্রীর ইচ্ছামত চলার ক্ষমতা নেই। প্রাণীদের প্রাণ আছে কিন্তু রূহ বা বিবেক নেই। যাদের বিবেক নেই তাদের বিচার হবে না।

হিন্দু ধর্ম তত্ত্ব মতে গ্রহ নক্ষত্রের শুধু যে প্রাণ আছে– তা নয়। প্রাণীর ন্যায় গ্রহ নক্ষত্রও দেব-দেবী হতে পারেন। এক্ষেত্রে কাল্পনিক গল্প উপন্যাস পাঠ অপেক্ষা মানব ইতিহাস পাঠ অধিকতর প্রয়োজন এবং কল্যাণকর।

মানবিক ধর্ম

মানুষ আদিতে আদম (আ.) অর্থাৎ সর্বপ্রথম মানব মানবীর ধর্মের অনুসারী ছিল। এ ধর্মকে মুসলিমগণ বলে ইসলাম। ইসলাম অর্থ শান্তি। ইসলাম শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হলো স্রষ্টার নিকট আত্ম-সমর্পন। সুখের ভিত্তি শান্তি। শান্তি না হলে সুখ হয় না। আনন্দ হয় না। মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'য়ালা কোন কিছুই নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। সকল কিছু মানুষ বিধিমত ব্যবহার করতে পারে, কোন কিছুই অপ্রয়োজনে ধ্বংস বা নষ্ট করতে পারে না।

মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষের রব বা প্রতিপালক। তাঁর বিধানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইনসাফ বা ন্যায়বিচার। সীমালঙ্ঘন পাপ। আদমের আওলাদকে আল্লাহ্ তা'য়ালা সীমালঙ্ঘনের ক্ষমতা দিয়েছেন। যারা সীমা লঙ্ঘনের অধিকার প্রাপ্ত– ঐ জাতির বিশেষ করে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিচার হবে।

www.nagorikpathagar.org

বস্তু, পশু ও মানব

পশু-পক্ষী অপেক্ষা সকল মানুষ পরস্পর অনেক বেশী নিকটবর্তী। হিন্দু ধর্ম মতে পশু ঈশ্বরের অবতার বা দেব-দেবী হতে পারেন। যেমন হয়েছে–মৎস, কচ্ছপ, বরাহ ইত্যাদিও অবতার। মানুষ তো তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ। চাঁদ, সুরুজ, গ্রহ-নক্ষত্র যত বিরাটই হোক না কেন প্রাণহীন। পশু, পক্ষী এবং তরুলতা অপেক্ষা গ্রহ নক্ষত্র নিম্ন স্তরের–এ অর্থে যে, পশু-পক্ষী এবং তরুলতার প্রাণ আছে। কিন্তু গ্রহ নক্ষত্রের প্রাণ নেই।

ইসলাম ধর্ম মতে কোন প্রাণী প্রাণহীন বস্তুর পূজারী হতে পারে না। কীট পতঙ্গের প্রাণ আছে। সোনা, রূপা, লৌহ, হিরকের প্রাণ নেই। অপ্রয়োজনে কীট পতঙ্গ হত্যা করলে পাপ হবে। সোনা, রূপা গলালেও প্রাণী হত্যার পাপ হবে না, অপচয় হতে পারে। কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষীর, প্রাণগত মর্যাদা স্বর্ণ ও হীরা থেকে অনেক বেশী।

সাহাবী-সুলভ নও মুসলিম

সাহাবীদের সাথে সামাজিক এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ আমাদের নেই। নও-মুসলিম শুদ্রগণ এবং নও-মুসলিম হিন্দুগণ সাহাবীদের প্রতীক। তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হলে বর্তমান যুগের পঁচা, গলা, অভিজাত বিত্তশালী মুসলিমদের নাজাতের উসিলা সহজলভ্য হতে পারে।

সাহাবীগণ ছিলেন নও মুসলিম। মুসলিমদের পক্ষে সাহাবীদের ন্যায় উচ্চ পর্যায়ের ও মর্যাদাসম্পন্ন মুসলিম হওয়া সম্ভব নয়। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পাঠের প্রয়োজনীয়তা হিন্দুদের যতটুকু প্রয়োজন, নাযাতের উসিলা হিসেবে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, পুরাণ, পাঠ করা মুসলিমদের অনেক বেশী প্রয়োজন। যারা বেদ পাঠ করেছেন, তাদের সন্দেহ হবে না যে, হিন্দু ধর্ম স্রষ্টার নাযিলকৃত ধর্ম। তবে মুসলিমদের ধারনা মতে তা খৃষ্ট ধর্মের মত বিকৃত ধর্ম।

ধর্মগ্রন্থ বিকৃতি

খৃষ্টীয় বাইবেলে থেকে হযরত আদম (আ.) পর্যন্ত বহু বর্ণনা রয়েছে। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর নাযিলকৃত কুরআনে প্রাচীন নবীদের সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। যে সমস্ত বিষয়গুলো নাযিল হয়েছে– তা থেকে ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মের কমন বিষয়গুলো যেভাবে কাটা-ছেঁড়া করে সচেতনভাবে পরিত্যাগ করা হয়েছে– বেদ-পুরাণ, উপনিষদে এরূপ সার্জারী করা হয়নি, বরং অনেক কম করা হয়েছে। তাই বেদ-পুরাণ এবং হিন্দু ধর্মগ্রন্থে আল্লাহ্ তা'য়ালার নাযিল করা কমন ধর্মের রূপরেখা যতটুকু পাওয়া যায়–তা হচ্ছে প্রকৃত আল্লাহ্ তা'য়ালা নাযিলকৃত ধর্ম বাণী।

www.nagorikpathagar.org

বেদের পরবর্তী হিন্দুধর্মগুলোকে বলা হয় বেদান্ত অর্থাৎ বেদের অন্ত বা পরবর্তী গ্রন্থ। বেদান্তে অনেক কাল্পনিক নতুন বিষয় যোগ করা হয়েছে। কিন্তু বাইবেলে ইসলাম এবং খ্রীষ্টান ধর্মের সামঞ্জস্যশীল বিষয়গুলো ব্যাপকভাবে বাদ দেয়া হয়েছে।

প্রত্যেক প্রাচীন ধর্মাবলম্বীগণ তাদের ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থ ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করেছেন। হিন্দুগণও তাই করেছেন। মানব সভ্যতা উন্নয়নের সাথে সাথে ধর্মীয় চিন্তাধারারও উন্নয়ন হয়েছে। ধর্মীয় গ্রন্থেরও উন্নয়ন এবং পরিবর্তন প্রয়োজন হয়েছে।

ধর্মীয় চিন্তার বিবর্তন

খ্রীষ্টান, ইয়াহুদ এবং হিন্দুধর্ম–এ তিনটি ধর্ম গ্রন্থের মধ্যে দেখা যায় মৌলিক ধর্মীয় চিন্তাধারারও বিবর্তন এবং উন্নয়ন হয়েছে। ধর্মীয় গ্রন্থেরও উন্নয়ন এবং পরিবর্তন প্রয়োজন হয়েছে। খ্রীষ্টান, ইয়াহুদ এবং হিন্দুধর্ম– এ তিনটি ধর্ম গ্রন্থের মধ্যে তা দেখা যায়। ইসলাম ধর্মীয় বিধি-বিধান বাইবেল অপেক্ষা বেদ-উপনিষদ এবং পুরাণে অনেক বেশী।

ইয়াহুদদের ওল্ড টেষ্টামেন্ট (পুরাতন নিয়মাবলী) বৌদ্ধদের ত্রিপিটক এবং খ্রীষ্টানদের নিউ টেষ্টামেন্ট (নতুন নিয়মাবলী) অপেক্ষা হিন্দু ধর্মে নতুনত্ব এসেছে- রামায়ণ মহাভারত যুগ থেকে পরবর্তী ধর্মগ্রন্থ সমূহে।

হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ প্রথায় ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে নতুন ধর্মীয় বিধিবিধান প্রবর্তিত হয়েছে। ইসলাম, খ্রীষ্টধর্ম এবং ইয়াহুদ ধর্মে নবী রাসূলদেরই নামের মধ্যে ঐক্য রয়েছে, কিন্তু কাহিনী এবং তত্বকথা ব্যাপকভাবে ওলট-পালট করা হয়েছে– শুধুমাত্র বংশ বিবরণী ছাড়া।

বেদ পাঠ করলে মনে হয়, হিন্দুধর্ম আল্-কুরআনে কথিত প্রাচীন ধর্মের একটি। মানব জাতি এবং মানব ইতিহাস যে এক সূত্র থেকে তা অনুমিত হয় কুরআন এবং পুরাতন বাইবেল বা নতুন বাইবেল এবং বেদ পাঠক হলে। হিন্দু ধর্মের প্রাচীন গ্রন্থাবলী পাঠ করলে তাদের সাথে মুসলিমদের ধর্মীয় আলোচনা অধিকতর অর্থবহ হওয়াই স্বাভাবিক।

ইনসানিয়াতের দাবী

এক ভাইকে সাহায্য করা অন্য ভাইয়ের উপর ফরয। এ ফরয আদায় না করা হলে আখিরাতে নাযাত পাওয়া যাবে না। এ তত্ব মহাজ্ঞানী মুসলিম মহাজনের। ওয়ালি বুযুর্গের। আর এ অভিমত হওয়া উচিত প্রত্যেক মুসলিমের আকলের। তার

www.nagorikpathagar.org

মেধার ও বোধশক্তির। অথচ, এ ফরয কর্তব্য আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী অবহেলা করে আসছি। এখনো তাই করছি।

আদিতে আদমের আওলাদের ধর্ম একই ছিল। আল্লাহ্ তা'য়ালা এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। সকল ইবাদত এবং পূজা পাওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার। অন্য সকল সৃষ্টি তাঁর নিকট উপকারপ্রাপ্ত। যারা স্রষ্টার কাছ থেকে সীমাহীন উপকার পেয়ে তা অস্বীকার করে–তাদের বিচার হবে এবং তাদেরকে শাস্তি পেতে হবে।

উপমহাদেশে হিন্দুধর্মীয় পুস্তক পাঠ করা মুসলিমদের জন্য ফরয। আদম (আ.) ছিলেন ইনসান। তাঁর জন্মগত ধর্ম ইনসানিয়াত। এক ইনসানকে অপর ইনসানের সাহায্য করা ইনসানিয়াতের দাবী।

www.nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়

১

হিন্দু ও মুসলিম ধর্মীয় সাদৃশ্য

ভারত উপমহাদেশীয় হিন্দু মুসলিম আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতির মধ্যে বহু বাস্তবতা রয়েছে– যার গুঢ় রহস্য বা হাকিকত এখনো অজ্ঞাত। এ সাদৃশ্যগুলো যে কোন চিন্তাশীল মানুষের মনে নানা প্রশ্নের উদ্রেক করতে পারে। অন্তত উৎসুক্য সৃষ্টি করবে। এ সাদৃশ্যগুলো কাকতালীও হতে পারে। অথবা গভীর তাৎপর্যপূর্ণও হতে পারে। আসল সত্য একমাত্র সীমাহীন কুদরতওয়ালা রাহমানুর রাহীম, মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'য়ালাই ভাল জানেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আদম (আ.)-এর আওলাদের বা বংশধরদের প্রতি মহান স্রষ্টার নির্দেশ হল–তাঁর (স্রষ্টার) সৃষ্টি সম্বন্ধে ফিক্‌র্ করতে, চিন্তা করতে, গবেষণা ও বিশ্লেষণ করতে এবং তাঁর কুদরত উপলব্ধি করতে। সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারলে রয়েছে মহাপুরস্কার। চিন্তা গবেষণা করে ভুল সিদ্ধান্তে আসলেও কিছু পূণ্য আছে, তবে আসল উদ্দেশ্য যদি সঠিক থাকে।

অতএব, আসল বিষয় হল–রাব্বুল আলামীনের উপর বিশ্বাস এবং ঈমান। ঈমান হারালে সব কিছুই শেষ। তাহলে মুসলিম বিশ্বাস মতে জন্মই বৃথা। শুধু বৃথাই নয়–আবাদান আবাদান অর্থাৎ অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করতে হবে জাহান্নামে বা নিকৃষ্টতম নরকে। কারো কারো মতে সবচেয়ে নিরাপদ পথ হচ্ছে এতো চিন্তা ভাবনা এবং গবেষণা না করে আল্লাহ্ তা'য়ালা যা নাযিল করেছেন তাতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং ঈমান সংরক্ষণ করা।

আরব ঐতিহ্যে হিন্দ শব্দ

আরবগণ ভারতবর্ষকে বলতেন হিন্দ। এ হিন্দ শব্দ থেকে উদ্ভুত হয়েছে হিন্দু এবং হিন্দুস্থান জাতীয় শব্দগুলো। আরবী ভাষায়ও হিন্দ এবং হিন্দা শব্দ রয়েছে। হিন্দ শব্দটি আরবদের কাছে ছিল অতি প্রিয়। সাইয়েদ সুলাইমান নাদভী (রা.) এর মতে হিন্দ শব্দটি আরবদের কাছে এত প্রিয় ছিল যে, তারা হিন্দ দেশটির নামে তাদের প্রিয় কন্যা সন্তানদের নাম পর্যন্ত রাখত।

হযরত আবূ সুফিয়ান পত্নী এবং সাহাবী হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর মাতার নাম ছিল হিন্দ, উচ্চারণ ভেদে হিন্দাহ। আরব কবিদের কাব্যে নায়িকার জন্য এ হিন্দ নামটি এরূপ মর্যাদা রাখে যেমন ফার্সি ভাষায় লাইলী-শিরিনের মর্যাদা। (সাইয়েদ সুলাইমান নাদভী, আরব আউর হিন্দ কি তায়াল্লুকাত, পৃষ্ঠা-১২-১৩)।

www.nagorikpathagar.org

সাতবার প্রদক্ষিণ

জন্মের পরে কোন মানুষের জীবনে অত্যন্ত শুভ এবং আনন্দঘন কর্ম হল বিবাহ। হিন্দুদের বিয়ে শাদী অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ হিসেবে বিবাহের প্রদীপ মালায় অগ্নি সংযোগ করা হয় এবং এ অগ্নির চারদিকে বর কনেকে সাতবার প্রদক্ষিণ করতে হয়। বলা হয় যে, বিয়ের বন্ধন মযবুত করার লক্ষ্যে অগ্নি দেবতার চারদিকে সাতবার ঘুরতে হয়। '৭' একটি বেজোড় সংখ্যা। একাধিকবার প্রদক্ষিণ করতে হলে তা তিনবার, পাঁচবার বা নয়বারও হতে পারত। কিন্তু সাতবার কেন ?

হজ্বের সময় হাজীগণ কাবা শরীফ তাওয়াফ করেন। তাওয়াফ কালে আল্লাহুর কাছে গুণাহ মাফের নিয়তে কাবার চারদিকে ঘুরে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে তাওয়াফের দোয়া পড়া হয়। কাবার চারদিকে তাওয়াফ বা বিশেষ পদ্ধতিতে ঘুরতে বা প্রদক্ষিণ করতে হয় সাতবার। এর মধ্যে হিন্দু মুসলিমের কমন বা সাধারণ ঐতিহ্যের কি ইঙ্গিত থাকতে পারে !

কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিয়ে খাদ্য খেলে ঐ পাত্র ব্যবহারের পূর্বে সাত বার বিসমিল্লাহ পাঠ করে ধৌত করে ব্যবহার করা যায়।

হজ্বের ইহরাম ও তীর্থ যাত্রীর পোষাক

হজ্বকালে হজ্বের পোশাক ইহরাম পড়তে হয়। ইহরাম হল দু'টুকরো বস্ত্র। এক টুকরা কাপড় দিয়ে নাভী থেকে হাঁটুর নীচে এবং টাকনুর উপর পর্যন্ত ঢাকতে হয়। আর এক টুকরা বস্ত্র বাম কাঁধের উপর এবং ডান কাঁধের নীচ দিয়ে বাম হাতের উপরে ছড়িয়ে দিতে হয়। ইহরামের নীচের অংশ হল সেলাইবিহীন লুঙ্গির বিকল্প। উপরের অংশ গায়ের চাদরের মত।

এক খন্ড ধুতি পরিধান অপেক্ষা দু'খন্ড ইহরাম পরিধান আরামপ্রদ। ধুতি, পাঞ্জাবী এবং চাদর পরিধান অপেক্ষা ইহরাম পড়তে কাপড়ও কম লাগে। ধুতি, পাঞ্জাবী, চাদর দেখতে প্রীতিকর হতে পারে।

হিন্দুগণ তীর্থকালে হাজার হাজার বছর এমন কি এরও বহু পূর্ব থেকে ইহরাম জাতীয় পোশাক পরিধান করে আসছেন। সেলাইবিহীন ধূতি এবং ইহরামের মধ্যে কি কোন সাদৃশ্য নেই? এ জাতীয় পোশাকটি শুধু মুসলিমদের কাছে নয়, হিন্দুদের কাছেও পবিত্র। দুটি ধর্মের পবিত্রতম পোশাক একই প্রকার হওয়ার তাৎপর্য কি?

পোশাকের পবিত্রতার ক্ষেত্রে হিন্দুগণ মুসলিমদের থেকে এগিয়ে আছে বলা যায়। ইহরাম মুসলিমগণ হজ্বের পরেই খুলে ফেলে। কিন্তু হিন্দুগণ এই এক টুকরা সেলাইবিহীন পোশাক জীবনভর পড়ে। তবে ইহরাম নামে নয়, ধুতি নামে।

www.nagorikpathagar.org

ধুতি এবং ইহরাম পড়ার ষ্টাইলের মধ্যে অবশ্য একটু পার্থক্য রয়েছে। মুসলিমগণ ইহরামের ন্যায় বস্ত্রের নীচের টুকরায় কোঁচা মারে না। কিন্তু হিন্দুগণ কোঁচা মেরে ধুতি পড়েন। এটা তাঁদের ধারণায় সৌন্দর্য বর্ধন করে। কোঁচা মারার ফলে ধুতি পড়ে চলাফেরায় সুবিধা হয়। যদিও দু'পায়ের নীচের দিক পূর্ণ আবৃত রাখার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

মুসলিমদের হজ্বের সময় সেলাইবিহীন ইহরাম জাতীয় পোশাক শুধু মুসলিম পুরষগণই পড়েন। হিন্দুগণ এ সেলাইবিহীন পোষাক মহিলাদের পোশাক হিসেবেও গণ্য করেছে। শাড়ীও সেলাইবিহীন ইহরামের বিকল্প। তবে হিন্দুদের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে সৌন্দর্য চেতনা মুসলিমদের থেকে অনেক প্রকট। তাই রঙিন শাড়ী ব্যতিক্রমধর্মী এবং অধিকতর সুন্দর। নান্দনিক কল্পনার প্রকাশ ও প্রতীক।

হজ্ব উমরাকালে মাথা মুন্ডন

পবিত্র মক্কা নগরীর হজ্ব এবং উমরা পালনের সময় পুরুষদের মাথা মুন্ডন আবশ্যক। পাশ্চাত্য প্রভাবিত দাসত্বমুলক বহু আচরণ আধুনিক মুসলিমগণ তাদের সংস্কৃতি এবং জীবন যাত্রায় অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। বহু আধুনিক মুসলিম ইসলামকে সামগ্রিক জীবন বিধান *(Complete Code of Conduct)* হিসেবে পালন করেন না। আমরা আধুনিক মুসলিমগণ আল্লাহুতায়ালা এবং রাসূলের (সা.) বিধানে মনে হয় কিছু কিছু সংশোধনী এনেছি। নাউজুবিল্লাহ!

এ থেকে মনে হয় হজ্ব উমরাও বাদ পড়েনি। উমরাকালে মাথা না কামিয়ে কেউ কেউ কেঁচি দিয়ে চুল ছাটান। একবার মাথা কামিয়ে ফেললে অবশ্য এক সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বার মাথা মুন্ডনের প্রয়োজনমত কেশরাজী দীর্ঘ হয় না। বর্তমানে কেঁচি দিয়ে কয়েক গন্ডা চুল কেটে ইহরাম কালে মাথা মুন্ডনের কাজটি কখনো কখনো সম্পন্ন করা হয়।

ইসলাম নতুন ধর্ম নয়। এর শুরু হযরত আদম (আ.) থেকে। হজ্ব অবশ্য শুরু হয় হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর পর। হিন্দুগণ দীর্ঘকাল পূর্ব থেকে তীর্থকালে মাথা মুন্ডন করে আসছেন এবং এ প্রথা এখনো প্রচলিত রয়েছে।

নাম রাখার সময় মাথা মুন্ডানো

মুসলিম সন্তান জন্মের পর আকিকার সময় শিশুদের নাম রাখা হয় এবং শিশুদের মাথা কামানো বা মুন্ডানো হয়। হিন্দুগণ লক্ষ লক্ষ বছর পূর্ব থেকেই, অন্ত ত আদিকাল থেকেই শিশুদের নামকরণ সংক্রান্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানকালে শিশুদের মাথা মুন্ডিয়ে দেন।

সন্তান জন্ম গ্রহণ করে দেহের স্বাভাবিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে। কিন্তু বেনামী অথবা নামহীন অবস্থায়। দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিরূপ হবে–তা নির্ধারণের স্বাধীনতা মহা

www.nagorikpathagar.org

শক্তিমান আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষকে দেননি। কিন্তু নাম কি হবে–ঐ স্বাধীনতা দিয়েছেন। আল্লাহ্র বান্দাগণ তাঁদের সন্তানদের যে কোন সুন্দর নাম দিতে পারেন। সেটা আল্লাহ্র কিতাবের শব্দ, জান্নাতের অপেক্ষারত মরহুম পূর্ব পুরুষদের নাম, আদর্শ অনুকরণ এবং অন্যান্য যে কোনরূপ বিষয় সংক্রান্ত হতে পারে।

এ নাম রাখার স্বাধীনতার মর্যাদা আমরা কতটুকু সংরক্ষণ করছি! মুসলিম সন্তানদের নামও টম, ডিক, হেরী, মন্টু, মিন্টু, সেন্টু, জাতীয় রাখা হয়। অর্থহীন এবং ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী নাম সন্তানদের দিতেও আমাদের অনেকের অরুচি হয় না! বিধর্মী মানুষ নয়, বিধর্মীদের কুকুর বিড়ালের নামেও সন্তানদের নামকরণে বহু আধুনিক মুসলিম এর হৃদয় আহত হয় না! আমাদের পবিত্র পূর্বসুরীদের অনুসৃত কুরআন হাদীসের শব্দ দিয়ে নাম রাখার মাথা ব্যথা নিবারণের সাধনায় আমরা অনেকেই আজকাল মশগুল।

হজ্ব ও তীর্থকালের পাদুকা

হজ্ব ও উমরার জন্য মক্কা শরীফ পৌঁছা পর্যন্ত জুতা পরিধান করা যায়। কিন্তু হজ্ব অথবা উমরাকালে স্বাভাবিক জুতা পড়ার অনুমতি নেই। জুতা এবং সেন্ডেলের মধ্যে পার্থক্য আছে। জুতা পরিধান করলে পায়ের উপরের অংশ ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু হজ্ব উমরাকালে এমন পাদুকা পড়তে হয়– যাতে পায়ের উপরের অংশ ঢাকা না থাকে।

হিন্দুদের তীর্থকালেও এমন পাদুকা পড়তে হয় যাতে পায়ের উপরের অংশ না ঢাকা পড়ে। তীর্থযাত্রায় যথাযথ পাদুকা হিসাবে খড়ম আবিষ্কার হয়েছে। কাঠের খড়মের উপরে খুঁটির মত আংটা থাকে– যাকে বয়লা বা বৈলা বলা হয়।

খড়মের উপরিভাগে সেন্ডেলের মত লেস বা নেয়ার থাকে না। লেসওয়ালা সেন্ডেল জুতারই আধুনিক সংস্করণ এবং ছোট ভগ্নি। স্পঞ্জ সেন্ডেল খড়মের যথাযথ বা নিকটবর্তী বিকল্প হতে পারে, কিন্তু চামড়ার সেন্ডেল নয়। পাদুকা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও হজ্বের অনুভূতি সংরক্ষণ এবং হজ্ব পরবর্তী জীবনে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তীর্থযাত্রী হিন্দুগণের থেকে মনে হয় আমরা মুসলিমদের কেউ কেউ হিন্দুদের অনেক পেছনে পড়ে আছি।

হিন্দুগণ হাজার বছর থেকে তীর্থযাত্রার সময় যে খড়ম পরিধান করতেন– তা বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজ শাসনের শেষ পর্যন্ত একই ধরণের পাদুকা বা খড়ম ব্যবহার করে আসছেন। কিন্তু মুসলিমদের ক্ষেত্রে হজ্ব এবং উমরার পাদুকার ব্যবহার সীমিত থাকে হজ্ব উমরার কাল এবং কাবার চত্বর পর্যন্ত।

হজ্ব সংক্রান্ত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মুসলিমদের জন্য যে সুন্নাত বা সংস্কৃতি পনের শত বছর পূর্বে চালু করেছিলেন–তা কি তিনি হিন্দুদের

www.nagorikpathagar.org

থেকে ধার করে নিয়েছিলেন অথবা অনুকরণ করে প্রবর্তন করেছিলেন? নাউজুবিল্লাহ্! আস্তাগফিরুল্লাহ্ !

পশ্চিমমুখী মন্দির/কাবামুখী কিবলা

মক্কার পূর্ব দিকের মসজিদের কিবলা পশ্চিমমুখী অথবা কাবামুখী। পশ্চিম কোন পবিত্র দিক নয়। সিরিয়া ও তুর্কি মুসলিমগণ তাদের মসজিদ পশ্চিমমুখী করে না। তারা নামায পড়ে দক্ষিণমুখী হয়ে। অনুরূপভাবে ইয়ামেনের মুসলিমগণ পশ্চিমমুখী হয়ে নামায পড়ে না। তাদের কিবলাও পশ্চিমমুখী হয় না। মরক্কো, তিউনিশিয়ার লোকেরা পূর্বমুখী হয়ে নামাজ পড়ে এবং তাদের মসজিদের কিবলা হল পূর্বমুখী। বিশ্ব মুসলিম সালাত আদায় করে কিবলামুখী হয়ে। পশ্চিমমুখী হওয়া সালাতের শর্ত নয়। তবে কিবলা যদি কোন স্থানের পশ্চিমে হয় তখনই পশ্চিমমুখী হয়ে সালাত আদায় করতে হয়।

মসজিদের দরজা

কিবলা যেদিকে হয় এর বিপরীতমুখী হয় মসজিদের প্রধান দরজা। উপ-মহাদেশের সকল মসজিদের দরজা হয় পশ্চিম মুখী যেমন হয় উপমহাদেশে কিবলা এবং পশ্চিমমুখী প্রবেশ পথ পূর্বমুখী। তবে মসজিদের পূর্ব দিকে যদি হাঁটার রাস্তাই না থাকে এবং মসজিদে প্রবেশ না করা যায়, তাহলে মসজিদের প্রধান প্রবেশ পথ উত্তরে দক্ষিণে অথবা পশ্চিমে হতে পারে।

মন্দিরের প্রবেশ পথ

উপ-মহাদেশের মন্দিরগুলোর প্রধান প্রবেশ পথ কোন দিকে ? এগুলো কি পূর্ব দিকে নয় ? উপ-মহাদেশের মসজিদগুলো কিবলামুখী এবং মন্দিরগুলো পশ্চিমমুখী বা কিবলামুখী। কেন মন্দিরগুলোর প্রবেশ পথ পূর্বদিকে? এর কোন ব্যাখ্যা হিন্দুদের কাছে নেই।

এর একমাত্র ব্যাখ্যা হল–তাদের পূর্বসুরীগণ যা করেছেন তারাও তা করছেন। তবে পূর্বসূরীগণ কেন তাদের মন্দিরগুলো পশ্চিমমুখী করছেন? তাদের পূর্বসূরীদের সাথে কি পশ্চিমের ধর্মগুলোর বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল?

বাংলা আসামের মন্দিরগুলো কাশী, গয়া অথবা পশ্চিমমুখী হতে পারে। কারণ বাংলা, আসাম, বিহার থেকে হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান গয়া, কাশি, পশ্চিম দিকে। কিন্তু, পাঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, অনধ্র, তামিলনাড়ু অথবা মধ্য ভারতের মন্দির গুলো পশ্চিমমুখী কেন ?

এ.জে.এ. ডিউবইস তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, বড় বড় মন্দিরের নির্মাণের ধরণ এবং ষ্ট্রাকচার সর্বস্থানে সম্পূর্ণ একই ধরনের। মসজিদগুলোর আকারে এবং

www.nagorikpathagar.org

ষ্ট্রাকচারে তেমন কোন ব্যতিক্রম নেই। সকল মন্দিরের সদর দরজা ভেতর দিক থেকে পূর্ব দিকে। এটা এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা সকল মন্দিরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মন্দিরগুলো ছোট হোক, বা বড় হোক প্রধান প্রবেশ পথ পূর্ব দিকে হওয়া সম্পর্কে তেমন কোন ব্যতিক্রম বা বৈচিত্র নেই। *(A.J.A. Dubois Hindu, Manners, Customs & Ceremonies, p-579).*

হিন্দুস্থানের মসজিদ বা মন্দির অযোধ্যায় হোক বা অন্ধ্রে হোক, কলিকাতায় হোক বা কালিকটে হোক, নির্মিত হয়েছে পশ্চিমমুখী করে।

উলু বা অল্লু ধ্বনি

হিন্দু ধর্মমন্দিরে মন্ত্র পাঠ করে দেবতাকে আবাহন বা বরণ করে নেয়াকালে যে সম্বর্ধনা ধ্বনি উচ্চারিত হয়– তা "উলু ধ্বনী" নামে পরিচিত। একাধিক ব্যক্তি এক সাথে উলু ধ্বনিকালে "উলু" "উলু" শব্দ সজোরে উচ্চারন করে থাকেন। কোন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অথবা বিশিষ্ট অতিথির আগমন মুহূর্তে নাম ঘোষণা করে তাঁর জন্য জয়ধ্বনি, দীর্ঘজীবি ধ্বনি বা জিন্দাবাদ ধ্বনি দেয়া হয় সমবেত কণ্ঠে।

মন্দিরে দেবতার আগমন কামনা করে উলুধ্বনি উচ্চকণ্ঠে দেয়া হয়। একক ভাবেও উলুধ্বনি দেয়া যায়। উপমহাদেশে মন্দিরে উলু দেয়া হয় পূজার পূর্বে, পূজাকালে এবং পূজা সমাপ্তির পর। কোন স্থানে উলু উলু শব্দ শ্রবণ করলেই মনে করতে হবে হিন্দুধর্মীয় বা পবিত্র কিছু সেখানে করা হচ্ছে।

আরব মুলুকের কোন কোন অংশে বিশেষ করে আফ্রিকায় উলু, উল্লু, অল্লু, অল্লো শব্দরাজীকে হয়ত আল্লাহু শব্দের বিকল্প ধরে উলু দেয়া হয়। উপমহাদেশীয় মুসলিমদের একটি ধারণা এটা যে, উলু দেয়া হিন্দু ধর্মীয় কাজ বা অনুষ্ঠান। তাই মাসজিদে বা মুসলিম অনুষ্ঠানে, স্থানে বা মুসলিম গৃহে উলুধ্বনি দেয়া হয় না।

কোন কোন আরব দেশে মুসলিম ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বা ধর্মীয় স্থানে উলু উলু শব্দ করে উলু দেয়ার নিয়ম বা বিধান অতীতে ছিল এবং বর্তমানেও আছে। আরব দেশ সমূহে উলু দেয়া ইসলাম ভিন্ন অন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মনে হয় করে না। আরব দেশে হিন্দু নেই বললেই চলে। হিন্দুদের পূজা করে উলু দেয়ার বিধি এখনো আরবে চালু হয়নি। কিন্তু এ কাজটি স্বচ্ছন্দে সউদি আরব ভিন্ন বহু আরব মুলুকে মুসলিম গণ করে থাকেন।

এ প্রবন্ধের লেখক চারি ইমামের অন্যতম এবং শাফি'ঈ মাজহাবের মূল ব্যক্তিত্ব ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শাফি'ঈ ইবন ইদরিস (রা.) (১৫০-২০৪ হি/৭৬৭-৮২০ খ্রী) এর মাযারে মুসলিম মেয়েদের উচ্চকণ্ঠের উলু ধ্বনি শ্রবণে প্রথমে হকচকিয়ে যান।

www.nagorikpathagar.org

পরে অবগত হন যে, উলু উলু শব্দ করে উলু দেয়া তথায় মুসলিম ধর্মীয় সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ। বিশ্ববিখ্যাত আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব বলয়ে কায়রো শহরের সীমানায় ফুস্তান নামক স্থানে ইমাম শাফি'ঈ (রা.) এর মাযার অবস্থিত।

বেদ এবং উপনিষদে আল্লাহু সংশ্লিষ্ট কয়েকটি শব্দ হল– "অল্লু, উলু "উল্লু", ইল্লল", "উল্লাল", "অল্লোহ" " অল্লো", "অল্লাম" "ইল্লাল্লেতি, ইল্লাল্লে" ইত্যাদি।

"অল্লোপনিষদ" শীর্ষক উপনিষদ হিন্দুধর্মীয় একটি বিখ্যাত পবিত্র গ্রন্থ। এতে আছে "অল্লো জ্যেষ্ঠং পরমং পুর্নং ব্রাহ্মানং অল্লাম। অল্লো রাসূল মহমদ-কং বরস্য অল্লো আল্লাম। আদুল্লাহ বুকমে একম অল্লাবুক নিখাতম" শ্লোকাবলী।

এগুলোর ভাবার্থ হচ্ছে– "পরম আল্লাহু জ্যেষ্ঠ। আল্লাহ পূর্ণ ব্রাহ্মণ, সর্বজ্ঞানী। মহমদ (মুহাম্মাদ) আল্লার রসূল। আল্লাহু আলোকময়, অক্ষয়। তিনি এক। চির পরিপূর্ণ এবং স্বয়ম্ভু।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি সমূহ থেকে অনুমিত হয়, আর্য ঋষিগণ ধ্যানবলে মহানবীর জন্মের হাজার হাজার বছর পূর্বেই রাসূলুল্লাহ মুহম্মাদ (সা.) মহানবী (সা.) সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হয়েছিলেন।

কোন কোন মিশরীয়দের মতে উলু শব্দটির মূল উৎস হল ইলাহ। আল্লাহু শব্দটির উৎসও ইলাহ। ইলাহ এর সাথে আল যোগ হল আল-ইলাহ। এর পর আল-ইলাহ আরবী ব্যাকরণের বিধিমত সন্ধিযোগে হয়ে গেল আল্লাহু।

এখন আরবী ভাষায় আল্লাহু যেমন আছে, আল্লাহু, ইলাহ্, ইলাহী, ইত্যাদিও তেমন আছে। উলু শব্দ মূলে যদি ইলাহ্ বা আল্লাহু হয়ে থাকে– তাহলে সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারণ বিবর্তনে উলু শব্দটি ক্রমশ হয়ে গেল আল্লা, অল্লো, অল্লু, উললু, উলু, ইত্যাদি। এ ধরনের বিবর্তন সত্য না হলেও অনেকে সম্ভব মনে করেন।

এতে তো কারো সন্দেহ নেই যে, হিন্দুগণও মুসলিমের মত ছিলেন হযরত আদম (আ.)- এর মা হাওয়ার আওলাদ। আমাদের মূল উৎস এবং আদি পিতামাতা তো ছিল ঐ দু'জনই। কালের বিবর্তনে আমরা বহু আসল বা মূল সত্য হারিয়ে নকলকে আকড়ে ধরে আছি। অত শক্ত করে বহু বাতিলকে এমনভাবে আকড়ে ধরে আছি যে, বাতিল এবং নকলই হয়ে গেছে আমাদের বিশ্বাস, ঈমান এবং ইয়াকিন।

কবর ও চিতা

মুসলিমদের কবরগুলো উপমহাদেশে থাকে উত্তর দক্ষিণমুখী। মৃত ব্যক্তির কবরে মাথা থাকে উত্তর দিকে। লাশের পা থাকে দক্ষিণ দিকে। লাশের মুখটা সাধারণত ডান কাঁধের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হয়। ফলে দেহ উত্তরমুখী থাকলে

www.nagorikpathagar.org

দৃষ্টিটা কাবার দিকে থাকে। লক্ষ্য হল–কাবার দিকে তাকিয়ে থাকলে আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হতে পারে।

হিন্দুদের চিতায় যখন মৃত দেহের লাশ পোড়ানোর জন্য তোলা হয়, তখন চিতার উপরে লাশের মাথা থাকে উত্তরমুখী এবং পা থাকে দক্ষিণমুখী।

উপরে হিন্দু এবং মুসলিমদের মধ্যে কয়েকটি সাদৃশ্যের উল্লেখ করা হল। হিন্দু এবং মুসলিমদের আচার আচরণে আরো বহু সাদৃশ্য রয়েছে। হিন্দুগণ এ সাদৃশ্যের বিষয়গুলো জানতে পারলে এবং চিন্তা করলে দাবী করতে পারেন যে, আমাদের প্রিয় রাসুলুল্লাহ্ সা. এগুলো চৌদ্দশত বছর পূর্বে হিন্দু ধর্মীয় বৈশিষ্ট থেকে ধার করেছিলেন। নাউযুবিল্লাহ! আসতাগ ফিরুল্লাহ্!

বাস্তবতা হল, আসল হিন্দু ধর্মের সাথে আল্লাহু তা'য়ালা এবং ইসলামের সম্পর্ক রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর অনুসারীদের অনুসৃত ইসলামের চেয়ে অনেক পুরানো। হিন্দুগণ যে হযরত আদম (আ.)-এর হাওয়ার বংশধর–তা কি আমরা অস্বীকার করতে পারি?

একটি রূঢ় বাস্তবতা হল, হযরত আদম (আ.)-এর ইসলামের সাথে হিন্দুদের সম্পর্ক ইয়াহুদ-নাসারা এবং বর্তমান মুসলিমদের সম্পর্ক হতে পুরানো। হযরত আদম (আ.) এবং নূহ (আ.) এর বহু রীতিনীতি মুসলিমগণ অবলম্বন করে চলেছেন। ইয়াহুদ নাসারাগণ তা তাদের ধর্মীয় বিধান এবং কৃষ্টি থেকে ধুয়ে মুছে বাদ দিয়েছেন। এমন কি আমাদের রাসূলের নাম মুহাম্মাদ এবং আহমাদ শব্দদ্বয় পর্যন্তও বাদ দিয়েছেন তাদের আধুনিক ধর্মগ্রন্থ হতে। হিন্দুগণই একমাত্র ধর্মীয় সম্প্রদায় যারা মূল ইসলামের কিছু কিছু প্রাচীন ঐতিহ্য অপসংস্কৃতি রূপেও সংরক্ষণ করছেন।

ডান দিক থেকে লেখার সংস্কৃতি

বাংলা, ইংরেজী, ফ্রেন্স, জার্মান, গ্রীক, ল্যাটিন, ইত্যাদি ভাষাসমূহ লেখা হয় কাগজের পৃষ্ঠার উপর বাম দিক থেকে ডানে। কিন্তু আরবী, পার্শি, উর্দু লেখা শুরু হয় ডান দিক থেকে বামে। ভারতের অতি প্রাচীন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যখ্যাত মৌর্য বংশের অন্ধরায় আবিস্কৃত প্রাচীনকালীন অক্ষরগুলো আরবী অক্ষরের ধাচে ডান দিক থেকে শিলালিপিতে লিপিবদ্ধ আছে।

তৎকালীন মৌর্য ভাষার নাম আরাম বা আরামী যা প্রাচীন আরবী ভাষার একটি লুপ্ত রূপ। সম্রাট অশোকের ফলকগুলো আরবীর ন্যায় ডান দিক থেকে লিখিত।-(প্রফেসর ড, মুহাম্মাদ আহমাদ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আরবী পার্শি বিভাগ, এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি, "ইসলামে কামিল ফারা", করাচী, জানুয়ারী ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা-১১)।

www.nagorikpathagar.org

আরবে হিন্দুস্তানীদের বসতি

হিন্দুস্তানের কয়েকটি গোত্র আরবে বসতি স্থাপন করেছিল। এ গোত্রগুলোকে আরবগণ বলতেন হামরা, আহামি, আহমিরা, হুমার, হুমায়রা ইত্যাদি। এ শব্দগুলোর অর্থ লোহিত বা লাল বর্ণ। এ শব্দগুলো ছিল গোত্রের উপাধি। আন্দালুসিয়া বা মূরদের স্পেনের সবচেয়ে সুন্দর প্রাসাদটির নাম আল-হামরা প্রাসাদ। অর্থাৎ লোহিত বা লাল বর্ণ এর প্রাসাদ। -(কাজী আতহার মুবারকপুরী, নারজিল সে নাখিল তক, মা'আরিফ ঃ ৫/৮৯)।

হিন্দুগণ সর্বশেষ নবীর উম্মাত মুসলিমদের থেকে অনেক প্রাচীনতর জাতি। আল্লাহ্ তা'য়ালা সকল জাতি বা কওমের কাছে নবী প্রেরণ করেছিলেন। আরব ভাষা-ভাষী অঞ্চলে প্রাচীন নবীদের নাম আল্-কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর বহু অংশে প্রেরিত নবীদের নাম আরবীতে নাযিলকৃত কুরআনে উল্লেখ নেই। যেহেতু অন্যান্য কওমে পেরিত নবীদের উল্লেখ আল-কুরআনে নেই, তাই তাঁদের কাছে নবী আসেননি এবং নবীদের শিক্ষার কিছুই অবশিষ্ট নেই– একথা আমরা বলতে পারি না।

বেদ গ্রন্থসমূহ মূলত তাওহীদ জাতীয় গ্রন্থ। শিরক এবং বহু ঈশ্বরবাদ প্রবর্তিত হয়েছে বেদের অন্ত বা শেষে এবং পরবর্তীতে রচিত বেদান্ত, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা এবং পুরাণ গ্রন্থসমূহে।

১৪০০ বছরের মধ্যে ইসলাম ধর্মে যতটুকু বিকৃতি আমরা ঘটিয়েছি এর ধারা যদি চলতেই থাকে, তবে মনে হয় লক্ষ লক্ষ বছর ধরে হিন্দুদের মধ্যে আল্লাহ্র পছন্দ করা বিধি-বিধান ও সংস্কৃতি যতটুকু আছে মুসলিমদের মধ্যে ইসলামী বিধান ততটুকুও হয়ত থাকবে না। অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা যা ইচ্ছা করেন তাই হয়।

পবিত্র আল-কুরআনের আয়াত সাথে সাথে লিপিবদ্ধ না হলে অথবা শুধু শ্রুতি, স্মৃতি বা হিফয এর মধ্যে সীমিত থাকলে বর্তমানকালে ইসলামের স্বরূপ কী যে হত তা কল্পনা করলে দেহ শিহরিত হয়ে উঠার কথা। আল-কুরআনের একটি মাত্র শব্দ 'খাতাম' এ একটি স্বর চিহ্ন নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়ে শেষ নবুওয়াতের মত মৌলিক বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টির সুযোগ ঘটেছে।

বেদগ্রন্থসমূহ বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দুগণ হলেন আল্লাহ্ তা'য়ালার নাযিলকৃত কিতাব এবং শরীয়তপ্রাপ্ত প্রাথমিক একেশ্বরবাদী জাতি এবং মুসলিমগণ হলেন সর্বশেষ নাযিলকৃত ও শরীয়তপ্রাপ্ত তাওহিদী জাতি। মনবতার সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ শরীয়তপ্রাপ্ত জাতির সমাবেশ ঘটেছে ভারতীয় উপমহাদেশে। (মাওলানা শামসু নাভেদ উসমানী ঃ আগার আব বী না জাগে তু, রোশনী পাবলিশিং হাউজ, বাজার নাসরুল্লাহ খান, রামপুর, ইন্ডিয়া, ২৪৪৯০১)।

www.nagorikpathagar.org

২
বেদ ও আল্-কুরআনে একই সুর

আল্-কুরআন এবং বেদ যদি একই সর্বশক্তিমান পরম দয়ালু প্রভু থেকে নাযিলকৃত গ্রন্থ হয়ে থাকে, তাহলে দুটির মধ্যে গড়মিল বা অমিল থাকার কথা নয়। সাদৃশ্য থাকাই স্বাভাবিক। সৃষ্টির আদিতে আদমের পুত্র ও কন্যার মধ্যে বিবাহ হত। তবে একই প্রজন্মে বা একই সাথে জন্ম গ্রহণকারীদের মধ্যে নয়।

কালের বা অবস্থার পরিবর্তনের কারণে বি-সাদৃশ্য বা গড়মিল মামুলি কিছু হয়ে থাকে, তা আল্লাহু তা'য়ালা বা মহান স্রষ্টার অভিপ্রায় কল্পনা করা যেতে পারে। মানুষের কল্পনায় ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে। ভ্রান্তি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। ইংরেজী প্রবাদে বলা হয় To err is Human অর্থাৎ ভুল মানুষেরই হয়।

বেদ রচিত হয়েছে সম্ভবত পাঁচ-দশ হাজার বছর পূর্বে। তখনো লেখার শিল্প হয়ত আবিষ্কার হয়নি। বেদের বাণী মানুষের কর্ণ থেকে কর্ণে এবং কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে "শ্রুতি" এবং "স্মৃতি" হিসেবে পরিভ্রমণ করে পরবর্তী বংশধরদের কাছে এসেছে। তাই বেদের অপর দু'টি নাম হল শ্রুতি এবং স্মৃতি।

হাম্‌দ ঃ আল্লাহু তা'য়ালার প্রশংসা

আল্-কুরআনে বলা হয়েছে– আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহু তা'য়ালার জন্য।-(আল্-কুরআন, সূরা ফাতিহা, আয়াত-১)। ঋগবেদে বলা হয়েছে– সমস্ত প্রশংসা এই পৃথিবীর স্রষ্টার জন্য।-(ঋগবেদ, মন্ডল-৫, সুক্ত-৮১, শ্লোক-১)।

পরম দয়ালু এবং দাতা

আল্-কুরআনে বলা হয়েছে– আল্লাহু তা'য়ালা রাহমানির রাহিম। অর্থাৎ তিনি পরম দয়ালু, সদা দয়াবান রাব্‌ব্।-(সূরা ফাতিহা, আয়াত-২)। ঋগবেদে বলা হয়েছে– ঈশ্বর পরমদাতা এবং মহাদয়াবান।-(ঋগবেদ, মন্ডল ৩, সুক্ত ৩৬, শ্লোক ১)।

সিরাতুল মুস্তাকীম ঃ সরল পথ

আল্-কুরআনে বলা হয়েছে–ইহ্ দিনাস সিরাতুল মুস্তাকীম। অর্থাৎ আমাদের কে সহজ, সরল পথ প্রদর্শন করুন হে প্রভু! (সূরা ফাতিহা, আয়াত-৫)। যজুর্বেদে বলা হয়েছে–আমাদের উপকারার্থে আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করুন। (যজুর্বেদ, সুক্ত ৪০, শ্লোক ১৬)।

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বের মালিকানা ও রাজত্ব

আল্-কুরআনে বলা হয়েছে– নবমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের সকল রাজত্ব শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালারই। আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের আর কোন খাঁটি বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই।-(আল-কুরআন সূরা বাকারা, আয়াত-১০৭)।

ঋগবেদে বলা হয়েছে–আকাশ মন্ডলী এবং মহাবিশ্বের মালিক হে পরমেশ্বর! আমাদের সাহায্য করুন। (ঋগবেদ, মন্ডল ১, সুক্ত ১০০, শ্লোক ১)।

মহা স্রষ্টা

আল্-কুরআনে বলা হয়েছে–তিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। (আল্-কুরআন, সূরা ফোরকান ২৫, আয়াত-২)। অথর্ববেদে বলা হয়েছে– পরমাত্মা সকল প্রজা বা সৃষ্ট জীব ও বস্তু সৃষ্টি করেছেন। (অথর্ববেদ, মন্ডল ৭, সুক্ত ১৯, শ্লোক ১)।

কল্যাণমূলক ব্যয়

আল্-কুরআনে বলা হয়েছে– ব্যয় করো তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য। (আল্-কুরআন, সূরা তাগাবুন-৬৪, আয়াত-১৬)। ঋগবেদে বলা হয়েছে– ঈশ্বর একজন। ঈশ্বর দানকারীদের জীবিকা বা প্রাপ্য বৃদ্ধি করে দেন।-(ঋগবেদ, ১-৮৪-৭)।

আল্-কুরআনে বলা হয়েছে– যদি তোমরা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান কর– তিনি তোমাদের জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন।-(আল-কুরআন, সূরা তাগাবুন (৬৪), আয়াত-১৭)।

রিযক দাতা

আল্-কুরআনে বলা হয়েছে- তিনি (আল্লাহ্ তায়ালা) আহার্য দান করেন। কিন্তু, কেউ তাকে আহার্য দান করতে পারে না।-(আল-কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত-১৪)। ঋগবেদে বলা হয়েছে– পরমাত্মা পানাহার করেন না। তিনি সৃষ্টির পানাহারের ব্যবস্থা করেন।-(ঋগবেদ, ১-১৬৪-২০)।

স্রষ্টা তুলনাহীন

কোন কিছু আল্লাহ্ তা'য়ালার সাদৃশ্য নয়। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্ব দ্রষ্টা।-(আল-কুরআন, সূরা শুরা, আয়াত-১১)। যজুর্বেদে বলা হয়েছে– পরমেশ্বরের কোন মূর্তি বা সদৃশ্য হতে পারে না।-(যজুর্বেদ, ৩২-৩)। কিন্তু বর্তমানে মূর্তি ছাড়া পূজা কল্পনা করা কষ্টকর।

সর্ব দিকের প্রভু

আল্-কুরআনে বলা হয়েছে– পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই। যে দিকেই মুখ ফেরাও না কেন সেদিকই আল্লাহ্র দিক। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ।-(আল-কুরআন, সূরা বাকারা ২, আয়াত-১১৫)।

www.nagorikpathagar.org

ঋগবেদে বলা হয়েছে– সর্ব দিক ঈশ্বরেরই।-(ঋগবেদ, মন্ডল ১০, সুক্ত ১২১, শ্লোক ৪)। ঋগবেদে আরো বলা হয়েছে–পৃথিবীর স্রষ্টা সর্বত্র বিরাজমান। পূর্ব, পশ্চিমে, উপরে, নীচে– সর্বত্র।-(ঋগবেদ, ১০ মন্ডল, ৩৬, সুক্ত, ১৪ মন্ত্র)। ঋগবেদে আরো বলা হয়েছে– ঈশ্বরের নয়ন সর্বদিকে। -(ঋগবেদ, মন্ডল ১০, সুক্ত ৮১, শ্লোক, ৩)।

নৈকট্য

আল-কুরআনে বলা হয়েছে– আমি (আল্লাহ্) তার (মানুষের) গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।-(আল্-কুরআন, সূরা কাফ্ ৫০, আয়াত ১৬)। ঋগবেদে বলা হয়েছে–হে প্রভু ! তুমি আমাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী ও রক্ষাকারী।-(ঋগবেদ, ৫-২৪-১)।

আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন– তা ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই মানুষ আয়ত্ব করতে পারে না। তাঁর কুরসী (আসন) আকাশ ও পৃথিবীরময় পরিব্যাপ্ত। এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন।-(আল-কুরআন, সূরা বাকারা ২, আয়াত ৩৪; সূরা লুকমান ৩১, সূরা বাকারাহ ২, আয়াতুল কুরসী-২৫৫)।

ঋগবেদে বলা হয়েছে– আকাশ ও পৃথিবী ঈশ্বরকে বেষ্টন (আয়ত্ব) করতে পারে না। তাঁর সীমা পেতে পারে না– নব-মন্ডল অথবা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় মেঘ। তাঁর সমকক্ষ এবং ব্যতিক্রম শুধু তিনি। তিনি ছাড়া আর কেউ তাঁর ন্যায় সৃজনের ক্ষমতা রাখে না।-(ঋগবেদ, ১-৫২-১৪)।

নৌযান

আল-কুরআনে আছে, আল্লাহ্র অনুগ্রহে নৌযানগুলি সমুদ্রে বিচরণ করে।-(সূরা লুকমান, ৩১ঃ৩১)। ঋগবেদে বলা হয়েছে– ঈশ্বর সমুদ্রের নৌযানগুলোর গতি সম্পর্কে অবহিত। (ঋগবেদ, ১-১৫-৭)।

প্রতিদান

যারা চিরকৃতজ্ঞ আমার বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ আমি তাদেরকে পর্যাপ্ত পুরস্কৃত করে থাকি।-(আল-কুরআন, সূরা কামার, আয়াত-৩৫)। ঋগবেদে বলা হয়েছে– "পরম ঈশ্বর সৎ কর্মশীলদেরকে উত্তম ফল প্রদান করেন। এটা তাঁর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য" (ঋগবেদ, ১-১-৬)।

অহংকার ও বিনয়

অবশ্যই আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাম্ভিক এবং অহংকারীকে।-(আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত-৩৬)। ঋগবেদে বলা হয়েছে– মানবের কর্তব্য সত্য পথে বিনয়ের সঙ্গে চলা।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাতা

আল্লাহ্ তা'য়ালা অবহিত যা কিছু আছে আকাশ মন্ডলীতে এবং ভূ-মন্ডলে। আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সম্যক অবহিত।-(সূরা হুযুরাত ৪৯ ঃ আয়াত ১৬)।

ঋগবেদে বলা হয়েছে– মহান ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বে যা আছে, সব কিছুই ভালভাবে জানেন।-(ঋগবেদ, ১০-১৮৭-৪)।

আল্-কুরআনে বলা হয়েছে– তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য– সব কিছু আল্লাহ্ তা'য়ালা জানেন। তোমরা যা অর্জন কর– তাও তিনি অবহিত।-(সূরা আন'আম ৬, আয়াত-৩)।

অথর্ববেদে বলা হয়েছে– যে দাঁড়ায়, যে চলে, যে ধোঁকা দেয়, যে আত্মগোপন করে, যে অন্যকে কষ্ট দেয়, যে দু'জন মানুষ গোপনে কথা বলে– ঈশ্বর তৃতীয় সত্ত্বা হিসাবে তাদের সকল বিষয়ে অবহিত থাকেন।-(অথর্ববেদ, ৪-১৬-২)।

আল্লাহ্ জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা হতে বহির্গত হয়। তিনি অবহিত আকাশ থেকে যা কিছু নামে এবং আকাশে যা কিছু উত্থিত হয় (সূরা হাদীদ ৫৭, আয়াত ৪)।

সর্বশক্তিমান

আল্-কুরআনে বলা হয়েছে– আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী। তিনি প্রজ্ঞাময় ও জ্ঞাতা (সূরা আনআম-৬, আয়াত-১৮)।

ঋগবেদে বলা হয়েছে–তিনি সকল প্রাণীর উপর প্রবল এবং পরাক্রমশালী।-(ঋগবেদ, মন্ডল ১০- সুক্ত ১৯- শ্লোক ২)।

উপকারী বায়ু

আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সু-সংবাদবাহী, সু-সংবাদরূপে বায়ু প্রেরণ করেন। তিনি আকাশ হতে বিশুদ্ধ বায়ু প্রেরণ করেন।-(সূরা ফোরকান ২৫, আয়াত ৪৮)।

ঋগবেদে বলা হয়েছে– ঈশ্বর উপরে বিক্ষিপ্ত আনন্দদায়ক বায়ুপথগুলো অবহিত। তিনি সেসব বিষয়ে অবহিত যেগুলো তাঁর আশ্রয়ে থাকে।-(ঋগবেদ. মন্ডল ১- সুক্ত২৫- শ্লোক ৯)।

দিবা-রাত্রি

আল্লাহ্ তা'য়ালা সৃষ্টি করেন রাত্রি ও দিবসকে– পরস্পরের অনুগামীরূপে।-(সূরা ফোরকান ২৫, আয়াত ৬২)। আল্লাহ্ রাত্রিকে দিবসে এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন। ঋগবেদে বলা হয়েছে– ঈশ্বর দিবা এবং রাত্রি সৃষ্টি করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

চন্দ্র-সূর্য

সূরা আনআমে বলা হয়েছে– আল্লাহ্ বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। (আল্-কুরআন, সূরা আনআম-৬ ঃ ৯৬)।

ঋগবেদে বলা হয়েছে– পূর্বে সৃজিত বস্তুগুলোর ন্যায় সৃষ্টিকর্তা চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করেছেন।-(ঋগবেদ, মন্ডল ১০-সুক্ত ১৯০-শ্লোক ৩)।

বিশ্ব জগতের প্রতিপালক

আল্লাহ্ বলেন– সকল সৃষ্টি ও আদেশ তাঁরই। মহিমাময় বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'য়ালা।

যিকর ও প্রার্থণা

তোমরা বিনীতভাবে এবং গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক। তিনি যালিমদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা আরাফ-৭, আয়াত-৫৪-৫৫)।

ঋগবেদে বলা হয়েছে– ঈশ্বর উপাসনার যোগ্য। আকাশ ও পৃথিবীকে সঠিক পথে পরিচালনাকারী পরমেশ্বরের নিকট সবিনয়ে হস্ত উত্তোলন করে প্রার্থনা কর।-(ঋগবেদ, মন্ডল ৬-সুক্ত ১৬-শ্লোক ৪৬)।

বৃহত্তম

মহান আল্লাহ্ সর্বোচ্চ এবং মর্যাদাবান।-(সূরা রাব-১৩, আয়াত-৯)। অথর্ববেদে বলা হয়েছে–ঈশ্বর অতি প্রকান্ড।-(অথর্ববেদ, মন্ডল ২০- সুক্ত ৫৮- শ্লোক ৩)।

অপরিবর্তনীয় নির্দেশ

আল্লাহ্র বাণীর কোন পরিবর্তন নেই।-(সূরা য়ুনূস–১০. আয়াত-৬৪)। ঋগবেদে বলা হয়েছে–ঈশ্বরের বিধির কোন পরিবর্তন হয় না।-(ঋগবেদ, অধ্যায় ১- সুক্ত ২৪-শ্লোক ১০)।

সূরা ফাতহে্ বলা হয়েছে– তুমি আল্লাহ্র বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না।-(সূরা ফাতহ্-৪৮, আয়াত-২৩)। অথর্ববেদে বলা হয়েছে–ঈশ্বরের বিধিকে কেউ বদলে দিতে পারে না।-(অথর্ববেদ, অধ্যায় ১৮-সুক্ত১-শ্লোক ৫)।

মন্দ কর্মের ফল

সূরা নাযমে বলা হয়েছে–আকাশ মন্ডলীতে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্রই। যারা মন্দ কাজ করে তিনি তাদেরকে দেন মন্দ ফল। যারা সৎ কাজ করে, তাদেরকে দেন উত্তম পুরষ্কার।-(সূরা নাযম-৫৩, আয়াত-৩১)।

ঋগবেদে বলা হয়েছে– হে প্রভু! নবমন্ডল ও ভূ-মন্ডল তোমার ভয়ে কম্পিত। হে ঈশ্বর! তুমি স্বীয় অস্ত্রে দুস্কৃতকারীদেরকে প্রহার কর। সৎ কর্মশীলদের জন্য আধ্যাত্মিকতার মাহাত্ম প্রতিষ্ঠিত কর। (ঋগবেদ, অধ্যায় ১- সুক্ত ৮০-শ্লোক ১১)।

www.nagorikpathagar.org

সর্বজ্ঞাতা

সূরা হাদীদে বলা হয়েছে–তিনি (আল্লাহ্) আদি। তিনি অন্ত। তিনি ব্যক্ত। তিনি গুপ্ত। তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।-(সূরা হাদীদ্-৫৭, আয়াত-৩)।

ঋগবেদে বলা হয়েছে–হে পরমেশ্বর! তুমি অনাদি। তুমি সবচেয়ে বেশী জ্ঞানের অধিকারী। (ঋগবেদ, অধ্যায় ১- সুক্ত ৩১-শ্লোক ২)।

হক ও বাতিল

সূরা বাকারায় আল্লাহ্ বলেছেন– দ্বীন (ধর্ম) সম্পর্কে কোন জোর যবর-দস্তি নেই। সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সু-স্পষ্ট হয়েছে। যে তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহ্তে ঈমান আনবে সে এমন এক মযবুত হাতল ধরবে যা কখনো ভাঙ্গবে না। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারা-২, আয়াত-২৫৬)।

যজুর্বেদে বলা হয়েছে– ঈশ্বর সত্য ও মিথ্যার স্থিতি অনুধাবন করে সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করে দিয়েছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, মানব মন্ডলী সত্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। বাতিলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (যজুর্বেদ, অধ্যায় ১৯- শ্লোক ৭৭)।

বে-আকল

আল্-কুরআনে প্রশ্ন রাখা হয়েছে– তোমরা কি মানুষকে সৎ কর্মের নির্দেশ দাও। আর নিজদিগকে বিস্মৃত হও ! অথচ তোমরা আল্লাহ্র কিতাব অধ্যয়ন কর। তোমরা কি বোঝ না ? (সূরা বাকারা-২, আয়াত-৪৪)। তুমি কি দেখনা আল্লাহ্ রাত্রিকে দিবসে এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন ?

ঋগবেদে বলা হয়েছে– নির্বোধ লোকগুলো গ্রন্থ পাঠ করেও বুঝে না। শুনেও শোনে না। (ঋগবেদ, ১০-৭১-৪)।

অমূল্য ধন

আল কুরআনের সূরা বাকারায় বলা হয়েছে– আমি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমরা ঈমান আন। এটা তোমাদের কাছে যা আছে–এর প্রত্যয়নকারী। তোমরাই এর প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়ো না। আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করো না। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।-(আল্-কুরআন, সূরা বাকারা-২, আয়াত-৪১)।

ঋগবেদে বলা হয়েছে– হে অনন্ত, একচ্ছত্র, ক্ষমতাশীল প্রভু ! তুমি এতই মূল্যবান যে, আমি তোমাকে কোন মূল্যেই ছাড়ব না। না হাজারের জন্য। না লাখের জন্য। না শত সহস্র পার্থিব পুরস্কারের জন্য।-(ঋগবেদ,অধ্যায় ৮-সুক্ত ১-শ্লোক ৫)।

www.nagorikpathagar.org

প্রতিদান ও প্রতিফল

আল্লাহ্ বলেন– কোন ব্যক্তি অপরের বোঝা বহন করবে না।-(সূরা নায্‌ম-৫৩, আয়াত-৩৮)। যজুর্বেদে বলা হয়েছে– কাজ করতে থাক। তুমি এর ফল ভোগ করবে।-(যজুর্বেদ, অধ্যায় ২৩, শ্লোক ১৫)।

আত্মপীড়ন

আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন যুলুম করেন না, বরং মানুষই নিজেদের উপর যুলুম করে থাকে।-(সূরা য়ুনূস-১০, আয়াত-৪৪)।

ঋগবেদে বলা হয়েছে–হে একচ্ছত্র ক্ষমতাশীল সু-মহান পরমেশ্বর ! আমরা স্বীয় অজ্ঞতার ফলে বিভ্রান্ত হয়ে যাই। তুমি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর।-(ঋগবেদ, মন্ডল ৭-সুক্ত ৮৯-শ্লোক ৩)।

দানশীলতা

সূরা আল-ইমরানে বলা হয়েছে–তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পূর্ণত্ব লাভ করবে না। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।-(সূরা আল-ইমরান-৩, আয়াত-৯২)।

ঋগবেদে বলা হয়েছে– য স্বীয় কামাই একাই ভক্ষণ করে সে প্রকৃত পক্ষে পাপ ভক্ষণ করে।-(ঋগবেদে, ১০-১১৭-৬)।

ব্যয় ও দান

সূরা আলে-ইমরানে বলা হয়েছে– যারা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল– আল্লাহ্ সে সব সৎ কর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।-(আল্-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত ১৩৪)।

ঋগবেদে বলা হয়েছে– যে গরীব এবং অভাবী ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য দান করে সেই দানবীর। তার কল্যাণ হয়। তার শত্রুও তার বন্ধু হয়ে যায়।-(ঋগবেদ, মন্ডল ১০-সুক্ত ১১৭- শ্লোক ৩)।

ইয়াতিম ও অভাবগ্রস্তকে প্রত্যাখ্যান

সূরা মাউনে বলা হয়েছে– দ্বীনকে অস্বীকারকারী তো সেই, যে ইয়াতিমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়। অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না। দুর্ভোগ সে সালাত আদায়কারীদের জন্য।-(আল কুরআন, সূরা মাউন-১১৭, আয়াত-২,৩)।

ঋগবেদে বলা হয়েছে– কঠোর হৃদয় ব্যক্তি দয়ার যোগ্য পিতৃহীন রুটি অন্বেষীকে নিজের কাছে রুটি থাকা স্বত্ত্বেও সাহায্য করে না। বরং পাষাণ হৃদয়ে নিজেই খেতে থাকে, দুর্দশা এলে তার ভাগ্যে কোন আরাম জোটে না।-(ঋগবেদ, মন্ডল ১০, সুক্ত, ১১৭, শ্লোক ২)।

www.nagorikpathagar.org

৩

আল-কুরআন এবং বেদ এর সাদৃশ্য

মানব জাতির প্রাচীন ধর্মগুলোর মধ্যে প্রধান ধর্ম হচ্ছে- (১) ইয়াহুদ ধর্ম, (২) হিন্দু ধর্ম, (৩) জৈন ধর্ম, (৪) বৌদ্ধ ধর্ম, (৫) খৃস্টান ধর্ম এবং (৬) ইসলাম ধর্ম। বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম অন্যান্য ধর্ম থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। হিন্দু ধর্ম, ইয়াহুদ ধর্ম, খৃস্টান এবং ইসলাম ধর্মের মূল উৎস হচ্ছে-পরম স্রষ্টা- যিনি এক এবং একক। যিনি অদ্বিতীয় এবং যাঁর দ্বিতীয় নেই।

হিন্দুধর্মের মূল নাম হিন্দু নয়। এ নামটি ইউরোপীয়ানদের দেওয়া। মূল নাম ছিল-বৈদিকধর্ম। বৈদিক শব্দটির মূল উৎস হলো-অনুসারীদের অনুসৃত বেদগ্রন্থ সমূহ।

তৌরাত (পুরাতন নিয়ম, Old Testament), ইঞ্জিল (বাইবেল, New Testament) এবং অন্যান্য মূল গ্রন্থসমূহে তাদের অতি উৎসাহী অনুসারীগণ উৎসাহবশতঃ অথবা উদ্দেশ্যবশতঃ ব্যাপক সংস্কার ও পরিবর্তন এনেছেন। আধুনিকতার মোহ তাদের ধর্ম বিশ্বাসকেও আবৃত করে ফেলেছে।

প্রতি শতাব্দীতেই দেখা যায়-ধর্ম গ্রন্থের মূল ভাষার মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়। মানুষের বিশ্বাসের মধ্যেও পরিবর্তন আসে। তা হয় গবেষণা ও জ্ঞানের প্রসার, বিভিন্ন আবিষ্কার এবং অভিজ্ঞতার আলোকে।

অধিকাংশ ধর্ম গ্রন্থগুলোকে উন্নততর জ্ঞানের আলোকে সংস্কার বা আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। এ পরিবর্তনের বিষয়, প্রয়োজনীয়তা এবং যৌক্তিকতা প্রত্যেক ধর্মের সকল অনুসারীগণও স্বীকার করেন না।

অপরিবর্তনীয় ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন

ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে বিষয়টি স্বতন্ত্র। পরিবর্তন এবং সংশোধন করা হলে- মূল বিশ্বাস এবং চেতনা হারিয়ে যাওয়ারই সম্ভাবনা থাকে। মুসলিমগণ বিশ্বাস করে- আল্-কুরআনের একটি বাক্য বা শব্দ দূরের কথা, একটি অক্ষর বা স্বর চিহ্ন পরিবর্তনের কোন অধিকার অনুসারীদের নেই।

মৌলিক বিষয়ে সংস্কার, পরিবর্তন, সংশোধন এবং সংযোগের ফলে দেখা যায়- বাইবেল এবং কুরআনের মধ্যে পার্থক্য যত বেশী- কুরআন এবং বেদের মধ্যে তত বেশী নয়। অনুরূপভাবে পুরাতন নিয়ম (তৌরাত) এর সাথে কুরআনের সাদৃশ্য ব্যাপক। বেদের বিষয়বস্তুর সঙ্গেও আল্-কুরআনে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। বৈসাদৃশ্য ব্যাপকতা লাভ করেছে রামায়ন, মহাভারত, পুরাণ, উপনিষদ, ইত্যাদি গ্রন্থে।

www.nagorikpathagar.org

খৃস্টানগণ তাদের মূল কিতাব তৌরাত (পুরাতন নিয়ম), ইঞ্জিল (বাইবেল/নতুন নিয়ম) এর মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন এনেছেন। ইঞ্জিল বা বাইবেলে এ পরিবর্তনের ধারা এবং মাত্রা প্রবল। কিন্তু কুরআনের মধ্যে পরিবর্তন না আনার ফলে কুরআন এবং বাইবেল কিতাবের পারস্পরিক সাদৃশ্য যতটুকু–তৌরাত এর সাথে কুরআনের সাথে সাদৃশ্য অনেক বেশী।

কুরআনের সঙ্গে তৌরাত এবং ইঞ্জিলের সাদৃশ্য যতটুকু আছে, তা থেকে কুরআনের সঙ্গে বেদের মিল অনেক বেশী। এরও কারণ রয়েছে। ইয়াহুদ এবং খৃস্টানগণ তাদের ধর্মীয় এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোকে– তাদের তৌরাত এবং ইঞ্জিলের মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেছেন।

হিন্দু ধর্মে পরিবর্তনের দমকা হাওয়া

হিন্দুগণ মূল বেদ গ্রন্থসমূহে পরিবর্তন এনেছেন। তবে, তা ততটুকু বেশী নয়। এরও কারণ রয়েছে। হিন্দু ঋষিগণ চারটি বেদ সংশোধনের পরিবর্তে বেদের পরবর্তী পর্যায়ে উন্নয়ন করেছেন বেদান্ত, উপনিষদ এবং ১৮ টি পুরাণ গ্রন্থ। আর দুটি মহাগ্রন্থ বা মহাকাব্য। এ দুটি ধর্মীয় মহাকাব্য হলো– রামায়ন এবং মহাভারত। এ দুটোতে শুধু তৎকালীন ধারনা মতে নয়, বর্তমানে আজগুবি বলা যেতে পারে– এমন বহু তথ্য আছে।

বেদ এর পরবর্তী হিন্দু ধর্ম গ্রন্থগুলো যেহেতু বিভিন্ন মুণি ঋষিগণ উন্নয়ন এবং সংস্কার করেছেন–এর ফলে এ গুলোতে পরিবর্তন বেশী এসেছে– যতটুকু আসেনি ইঞ্জিল এবং তৌরাতে।

ইলাসপদ

ঋগবেদে 'ইলাসপদ' একটি শব্দ আছে। ইলাসপদ অর্থ ইলাহ এর স্থান। স্পদ অর্থ স্থান অথবা পদ রাখার স্থান। ইলাসপদ অর্থ ইলা অথবা স্রষ্টার পদ স্থান। এ শব্দদ্বয় আছে ঋগবেদে।-(ঋগবেদ অধ্যায় ৩, স্তুতি স্তাবক ২৯, শ্লোক-৪)। Monier M. Williams তার সংস্কৃত ইংরেজী অভিধানে ২০০২ সনে লিখেছেন– ইলাসপদ অর্থ হচ্ছে–তীর্থের নাম অথবা তীর্থ যাত্রার স্থান।

নভা, প্রাথবি ও কাবা

নভা এবং প্রাথবি নামক দু'টি শব্দ বেদে আছে। নভা অর্থ হচ্ছে– কেন্দ্র। প্রাথবি শব্দের অর্থ হচ্ছে– পৃথিবী। নভা প্রাথবি শব্দের অর্থ হলো– পৃথিবীর কেন্দ্র বা নাভি। মুসলিমগণ মক্কায় অবস্থিত কাবা শরীফকে মনে করে কেন্দ্র অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্র। পৃথিবীর কেন্দ্র স্থানটি ইসলাম ও হিন্দু উভয় ধর্মেই পবিত্র।

আল্-কুরআনে বলা হয়েছে– নিশ্চয়ই মানব জাতির (নাস) ইবাদত বা প্রার্থনার জন্য নির্মিত প্রথম ঘরটি বাক্কা বা মক্কা নগরীতে অবস্থিত। এ ঘরটি

www.nagorikpathagar.org

হচ্ছে– পবিত্র (মুবারক) এবং বিশ্ববাসীর হিদায়েতের 'কেন্দ্র'।-(আল্-কুরআন, সূরা আল ইমরান (৩) ঃ আয়াত নং- ৬)।

হিন্দুধর্মীয় নভা (কেন্দ্র) প্রাথবি (পৃথিবীর) এবং বাক্কা নগরীর সর্ব প্রথম গৃহের পবিত্রতা– হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম ধর্মে স্বীকৃত। মক্কায় বা বাক্কায় অবস্থিত ইসলামের তীর্থস্থান কাবা। হিন্দুদের ধর্মীয় তীর্থস্থান ইলাসপদ (Ila's pad)। অর্থাৎ স্রষ্টার পদ রাখার স্থান। এ ধারণায় মিল রয়েছে-(ঋগবেদ, মন্ডল ১, সুক্ত-১২৮, শ্লোক-১)।

স্রষ্টার নাম

ইসলাম ধর্মের মূল স্রষ্টার নাম আল্লাহু। আল্লাহু শব্দটি আরবী কাওয়ায়েদ বা গ্রামার অনুসারে 'আল' এবং 'ইলাহা' এই দুটি শব্দ যোগে গঠিত। 'আল' শব্দের ইংরেজী অর্থ The এবং বাংলা অর্থ টা,টি। ইসলাম ধর্মের মূল বাণী হল– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এর অর্থ হলো– নাই কোন ইলাহ বা প্রভু, একমাত্র আল্লাহু ব্যতীত। 'লা' অর্থ নাই। ইলাহ অর্থ God. আল-ইলাহা সন্ধিযোগে শব্দ আল্লাহু এর অর্থ The God. হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে ইলাহা বা আল্লাহু শব্দটি আছে। তবে, ইলাহা বানানে নয় ইলা, ইল্লা অল্লো, অল্ল ইত্যাদি শব্দে বা বানানে। আল্লা উপনিষদকে লেখা হয় 'অল্লোপনিষদ'।

পরম স্রষ্টা/ঈশ্বরের প্রশংসা

পরম স্রষ্টা/ঈশ্বর/আল্লাহু সম্পর্কে বর্ণনায় আল্-কুরআন এবং ঋগবেদের মধ্যে মিল আছে। আল্-কুরআন পরম স্রষ্টাকে বলা হয়েছে– জগত সমূহের পালনকর্তা।-(আল্-কুরআন, সূরা ফাতিহা-১, আয়াত-২)।

ঋগবেদে স্রষ্টা সম্পর্কে বলা হয়েছে– গৌরবের অধিকারী। যেমন, নিশ্চয়ই স্বর্গীয় সৃষ্টিকর্তার জন্য নির্ধারিত আছে পরম গৌরব।-(ঋগবেদ, খণ্ড-৫, সুক্ত-৮১, শ্লোক-১)। আল-কুরআনে বলা হয়েছে– সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহ প্রতিপালকের জন্য (সূরা ফাতিহা, আয়াত নং-১)।

পরম দয়ালু স্রষ্টা

ঋগবেদে বলা হয়েছে– সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা হলেন সর্বাধিক দয়ার আধার।-(ঋগবেদ, খণ্ড-৩, সুক্ত-৩৪, শ্লোক-১)। আল-কুরআনে বলা হয়েছে আল্লাহু তায়ালা রাহমানুর রাহীম অর্থাৎ পরম করুণার অধিকারী পরম দয়ালু। (সূরা ফাতিহা : আয়াত-২)

সঠিক/উত্তম পথ

যজুর্বেদে বলা হয়েছে– আমাদেরকে উত্তম পথে পরিচালিত করুন।-(যজুর্বেদ, অধ্যায়-৪০, শ্লোক-১৬)। আল্-কুরআনে বলা হয়েছে– আমাদেরকে

www.nagorikpathagar.org

সরল (মুস্তাকীম) পথ (সিরাত) প্রদর্শন করুন।-(সূরা ফাতিহা, আয়াত-৫)।

যজুর্বেদে বলা হয়েছে, পাপাচার থেকে মুক্তি দিন, যা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট ও বিপদগামী করে।-(যজুর্বেদ, ৪০ ঃ ১৬ ; ঋগর্বেদ, খণ্ড-১, স্তুতি স্তাবক-১৭৯, শ্লোক-১,২)। আল্-কুরআনে বলা হয়েছে– আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথ নয়, যারা (প্রভুর) ক্রোধে নিপতিত, পথভ্রষ্টও।-(সূরা ফাতিহা, আয়াত-৫,৭)।

অভাবীদেরকে সাহায্যকরণ

ঋগবেদে বলা হয়েছে–ঐ লোক অভিশপ্ত যার নিকট খাদ্য মজুদ আছে, যখন কোন অভাবী লোক সহায়হীন হয়ে তার নিকট খাদ্য ভিক্ষা করে, তখন তার হৃদয় ভিক্ষুকের প্রতি কঠোর হয়, এমনকি বৃদ্ধ লোকও যদি তাকে সেবা করে– তাকে সে শান্তি দেয় না।-(ঋগবেদ, খণ্ড-১০, সুক্ত-১১৭, শ্লোক-২)।

আল্-কুরআনে বলা হয়েছে– আপনি কি তাকে দেখেছেন? সে তো ঐ ব্যক্তি যে, ইয়াতিমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় এবং অভাবগ্রস্থকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না।-(সূরা আল মাউন, আয়াত- ১,২,৩)।

মদের নিষিদ্ধতা

ইসলামের ধর্মগ্রন্থ এবং হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থে মদের নিষিদ্ধতার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। হিন্দুধর্মের মণু স্মৃতিতে বলা হয়েছে– "আত্ম হত্যাকারী, (২) মদ্যপানকারী, (৩) চোর (৪) গুরুজনের স্ত্রীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারী– এরা সবাই প্রতারক। এরা প্রত্যেকেই পৃথক পৃথকভাবে মহা-পাপী হিসাবে গণ্য হবে"।-(মণু স্মৃতি, অধ্যায়-৯ ঃ ধারা-২৩৫)।

মণু স্মৃতিতে আরো বলা হয়েছে–এসব লোক (যেমন–আত্মহত্যাকারী, মদ্যপানকারী, চোর, গুরুজনের স্ত্রীর সাথে অবৈধাচারী) এরা সকলেই এমন মহাপাপী– যাদের সাথে কারো আহার করা উচিত নয়। এরা এমন পাপী যার জন্য কোন কিছু ত্যাগ বা দান করা উচিত নয়। তাদের সাথে কারো অধ্যয়ন করা উচিত নয়। কারো তাকে বিবাহ করা উচিত নয়। তাকে পৃথিবীর সকল ধর্ম থেকে বহিষ্কার করা উচিত।-(মণু স্মৃতি, অধ্যায়-৯, ধারা-২৩৮)।

মণু স্মৃতির অন্যত্র বলা হয়েছে– শিকারী প্রাণীকে হত্যাকারী, (২) মদ্যপানকারী, (৩) চোর, (৪) গুরুর স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধাচারী এবং এ সমস্ত কাজের সাথে জড়িত সকলেই মহাপাপী।-(মণু স্মৃতি, অধ্যায়-১১, ধারা-৯৪)।

ঋগবেদে বহু স্থানে মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে– যেমন, ঋগবেদ পুস্তক-৮, স্তুতি স্তাবক-২, ধারা-১২ ; ঋগবেদ, খণ্ড-৮, স্তুতি স্তাবক-২১, ধারা-১৪। মণু স্মৃতি বহু অধ্যায়ে এবং বহু স্থানে মদ্য পানের নিষিদ্ধতার ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন– (১) মণু

www.nagorikpathagar.org

স্মৃতি, অধ্যায়-৩, ধারা-১৫৯ ঃ (২) মণু স্মৃতি, অধ্যায়-৭, ধারা-৪৭, (৩) মণু স্মৃতি, অধ্যায়-৯, ধারা-২২৫, (৪) মণু স্মৃতি, অধ্যায়-১১, ধারা-১৫১।

আল্-কুরআনে মদ পানের নিষিদ্ধতা ঘোষণা করে বলা হয়েছে– হে মুমীনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি, পূজার বেদি এবং ভাগ্য নির্ণয়ক তীর-ধনুক ইত্যাদি অপবিত্র এবং শয়তানের কাজ। তোমরা ঐগুলো বর্জন কর– যাতে তোমরা সফলকাম হও।-(সূরা মায়িদা-৫ ঃ ৯০)। মণু স্মৃতির অন্যত্র বহু স্থানে মদপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

জুয়ার নিষিদ্ধতা

হিন্দু ধর্মে মদের ন্যায় জুয়াকেও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঋগবেদে বলা হয়েছে– একজন জুয়া খেলায় আসক্ত ব্যক্তি বলে– আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে শত্রুভাবাপন্ন। আমার মা আমাকে ঘৃণা করে। এগুলো উন্মাদের বাক্য। উন্মাদ কাউকে সহ্য করতে পারে না।-(ঋগবেদ, খণ্ড-১০, স্তুতি স্তাবক-৩৪, শ্লোক-৩/৪)।

ঋগবেদে বলা হয়েছে– তাস খেলো না, অনুর্বর জমি চাষ করো না, লাভবান হও, সম্পদ লাভ কর।-(ঋগবেদ, খণ্ড-১০, অধ্যায়-৩৪, ধারা-১৩)।

মণু স্মৃতিতে বলা হয়েছে– মদ্যপান, জুয়া খেলা, বিবাহ বহির্ভূত নারী, ভোগ এবং শিকার করা অনুচিত। এগুলো যারা করে তারা পাপী (মণু স্মৃতি, অধ্যায়-৭, ধারা-৫০)।

পবিত্র আল্-কুরআনে বলা হয়েছে– হে মুমীনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক, তীর-ধনুক ইত্যাদি শয়তানের কার্য।-(সূরা মায়িদা, ৫ঃ ৯০)।

এরূপ হাজারো সাদৃশ্যের কারণে কি মনে হয় না যে, বেদ এবং কুরআনের উৎস এক ?

বেদের বাণী এবং আল্-কুরআনের বাণীর মধ্যে বহু সাদৃশ্য আছে। আল্-কুরআন নাযিল হওয়ার বহু পূর্বেই বেদ রচিত হয়েছে। তাই আল্-কুরআন দ্বারা বেদ প্রভাবিত হয়েছে বলা যায় না। আরব দেশে কোন পর্যায়ে সংস্কৃত চর্চা হত না।

আল্-কুরআনে মধ্যপ্রাচ্য এবং মিশরে আভির্ভূত নবী-রাসূলদের উল্লেখ আছে। কারণ, মক্কাবাসীগণ আরবী ভাষাভাষী অঞ্চলে এবং মিশরের নবী-রাসূলদের সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ভারত সম্বন্ধে তারা অজ্ঞাত ছিলেন না। তবে, ভারতীয়দের সম্পর্কে আরবদের ধারণা ছিল অনেকাংশে সীমিত।

www.nagorikpathagar.org

২য় অধ্যায়

৪

আল্লাহ্ ও ঈশ্বর

হিন্দু ধর্মের অন্যতম পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ ছান্দোগ্য উপনিষদে ঈশ্বর সম্পর্কে বলা হয়েছে– "একম, ইভা দ্বিতীয়ম" এর অর্থ হল ঈশ্বর "এক তাঁর দ্বিতীয় নাই"। শাব্দিক অথ হলো "এক আমি, নাই দ্বিতীয় আমি"। -(ছান্দোগ্য উপনিষদ, খণ্ড-৬, অধ্যায়-২, শ্লোক-১)। বেদান্ত বাদের ব্রহ্ম সূত্র হলো একম ব্রহ্মা (আমি ব্রহ্মা এক), দ্বিতীয়া ন্যস্ত (দ্বিতীয় নেই), নেই, ন্যস্ত, ,(নেই, নেই) ন্যস্ত, কিঞ্চন (নেই কিঞ্চিত মাত্র, একেবারেই নেই) (ব্রহ্মস্তত্র– বেদান্তবাদ)।

ঈশ্বরের পিতা-মাতা/প্রভু

ঈশ্বরের কি কোন প্রভু আছে? তাঁর কি কোন স্রষ্টা আছে? তাঁর কি কোন পিতা-মাতা আছে? শ্বেতাষ্যবতার উপনিষদে বলা হয়েছে ঈশ্বরের কোন প্রভু নেই। তাঁর কোন পিতা-মাতা নেই।-(শ্বেতাষ্যবতার উপনিষদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা- ২৬৩)।

কুফু অথবা সমকক্ষতা

ঈশ্বরের কি কেউ বা কিছু আছে ? তিনি কেমন ? শ্বেতাষ্যবতার উপনিষদে বলা হয়েছে– ঈশ্বরের মত অথবা সমকক্ষ কিছুই নেই।-(শ্বেতাষ্যবতার উপনিষদ, অধ্যায়-৪, শ্লোক-১৯)।

শ্বেতাষ্যবতার উপনিষদে বলা হয়েছে– ঈশ্বরের মত কিছু নেই। তাঁর নাম মহিমাময়, উজ্বল।-(শ্রী রাধাকৃষ্ণ, প্রিন্সিপাল উপনিষদ, পৃষ্ঠা-৭৩৬, ৭৩৭ ঃ প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থাবলী, ভলিউম-১৫, উপনিষদ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৩)।

আল্-কুরআনে তাওহীদ বা আল্লাহ্ তা'য়ালার একত্ব সংক্রান্ত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সূরা হল– ক্ষুদ্র সূরা ইখলাস। সূরা ইখলাসে বলা হয়েছে– আল্লাহ্ তা'য়ালার সমকক্ষ বা সাদৃশ্য (কুফুওয়ান) কোন একটি বস্তু বা সত্ত্বা নেই।-(সূরা ইখলাস, আয়াত-৪)। এটাই তো তাওহীদের মর্মবাণী।

সূরা শুরায় বলা হয়েছে– এমন কিছুই নেই যা হতে পারে আল্লাহ্র উপমা বা তুলনীয় (মেছাল)। তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা (সামীউ, বাসিরু)।-(আল্-কুরআন, সূরা শুরা, আয়াত-১১)।

অদৃশ্য স্রষ্টা

শ্বেতাষ্যবতার উপনিষদে ঈশ্বর সম্পর্কে বলা হয়েছে, "ঈশ্বরের রূপ দেখা যায় না। কেউ তাঁকে চোখে দেখেনি। যারা হৃদয় ও আত্মার মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি

www.nagorikpathagar.org

করে, তাঁর উপস্থিতি অন্তরে অনুভব করে, তারা ঈশ্বরের মত অমরত্ব লাভ করে"।-(শ্বেতাষ্যবতার উপনিষদ, অধ্যায়-৪, শ্লোক-২০)।

আল-কুরআনে বলা হয়েছে– নয়ন বা দৃষ্টিসমূহ আল্লাহুকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। অবশ্যই তিনি সকল নয়ন বা দৃষ্টিসমূহকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনি অত্যন্ত সুক্ষ্মদর্শী এবং সর্ব বিষয়ে সুবিজ্ঞ। (আল্-কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত-১০৩)।

ঈশ্বরের বহু নাম

হিন্দু ধর্ম মতে, ঈশ্বরের বহু নাম আছে। আল্-কুরআনে আল্লাহ্ তা'য়ালার ৯৯টি গুণবাচক নামের উল্লেখ আছে। ঋগবেদে সর্ব শক্তিমান ঈশ্বরের ৩৩টির অধিক গুণবাচক নামের উল্লেখ আছে। অনেকগুলো গুণবাচক নাম উল্লেখিত হয়েছে ঋগবেদের দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম শ্লোকে।

ঋগবেদে বর্ণিত আছে–জ্ঞানী ঋষিগণ ঈশ্বরকে বহু নামে ডাকেন।– (ঋগবেদ, খন্ড-১, সুক্ত-১৬৪, শ্লোক-৪৬)।

ঋগবেদে উল্লেখিত ঈশ্বরের নামগুলোর মধ্যে সর্বপ্রধান এবং সুন্দরতম নাম হল– ব্রহ্মা। সর্ব শক্তিমান ঈশ্বর বিভিন্নরূপ কর্ম এবং দায়িত্ব পালন করেন। প্রত্যেক কর্ম এবং দায়িত্বের জন্য ঈশ্বরকে একটি পৃথক নাম দেয়া হয়েছে। যেহেতু ঈশ্বরের গুণ বা কাজ অসংখ্য– তাই হয়তো ঈশ্বরের সংখ্যা বৃদ্ধি করে সাড়ে ৩৩ কোটি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

ব্রহ্মা, স্রষ্টা, খালিক

ঈশ্বর ব্রহ্মার প্রধান কাজ হল– সৃষ্টি করা। তাই তাঁর এক নাম– স্রষ্টা। আল্-কুরআনে আল্লাহ্ তা'য়ালার সৃষ্টি বা কর্ম সংক্রান্ত গুণবাচক নাম হল খালিক। খালিক বা স্রষ্টা অর্থে যদি ব্রহ্মাকে বুঝানো হয়, তাহলে এ বিষয়ে ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম কাছাকাছি এসে যায়। কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি হয় একটু পরেই।

হিন্দু ধর্মের স্রষ্টার মস্তক হল চারটি। মুলত ছিল একটি। পরে চারটি অতিরিক্ত মস্তক স্রষ্টা নিজেই সৃষ্টি করেছেন। এ অতিরিক্ত চারটি মস্তক হওয়ার ব্যাখ্যাটি মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গীতে সুখকর নয়। হিন্দুগণ ঈশ্বর এবং দেবতাদেরকে মানবের উন্নততম সংস্করণ কল্পনা করেছেন।

ঈশ্বর ও দেবতাদের দৈহিক আহারের ক্ষুধা আছে। বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। নিদ্রা আছে। দেবতার সাথে দেবীও কল্পনা করা হয়েছে। দেব-দেবীর কল্পনার মধ্য দিয়ে তা সীমাহীন যৌনতায়ও সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

দেবতা এবং দেবীদের নর-নারী হিসাবে কল্পনার পর তাদের মধ্যে যৌন ক্ষুধাও সৃষ্টি করা হয়েছে। যৌন কার্যক্রমের মাধ্যমে সকল প্রাণীর পুত্র কন্যা সৃষ্টি

www.nagorikpathagar.org

হয়। দেবতা এবং ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে। ধর্ম যদি মানব রচিত বা মানব কল্পিত হয়, তাহলে এসব ধরণের সমস্যা সৃষ্টি হয়।

প্রতিমা

যজুর্বেদে বলা হয়েছে ঈশ্বরের কোন সাদৃশ্য বা প্রতিমা নেই। সংস্কৃত শ্লোকটি হল– "ন তস্যৎ প্রতিমা অস্থি" অর্থাৎ তার কোন প্রতিমা অথবা সাদৃশ্য নেই। (যজুর্বেদ, অধ্যায়-৩২, শ্লোক-৩)।

বিষ্ণু

খৃষ্টধর্মের ন্যায় হিন্দু ধর্মেও ত্রিত্ববাদ আছে। খৃষ্ট ধর্মে তিনজন ঈশ্বরের মধ্যে কর্মবিভাগ নেই। একজন ঈশ্বর যীশু তো মারাই গেলেন। Holy Ghost এর কি কাজ? তা সু-স্পষ্ট নয়। ত্রিত্ববাদের মাপকাঠিতে, খৃস্ট ধর্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম বহু প্রাচীন হলেও অধিকতর বৈজ্ঞানিক।

হিন্দু ধর্মের ত্রিত্ববাদের তিন ঈশ্বর বা দেবতা হলেন–ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। বিষ্ণুর কাজ হলো–সৃষ্টি এবং প্রতিপালন। ইসলাম ধর্মে আল্লাহুর একটি গুণবাচক নাম হল–রাব বা প্রতিপালক। আর একটি নাম হলো রায্যাক রিযক বা প্রতিপালন সামগ্রীদাতা।

হিন্দু ধর্মে প্রতিপালক বিষ্ণুর বিশেষ দৈহিক বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁর হাত চারটি। যেমন ব্রহ্মার মাথা চারটি। এক পর্যায়ে পাঁচটি। প্রথম পর্যায়ে ছিল মাত্র একটি। বিষ্ণু তার ডান হাতে একটি চক্র বা ভারী চাকা (সুদর্শন চক্র) ধারণ করেন। তাঁর বাম হাতে থাকে একটি কঞ্চ বা শামুক। ঈশ্বরের হাতে শামুক না হলেও হয়তো চলতো।

বিষ্ণুর বাহন–গরুড় পাখি। ব্রহ্মার বাহন হংস বলাকা। গরুড় এর তুলনায় হংশ বলাকা কিছুই নয়। শিবের বাহন বৃষ বা ষাঁড়। বিশ্বকর্মার বাহন হস্তি। বিষ্ণুর আরেকটি বাহন সামুদ্রিক সর্প। তিনি সর্পের উপর আরোহণ করে সমুদ্রে বিচরণ করেন।

তাওহীদ/একত্ববাদ

হিন্দু ধর্মে বহু ঈশ্বরের কল্পনা থাকলেও তাওহীদ বা একত্ববাদের ধারণা হারিয়ে যায়নি। ঋগবেদে বলা হয়েছে–তাকে ছাড়া আর কাউকে উপাসনা করো না, যিনি একমাত্র ঈশ্বর। –(ঋগবেদ, খন্ড-৮, সুক্ত-১, শ্লোক-১)।

এ বাক্যটি এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর মর্ম কি এক নয়? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুর অর্থ– নাই কোন ইলাহা (ঈশ্বর) আল্লাহু ব্যতীত।

বেদান্তবাদে ব্রহ্মাস্তত্র

বেদান্তবাদের ব্রহ্ম মন্ত্রটি হল–'ঈশ্বর এক। দ্বিতীয় নেই। মোটেই নেই। কিঞ্চিত নেই।" সংস্কৃত শ্লোকটি এরকম– "ব্রহ্মা একম ইভা দ্বিতীয়ম। (১) ন্যস্ত, (২) নেহন, (৩) কিঞ্চন, (৪) ন্যস্ত।

www.nagorikpathagar.org

হিন্দু ধর্ম ও সর্বেশ্বরবাদ

হিন্দু ধর্মে একেশ্বরবাদ আছে। সর্বেশ্বরবাদও আছে। হিন্দু ধর্মে– ঈশ্বর বা দেবতার সংখ্যা কত? হিন্দুধর্মে পূজার যোগ্য দেবতার সংখ্যা ১ থেকে ৩। তার পর ৩ থেকে ৩৩। ৩৩ থেকে সাড়ে ৩৩ কোটি। কিন্তু হিন্দু ধর্মের দেবতা এই ৩৩ কোটিতেই সীমাবদ্ধ নয়। তাদের দেবতা সর্ব সৃষ্টিতে বিরাজিত।

হিন্দু ধর্ম মতে, চন্দ্র, সূর্য, বৃহস্পতি, শুক্র, ইত্যাদি গ্রহ-উপগ্রহ পূজার যোগ্য। শুধু প্রাণহীন গ্রহ-উপগ্রহ নয়। ক্ষুদ্র বৃহৎ গাছপালা ও বৃক্ষলতা পূজার যোগ্য। কারণ স্রষ্টা সৃষ্টিকে আশ্রয় করে আছেন। শুধু গ্রহ-উপগ্রহ অথবা বৃক্ষলতা নয়, সকল সৃষ্টিই স্রষ্টার আসন।

কীট-পতঙ্গ থেকে সকল জীব জন্তুর মধ্যেই ঈশ্বর বাস করেন। তাই কীট-পতঙ্গ হিন্দুদের পূজার যোগ্য। সব কিছুই ঈশ্বর বা সব কিছুতেই ঈশ্বর আছেন। এসব ধারণাকে বলা হয় সর্বেশ্বরবাদ বা সর্বভূতে ঈশ্বরবাদ।

ইংরেজীতে বলা হয়–Pantheism. Everything is God এবং Everything is God's এ দু'টি বাক্যের মধ্যে পার্থক্য কি? Pan শব্দের অর্থ সবকিছু। Theism এর অর্থ ঈশ্বর তত্ব। Pantheism অর্থ সর্বেশ্বরবাদ তত্ত্ব।

ড. জাকির নায়েকের মতে, হিন্দু ধর্ম ও ইসলামের পার্থক্য হল–একটি মাত্র অক্ষর। বাংলা অক্ষর 'র' এর ইংরেজী অক্ষর Apostrophe(S)। God & God's দু'টি শব্দের পার্থক্য যতটুকু ততটুকুই। ইসলামী তত্ত্বে সব কিছু ঈশ্বরের। সর্বেশ্বর বা Pantheism মতে সব কিছুই ঈশ্বর।

ইংরেজী শব্দ God সঙ্গে Aspostrophe's যোগ হলে অর্থ হয় God's অর্থাৎ সব কিছুই ঈশ্বরের। Gods এবং God's এর মধ্যে পার্থক্য যেটুকু হিন্দু ধর্মে এবং ইসলাম ধর্মের পার্থক্য এ ক্ষেত্রে ততটুকু।

ইসলাম ধর্ম মতে, সব কিছুই আল্লাহ্ নয়। কিন্তু সব কিছুই আল্লাহ্ এর। সব কিছুরই মালিক আল্লাহ্। আল্লাহ্র সৃষ্টি বা ক্ষমতার বাইরে কিছু নেই। সব কিছুরই মালিক আল্লাহ্।

মানুষ Nonmaterial বা উপাদান ছাড়া কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহ্ তায়ালা ইচ্ছামাত্র যে কোন জিনিস সৃষ্টি করতে পারেন। আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়। সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে শুধু বলেন "হও" বা "কুন"। "হও" বললেই যে কোন জিনিস সৃষ্টি হয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

৫
আল্লাহ্ তা'য়ালা ও পরমেশ্বর

আল্লাহু আকবার? অর্থ হচ্ছে আল্লাহু মহান এবং আল্লাহু সর্বশ্রেষ্ঠ। ঈশ্বরের মহানত্বের ভাবটি হিন্দু ধর্মে আছে। অথর্ববেদে বলা হয়েছে "দেব মহা ঐশ" অর্থাৎ ঈশ্বর অতি মহান (অথর্ববেদ, খণ্ড-৩০, সুক্ত-৫৮, শ্লোক-৩)।

প্রভু ঈশ্বর মহান। মহত্ত্ব ঈশ্বরের একটি বড় গুণ। ঈশ্বর পবিত্র। আল্লাহু মহান। তিনি আকবার। তিনি সর্ব শ্রেষ্ঠ। আল্লাহু পবিত্র। আল্লাহু সুবহান। অথর্ববেদে ঈশ্বরের মহানত্ব এবং মহত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। (অথর্ববেদ খন্ড-২, Williams Dewit পৃষ্ঠা-৯১০)। আল কুরআনে মহান স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণবাচক নাম আকবার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বা মহান।

ঈশ্বর সম্পর্কে অথর্ববেদে বলা হয়েছে, যথার্থই তুমি (ঈশ্বর) আলোময় (নূর)। তুমিই সত্য (হক), তুমি অদ্বিতীয় (আহাদ)। তোমার প্রকাশ মহান। তাই তোমার মহাসত্য সর্ব স্বীকৃত! সত্যই মহান তোমার প্রকাশ, হে ঈশ্বর! (অথর্ববেদ সংহিতা, ভলিউম-২, উইলিয়াম এস. ডেউইট, পৃষ্ঠা-৯১০)।

ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা

সর্ব শক্তিমান মহান ঈশ্বরের গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে হিন্দুধর্ম মতে সবচেয়ে সুন্দর নামটি হল ব্রহ্মা বা ব্রহ্ম। ব্রহ্ম শব্দটির অর্থ হচ্ছে স্রষ্টা। ব্রহ্মা শব্দটি একটি গুণবাচক নাম। ব্রহ্মা একটি গুণের নাম। ঈশ্বরের বহু গুণ আছে। তার বহু দায়িত্ব ও কর্ম আছে। একটি কর্ম হল সৃষ্টি কর্ম। সৃষ্টি গুণ বা কর্মের জন্যে ঈশ্বর ব্রহ্মা বা স্রষ্টা নামে অবিহিত। (ঋগবেদ, খন্ড-২,সুক্ত-১)।

আল-কুরআনে মহান আল্লাহু তায়ালার সৃষ্টি সংক্রান্ত গুণ বাচক নাম হল খালিক। খালিক শব্দের অর্থ স্রষ্টা। হিন্দুগণ ঈশ্বরের ব্রহ্মা নাম জপ করে। মুসলিমগণ আল্লাহু তায়ালার তাসবিহ পাঠ করে। ইয়া আল্লাহু (হে আল্লাহু), ইয়া রাহিমু (দয়ালু), ইয়া রাহমানু (হে পরম করুণাকারী)– ইয়া খালিকু, (হে পরম স্রষ্টা), ইয়া মালিকু, (হে রাজাধিরাজ), ইত্যাদি ৯৯ শব্দে স্রষ্টার বন্দনা করা হয়।

প্রতিপালক বিষ্ণু

হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরের দ্বিতীয় স্বত্ত্বা অথবা দ্বিতীয় ঈশ্বর হলেন বিষ্ণু। বিষ্ণু শব্দের অর্থ পালক এবং বিষ্ণু হিসেবে ঈশ্বরের কাজ হলো প্রতিপালন। বিষ্ণু হলেন পালনকর্তা। (ঋগবদে, প্রথম মন্ডল, শ্লোক-১, ২, ৩)।

www.nagorikpathagar.org

ভগবান বিষ্ণুর একটি কাজ হল সৃষ্টিকে রক্ষা করা। সৃষ্টিকে পালন করা। ঈশ্বর ব্রহ্মা হিসাবে সৃষ্টিকর্তা। ঈশ্বর বিষ্ণু হিসাবে পালনকর্তা এবং রক্ষাকর্তা।

রক্ষাকরণ বা পালন করণের কাজটি স্রষ্টার একটি গুণবাচক কর্ম। স্রষ্টা শুধু সৃষ্টি করে তার দায়িত্ব শেষ করেছেন, তা তিনি মনে করেন নি। তিনি রিযকদাতা হিসাবে রায্যাক বা প্রতিপালনকর্তা। তিনি রব হিসাবে পালনকর্তা। ঈশ্বরের প্রতিপালন কর্তা হিসাবে বিষ্ণু নাম ঋগবেদ সংহিতা এবং যজুর্বেদে আছে (ঋগবেদ খন্ড-১, সুক্ত-১, শ্লোক-৩ ; যজুর্বেদ, অধ্যায় ৪০, শ্লোক-৮)।

পালনকর্তা হিসেবে আল্লাহ্ তা'য়ালার নাম হলো রাব্ব্। আরবী রাব্ব্ শব্দের অর্থ পালক বা প্রতিপালক। প্রতিপালক বা রাব্ব্ আল্লাহ্ তা'য়ালার একটি অন্যতম প্রধান নাম। তিনি দ্বিতীয় আল্লাহ্ নন। হিন্দু ধর্মে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু স্বতন্ত্র স্বত্ত্বা। ইসলাম ধর্মে যিনি খালিক বা সৃষ্টিকর্তা, তিনি একই সঙ্গে পালনকর্তা, রিযক দাতা, রায্যাক। খালিক এবং রায্যাক একই প্রভু বা রাবের দুটি নাম।

মহান ঈশ্বর জ্ঞানী। যারা ঈশ্বরকে বিভিন্ন নামে ডাকে, তারা মহা জ্ঞানী (ঋগবেদ খন্ড-১, সুক্ত নং-৬৪, শ্লোক-৪৬)।

তাওহিদ এবং একেশ্বরবাদ

হিন্দু ধর্মের একেশ্বর বাদের সুন্দরতম বাণী ভিত্তি হল "একম ইভা দ্বিতীয়ম"। অর্থাৎ তিনি ঈশ্বর এক, নয় দ্বিতীয়। তিনি একক, একমাত্র এবং অদ্বিতীয় (ছান্দগ্য উপনিষদ, অধ্যায়-৬, সুক্ত-২, শ্লোক-১। রাধাকৃষ্ণ রচিত উপনিষদ, পৃষ্ঠা-৪৪৭-৪৮ ; প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থ সমূহ, খন্ড-১, উপনিষদ, ১৯ অংশ, পৃষ্ঠা-৯৩)।

ঈশ্বর সম্বন্ধে সুভাষ ভাটট্রা উপনিষদে বলা হয়েছে– ঈশ্বরের কোন অংশীদার নেই। তার কোন অধিপতি নেই। সংস্কৃত ভাষ্য হচ্ছে 'নকষ্য কসচীজ জনিত নক অধিপ'। (প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থসমূহ, খন্ড-১৫, উপনিষদ, দ্বিতীয় অংশ, পৃষ্ঠা-২৬৩, রাধাকৃষ্ণ সংকলিত মূল উপনিষদ, পৃ. ৭৪৫)।

একমাত্র প্রভু ঈশ্বর

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হিন্দু ধর্মের তিন প্রধান ঈশ্বর । প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বর কি তিনজন অথবা একজন? ধর্মগ্রন্থ পাঠে কখনো মনে হয় ঈশ্বর "একম ইভা দ্বিতীয়ম"। আমি এক, নেই আমার দ্বিতীয়। তবু কখনো মনে হয় ৩৩, কখনো মনে হয় ৩৩ কোটি। কিন্তু ইসলাম ধর্মে আল্লাহ্ মাত্র একজন। তিনি ওয়াহেদ। তিনি এক। তিনি আহাদ। তিনি একক। তার কোন শরীক বা অংশীদার নেই। কিন্তু ৯৯টি গুণবাচক নাম আছে।

www.nagorikpathagar.org

ঈশ্বরত্ব বা ইলাহহিয়্যাত নিয়ে কোন বিতর্ক বা ঝগড়া ফাসাদ নেই। ইলাহ শব্দের অর্থ প্রভু। আল ইলাহ বা আল্লাহু শব্দের অর্থ একক প্রভু। যার কোন দ্বিতীয় নেই।

ঋগবেদে একেশ্বরবাদ

ঋগবেদে স্রষ্টার একত্ব সূচীত হয়েছে। হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রে বহু দেবতার এবং অবতারের নাম উল্লেখ হলেও একেশ্বরবাদ বা তাওহিদের উৎস হল বেদ গ্রন্থ সমূহ (ঋগবেদ, পুস্তক নং-১০, সুক্ত-১১৪, শ্লোক-৫)।

ঋগবেদে বলা হয়েছে তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বর ব্যতীত কারো উপাসনা করোনা। তিনি একমাত্র স্বর্গীয় ঈশ্বর। কেবল তাঁরই প্রশংসা কর। (ঋগবেদ সংহিতা, খন্ড-৯; পৃষ্ঠা-১, ২; ঋগবেদ, খন্ড-৮, সুক্ত-১, শ্লোক-১)।

উপনিষদে একেশ্বরবাদ

সুভাষ ভাট্টারা উপনিষদে বলা হয়েছে "তাঁর মত আর কেউ নেই। কোন প্রতিমা নেই"। সুভাষ ভাটট্রা উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায় বলা হয়েছে ঈশ্বরের আকার দেখা যায় না। কেউ তাঁকে চোখ দ্বারা দেখতে পায় না।

সংস্কৃত ভাষ্য হচ্ছে–"সমুদ্র সে অন্ধাতিরূপম ঐশ্বন চকসুস পসষতি কস কনাই নম" (প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থ সমূহ। খন্ড ১৫, উপনিষদ-২, পৃষ্ঠা-২৫৩। রাধাকৃষ্ণ উপনিষদ, পৃ. ৭৩৬, ৭৩৭)।

ঈশ্বর একম ইভা দ্বিতীয়ম। একমাত্র এক যার দ্বিতীয় নেই। এক মাত্র এক হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বর হয়ে গেলেন দু'জন, তিন'জন। পূজনীয় বা পূজা পাওয়ার উপযুক্ত ঈশ্বরের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে বৃদ্ধি পেয়েছে সাড়ে ৩৩ কোটি পর্যন্ত।

ঈশ্বরের বহু নাম

আল কুরআনে আছে আল্লাহু তা'য়ালার সর্বমোট ৯৯টি গুণবাচক নাম। ঋগবেদে ঈশ্বরের গুণবাচক নাম আছে ৩৩টি। ঈশ্বরের অধিকাংশ গুণবাচক নাম আছে ঋগবেদের ২য় মন্ডলের ১ম শ্লোকে।

আল কুরআনে আল্লাহু তা'য়ালার গুণবাচক ৯৯টি শব্দে তার সিফাত অর্থাৎ গুণবাচক নাম আছে। এ গুণবাচক নাম বা শব্দগুলো যে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে- এর সাথে উপনিষদের স্রষ্টা সংক্রান্ত বর্ণনার মধ্যে মিল রয়েছে।

কুরআনে আল্লাহুকে বলা হয়েছে নূর বা আলো। তিনি কাইয়েম, চিরঞ্জীব। তিনি অব্যয় এবং অক্ষয়। তিনি সামাদ বা স্বয়ং সম্পূর্ণ। তিনি কারো উপর নির্ভরশীল নন। তিনি সর্ব ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতামুক্ত, পারফেক্ট। সৃষ্টি করার কাজ সৃষ্টিকর্তা হিসেবে খালেক এর কর্ম। রিযিকদাতা হিসাবে ঈশ্বর হলেন রাব, রাজ্জাক, ইত্যাদি।

www.nagorikpathagar.org

নাম বনাম গুণ

এক ঈশ্বরের গুণবাচক নাম ৯৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩ কোটি হলে তেমন দোষণীয় ছিল না। কিন্তু পূজা পাওয়ার যোগ্য ঈশ্বর ৩৩ কোটি হলে তাদের মধ্যে ঈশ্বরত্বের অধিকার বা মালিকানা নিয়ে মতভেদ, মতানৈক্য এবং পরিণতিতে ঝগড়া, ফাসাদ হওয়া স্বাভাবিক।

এমন ঝগড়া ফাসাদ কাল্পনিক নয়। বাস্তব। এমন এক ঝগড়া ফাসাদে তৃতীয় ঈশ্বর শিব তো প্রথম ঈশ্বর ব্রহ্মের প্রথম মস্তকটি কেটেই ফেলেছিলেন। এখন ব্রহ্মার মস্তক চারটি। যা পরে অন্য প্রসঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল। মূল মস্তকটি আর নেই। তিনি ঈশ্বর ব্রহ্মা।

বিষ্ণু এবং শিব এর প্রতিযোগীতায় প্রথম ঈশ্বর স্রষ্টা ব্রহ্মা পেছনে পড়ে গেছেন। সামনে এসে গেছেন পালনকর্তা বিষ্ণু। তাকে আরো পেছনে ফেলে এসেছেন সংহার কর্তা বা ধ্বংসকর্তা শিব। বর্তমানে মহা স্রষ্টা ব্রহ্মা অপেক্ষা ধ্বংসকর্তা শিবের পূজাই বেশী হয়।

শিব লিঙ্গ

দেবতাদের যৌনতা হিন্দুধর্মে দোষণীয় নয়। দেবতাদের যৌনতা হলো পবিত্র লীলা। যৌনতা ছাড়া সৃষ্টি সম্ভব নয়। দেবতাদের মধ্যে যৌন সম্রাট হলেন মহাদেব শিব। তার প্রচন্ড যৌনতায় একদা শিবপত্নী পার্বতী মৃত্যুমুখী হয়েছিলেন।

শিবপত্নীর জীবন রক্ষার জন্যে স্রষ্টা ব্রহ্মার নির্দেশে পালনকর্তা বিষ্ণু শিবের যৌন সঙ্গমকালে তার যৌন লিঙ্গ কেটে পার্বতীর জীবন রক্ষা করেছিলেন। এখন শিবের ঐ কর্তিত লিঙ্গপূজা করা হয়। কিন্তু স্বীয় কন্যা দেবী স্বরস্বতীর সাথে শত বছর যৌনতায় লিপ্ত হওয়ার কারণে পিতা ব্রহ্মা পূজা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পেছনে পড়ে গেছেন।

সর্বেশ্বরবাদ

হিন্দুগণ ৩৩ কোটি দেবতাকে স্বীকৃতি দিলেও তাদের অনেকে নিজেদের পরিচয় একেশ্বরবাদী হিসাবে প্রদানে গৌরব বোধ করেন। সর্বেশ্বরবাদীগণ সব কিছুর মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ঈশ্বর ৩৩ কোটি কেন। ৩৩ হাজার কোটিও হতে পারে।

সর্বেশ্বর বাদীদের মতে মনুষ্য থেকে শুরু করে সকল কীট পতঙ্গের মধ্যেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে। শুধু তাই নয়– প্রতিটি জলবিন্দু, প্রতিটি বালিকণা এবং প্রস্তর কণার মধ্যেও ঈশ্বর আছেন। ধুলিকণা থেকে পাথর মজবুত। তাই মাটির মূর্তি অপেক্ষা শীলা পাথরের খোদাই করা দেবতার গুরুত্ব অধিক।

www.nagorikpathagar.org

ঈশ্বর হত্যা

ঈশ্বর শুধুমাত্র স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের মধ্যেই বিরাজ করেন না। বরং তিনি জীব ও জড় সব কিছুর মধ্যে অবস্থান করেন। যদি ঈশ্বর শুধু মানুষ নয়, ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র পোকামাকড়, তৃণ, গুল্ম, ধুলিকণা, এটম এবং নিউট্রনের মধ্যে অবস্থান করেন– তবে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র জড় বস্তু, পোকা, মাকড়, তৃণ, গুল্ম হত্যা করা বা নষ্ট করাও ঈশ্বর হত্যার মত মহা পাপ।

ঈশ্বরত্ব উন্নয়ন

সর্বেশ্বরবাদী বা সবকিছুতেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসীগণ ঈশ্বরের পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারেন। কিন্তু, হয়তো বাঁচতে পারবেন না। আহার ভিন্ন কোন জীব বা প্রাণী বাঁচে না। তৃণ্য গুল্মেরও খাদ্য প্রয়োজন হয়।

সর্বেশ্বরবাদীদের দর্শনে বিশ্বাসী হলে জীব ও জগত অচল হয়ে পড়বে। এক প্রাণী যদি অপর প্রাণীকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার না করে, সকল প্রাণীকে তৃণের ও গুল্মের মত জড় বস্তুর উপরে নির্ভর করতে হবে।

ড. জাকির নায়কের 'S' থিওরী অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, গ্রহণযোগ্য এবং বাস্তব। সব কিছু "ঈশ্বর" না বলে সব কিছু "ঈশ্বরের" বললে সম্বন্ধ তত্ত্ব গ্রহণ করা হয়ে যায়। এই তত্ত্বে Evertything is God নয় বরং Everything is God's ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঈশ্বরের নামাবলী

আল কুরআনে বলা হয়েছে ঈশ্বরের বহু সুন্দর নাম (আসমাউল হুসনা) আছে। আল্লাহুর গুণবাচক নামের সংখ্যা ৯৯টি। ঋগবেদে উল্লেখিত ৩৩টি নাম হতে সাড়ে ৩৩ কোটিতে সম্প্রসারিত হয়েছে। ৩৩ থেকে ৩৩ কোটি না হলে ও ৯৯ থেকে হ্রাস পেয়ে ৩৩ হতে পারে।

এক ঈশ্বরকে– ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব– এ তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। আল-কুরআনে উল্লেখিত ঈশ্বরের ৯৯ নামকে তিনভাগে ভাগ করলে প্রতি ভাগে ৩৩ নাম পড়ে।

ঈশ্বরের গুণাবলী থেকে ঐশ্বরিক সত্ত্বা

ঋগবেদে মহা ঈশ্বরের ৩৩টির অধিক গুণাবলীর বর্ণনা স্থান পেয়েছে। ঈশ্বরের গুণগুলোই নামবাচক বিশেষ্য হিসাবে পরিণত হয়েছে। গুণবাচক বিশেষণগুলো দ্বারা কোন দেবতাকে চিহ্নিত করা হলে ঐ গুণ সম্পন্ন দেবতা পৃথক ও স্বতন্ত্র দেবসত্ত্বায় পরিণত হন।

www.nagorikpathagar.org

৬

তাওহীদ ও একেশ্বরবাদ

ইসলাম ধর্মের মূল হলো কালিমা তাইয়েবা বা পবিত্র বাক্য। এ বাক্যটি হলো– "লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ বা ইবাদতের যোগ্য কোন সত্ত্বা নেই। রাসূলুল্লাহ্ মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্ তায়ালার সমকক্ষ বা শরীক নন। নাউযুবিল্লাহ। তিনি হলেন মানব জাতির প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার প্রেরীত পুরুষ এবং প্রিয়তম বান্দাহ।

আমাদের কালিমা তাইয়েবা বা মহাপবিত্র বাক্য হল– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল-কুরআনুল কারীমে কোথাও "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এবং "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"– এ দু'টি বাক্য এক সাথে উচ্চারিত হয়নি। দু'টি বাক্য আল-কুরআনে আছে, তবে পৃথক পৃথক স্থানে।

যদি দু'টি বাক্য এক সাথে থাকত তা হলে হয়ত আমরা পিতা ঈশ্বর এবং পুত্র যিশুর ন্যায় আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা এবং রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ (সা.)-কে এক আসনে বসিয়ে দ্বিত্ববাদ জন্ম দিয়ে ফেলতাম। নাউযুবিল্লাহ! আল্লাহ্ তায়ালা সর্বজ্ঞানী। তিনিই আমাদের ঈমানের হিফাজতের মালিক।

কাবাকে সিজদাহ হয় না

একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাকে বা আল্লাহ্ তায়ালার উদ্দেশ্যে সিজদা করা যায়। কোন মানুষ, নবী, রাসূল, মালাক বা ফিরিস্তা বা দেব দেবী কাউকে সিজদা করা যায়না। পবিত্রতম গৃহ কাবা গৃহকেও সিজদা করা হয় না। কাবা গৃহের দিকে নজর ঠিক করে একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাকে মুসলিমগণ সিজদা করেন। পবিত্র কাবাকে নয়।

সুরাহ ইখলাস

আল্লাহ্ তায়ালার তাওহিদ বা একত্ববাদের সুন্দরতম বিকাশ ঘটেছে পবিত্র আল-কুরআনের ১১২ নং সুরা ইখলাসে। এ সুরাটিকে সাধারণভাবে "কুল হু য়াল্লাহু সূরাহ" বলা হয়। কারণ এ সূরায় প্রথম বাক্যের শব্দগুলো হল, কুল হু ওআল্লাহু আহাদ।

তাওহীদ সংশ্লিষ্ট মূল দু'টি শব্দ হল ওয়াহেদ এবং আহাদ। ওয়াহেদ শব্দের অর্থ এক। আহাদ শব্দের অর্থ একক। ওয়াহেদ শব্দের অর্থ এক বলতে কি বুঝায়– তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। একক শব্দের তাৎপর্য হল, এক ছাড়া দ্বিতীয় নেই। ওয়াহেদ শব্দের ইংরেজী হলো ওয়ান। আহাদ শব্দের ইংরেজী হল unique,

www.nagorikpathagar.org

বাংলা একক অর্থাৎ যার দ্বিতীয় হয় না। সূরা ইখলাসে আল্লাহু বা ইলাহ সম্বন্ধে আরো বলা হয়েছে, আল্লাহু তায়ালার কোন কুফুয়ান বা সমকক্ষ বা সমতুল্য নেই।

সামাদ

রাব্বুল আলামীন আল্লাহু তায়ালার কোন আত্মীয় স্বজন বা স্বজনপ্রীতি নেই। তিনি ন্যায় বিচারক। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি। তাকে কেউ জন্ম দেয় নি। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কারও উপর নির্ভর করেন না। সকলেই তার মুখাপেক্ষী বা তার উপর নির্ভরশীল। সামাদ ঐ স্বত্ত্বা যিনি স্বনির্ভর এবং যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।

কুন ফা ইয়াকুন

তাওহীদ শব্দের আর একটি তাৎপর্য হল– আল্লাহু যখন 'কুন' অর্থাৎ 'হও' শব্দটি স্মরণ করেন অথবা উচ্চারণ করেন– তখনই তিনি যা ইচ্ছা করেন তা হয়ে যায় বা ঘটে যায়। এজন্য কারো থেকে তাকে সাহায্য গ্রহণ করতে হয় না। কোন কিছু সৃষ্টি করতে আল্লাহু তায়ালার কোন দ্রব্য বা উপকরণ, তরল, কঠিন বা বায়বীয়– কিছুই দরকার হয় না।

মানুষ বা অন্য সৃষ্ট জীব যেমন যেমন ব্যাঘ্র, সিংহ, সর্প, কুমীর, ইত্যাদি অন্যের মনে ভয় ভীতি সৃষ্টি করতে পারে। মানুষ হুকুম পালন করিয়ে অন্য কিছু সৃষ্টি করাতে পারে।

আল্লাহু তায়ালা হুকুম দিয়ে বা 'কুন' শব্দ উচ্চারণ করে যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করতে পারেন। প্রশান্ত বা আটলান্টিক মহাসাগর কেন– শনি বা বৃহস্পতি গ্রহ সৃষ্টি করতে আল্লাহু তায়ালার হুকুম ছাড়া কোন উপকরণ প্রয়োজন হয় না। এটাই এক কথায় ইসলামের তাওহীদ বা একত্ববাদ।

নাসারা ত্রিত্ববাদ

হিন্দু ধর্মে তাওহীদ বা একেশ্বরবাদ আছে। তবে হিন্দু ধর্মে খৃষ্টান ধর্মের ন্যায় ত্রিত্ব বাদও আছে। খৃষ্টান ধর্মের ত্রিত্ববাদ হল পিতা ঈশ্বর, (God the father), পুত্র যিশু (Jesus, the son) এবং পবিত্রাত্মা বা হলি Ghost হলেন বা গেব্রিয়েল বা জিব্রাইল (আ.)।

হিন্দু ত্রিত্ববাদ

হিন্দুধর্মের ত্রিত্ববাদ হল – (১) ব্রহ্মেশ্বর বা স্রষ্টা ঈশ্বর, (২) বিষ্ণুশ্বর বা পালনকর্তা বিষ্ণু ঈশ্বর, এবং (৩) শিবেশ্বর বা বানেশ্বর অর্থাৎ ধ্বংস কর্তা শিব একজন ঈশ্বর। জন্ম হলে মৃত্যু আছে। প্রাণী সৃষ্টি হলে তার ধ্বংস বা মৃত্যু আছে। তিন দেবতা হিসেবে ঈশ্বরের তিন দায়িত্ব। তা হল– (১) সৃষ্টি করা, (২) লালন পালন করা এবং (৩) ধ্বংস করা বা মৃত্যু দেয়া।

www.nagorikpathagar.org

আহাদ (একক)

ইসলাম ধর্মে আল্লাহ্ একজন এবং একক। তবে তার ৯৯টি গুণ বা আমল বা কাজ আছে। যেমন তিনি স্রষ্টা হিসেবে খালেক। পালনকর্তা হিসেবে রাব্ব্। মৃত্যুদাতা হিসেবে মালেকুল মাউত বা মৃত্যুর মালিক। মৃত্যুর কাজটির জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা শুধু হুকুম দেন বা ইচ্ছা করেন। তা পালন করেন ফিরিস্তা বা মালাক আজরাইল (আ.)।

আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয়না। তিনি যখন যা ইচ্ছা করেন, তা হয়ে যায়। কোন কোন কাজ ফিরিস্তা বা মালাক এর মাধ্যমে হয়। কোনো কোনো কাজ সরাসরি হয়। কোন কোন কাজ সরাসরি হয়ে যায় না। আল্লাহ্ তায়ালার বান্দাহ আছে। ফিরিস্তা বা মালাক কর্মচারী আছে। কিন্তু সমকক্ষ বা কুফুউন কেউ নেই। অংশীদার বা শরীক নেই।

একমাত্র ঈশ্বর

ঋগবেদে বর্ণনা করা হয়েছে "তাঁকে (একমাত্র ঈশ্বরকে) ছাড়া আর কাউকে উপাসনা বা পূজা করো না। তিনি একমাত্র ঈশ্বর।" – "ঋগবেদ, মন্ডল-৮, সূক্ত-১, শ্লোক-৮ ঃ ১)। কয়েকটি শ্লোক নিয়ে হয় একটি সূক্ত।

একম ইভা দ্বিতীয়ম

ইসলাম ধর্মের পবিত্র বাক্য "কালিমা তাইয়েবা" এর ন্যায় হিন্দু ধর্মেও একাধিক পবিত্র বাক্য বা কালিমা আছে। একটি তাওহীদ বা একত্বসূচক পবিত্র বাক্য হলো "একম ইভা দ্বিতীয়ম"। আর একটি একত্বসূচক বাক্য হল "একম ব্রহ্মা। দ্বিতীয় নাস্তি, ন্যস্ত, নেহন। নাস্তি কিঞ্চন।" এর অর্থ হলো–ব্রহ্মা আমি। দ্বিতীয় নাই। নাই নাই। কিঞ্চিত নাই, আদৌ নাই।

হিন্দুধর্মে একত্ববাদের মন্ত্র হল এক-ম ইভা দ্বিতীয়-ম। এক-ম অর্থ এক আমি। মে এবং ম শব্দের অর্থ আমি। ম একটি শব্দ্। যেমন ইংরেজীতে A বা I এক একটি শব্দ। ইভা শব্দের অর্থ না, নয়, নেই। 'দ্বিতীয়' এর পর 'ম' অক্ষরটির অর্থ দ্বিতীয় আমি। এক-ম বা দ্বিতীয়-ম মন্ত্রটির শাব্দিক অর্থ দাড়ায় "এক আমি। নাই দ্বিতীয় আমি"। এর অর্থ হল আমি ঈশ্বর এক। আমার দ্বিতীয় নেই।

এক-ম ইভা দ্বিতীয়-ম

ঈশ্বর এক-ম ইভা দ্বিতীয়-ম, হিন্দুদের একটি মৌলিক বাণী। এটি ইসলাম ধর্মের কালিমা তাইয়েবার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ। "এক-ম ইভা দ্বিতীয়-ম' বাক্যটির অর্থ কি ?

এক-ম অর্থ এক আমি (One এবং একক Unique) 'ইভা' নেই এবং দ্বিতীয়-ম শব্দ দু'টি সংস্কৃত। এক শব্দটি সংস্কৃত এবং বাংলা। ইভা অর্থ নাই বা নেই। দ্বিতীয়-ম অর্থ দ্বিতীয় আমি। "এক-ম ইভা দ্বিতীয়-ম" শব্দত্রয়ের বা পঞ্চ

www.nagorikpathagar.org

শব্দের অর্থ হলো– এক আমি নেই দ্বিতীয় আমি। 'এক-ম ইভা দ্বিতীয় ম' মন্ত্রটি আছে ছান্দোগ্য উপনিষদে। –(ছান্দোগ্য উপনিষদ, খণ্ড-৬, অধ্যায়-২, শ্লোক-১, ৬; ২ঃ ১)।

ব্রহ্ম স্তত্র বা তৃতীয় একেশ্বর মন্ত্র

হিন্দু বেদান্ত (বেদের অন্ত) উপনিষদের একটি মন্ত্র বা শ্লোক হলো একম (এক আমি) ব্রহ্মা (স্রষ্টা), দ্বিতীয়া (দ্বিতীয়) ন্যস্ত (নেই) নাস্তি (নেই), নেহন (নেই) কিঞ্চন (কিঞ্চিত বা মোটেই বা আদৌ)। শ্লোকটির অর্থ হল ঈশ্বর এক। দ্বিতীয় ঈশ্বর নেই। আদৌ নেই। কিঞ্চিত নেই বা মোটেই নেই।

ইসলাম ধর্মের মূল বাক্য কালিমা তাইয়েবা– "লা ইলাহা ইল্লাল্লা" বাক্যের অর্থ নেই কোন ইলাহা (প্রভু) আল্লাহু ছাড়া। এ বাক্যে 'লা' নেই এবং ইল্লা (ব্যতীত) না সূচক শব্দটি মাত্র দু'বার বলা হয়েছে।

হিন্দুধর্মের একেশ্বর বাদ বাক্যে দেখা যায় 'না' সূচক শব্দ (১) নাস্তি, (২) ন্যস্ত, (৩) নেহন, (৪) নাস্তি, (৫) কিঞ্চন (কিঞ্চিত) শব্দ– অন্য স্রষ্টা নেই, আদৌ নেই, কিঞ্চিত নেই, অর্থে পাঁচবার ব্যবহার করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হল লা বা না শব্দের উপর গুরুত্বারোপ করা। এতে তো মনে হয় হিন্দু ধর্মে একেশ্বর তত্বটির গুরুত্ব ইসলাম ধর্ম অপেক্ষা কম নয়।

কালিমা তাইয়েবাতে না সূচক শব্দ আছে দু'টি (লা, ইল্লা)। হিন্দু ধর্মের একত্ববাদ মন্ত্রে না সূচক শব্দ আছে ছয়টি (ইভা, নাস্তি, ন্যস্ত, নেহন, নাস্তি, কিঞ্চন) তবুও মুসলিমগণ একেশ্বরবাদী। হিন্দুগণ বহু ঈশ্বরবাদী। মূলত হিন্দু এবং মুসলিমদের উপাস্য একজনই। আমাদের বোধি এবং অনুধাবনের মধ্যেই হয়েছে এ পার্থক্য।

একত্ব থেকে ত্রিত্ব

হিন্দু ধর্মে একত্ববাদের ওপর গুরুত্ব অবশ্যই আরোপ করা হয়েছে। তবে বিপরীত অর্থে। ঈশ্বর ছাড়া ঈশ্বর নেই। কিঞ্চিত নেই। আদৌ নেই। মোটেই নেই। বাক্যটির বিপরীতমুখী তাৎপর্য বা গুরুত্ব এত বেশী আরোপ করা হয়েছে যে– ঈশ্বর সত্বাকে শুধু একজন নয়, তিনজন এবং ত্রিত্ববাদে সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

পিত, পুত্র, দেবদূত

খৃষ্টানগণ গড, যীশু এবং গেব্রিয়েলকে তিন পৃথক সত্ত্বা কল্পনা করেন। [মাতা মেরী ত্রিত্ববাদের মধ্যে নেই।] এখানে (১) পিতা, গড, (২) পুত্র, ইছা, (৩) ফিরিস্তা বা জিব্রাইল মিলিয়ে একজন নয় বরং তিনজন।

www.nagorikpathagar.org

এটা শুধু খ্রীষ্টানগণ করেছেন তা নয় হিন্দুগণ ও স্রষ্টার একত্ববাদকে ত্রিত্বে সম্প্রসারিত করেছেন। ইয়াহদীগণ তা করেননি।

কর্ম-বিভাগ-জনিত ত্রিত্ববাদ

হিন্দুগণ অপেক্ষা এ ক্ষেত্রে নাসারা খৃষ্টানগণ আরো এগিয়ে আছেন। হিন্দুগণ বহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর শীবকে "একম ইভা দ্বিতীয়ম". এক ব্যতীত দ্বিতীয় নয় ঈশ্বরের তিন কর্ম বিভাগ জনিত রূপ বা সত্ত্বা আছে মনে করেন। অর্থাৎ, ঈশ্বর স্রষ্টা হিসেবে ব্রহ্ম। পালনকর্তা হিসেবে বিষ্ণু। শাস্তি দাতা বা ধ্বংসকারক হিসেবে শিব। এটা একই ঈশ্বরের তিন কর্মকারক রূপ।

হিন্দু ধর্মে পরমেশ্বর একজনই। কিন্তু তিন পদে থেকে কর্ম সম্পাদন করেন। সরকারী চাকুরীতে একজন কর্মকর্তার একটি মূল পদ থাকতে পারে এবং অপর দু'টি ভিন্ন পদের দায়িত্বও তিনি পালন করতে থাকেন। যদিও কর্মকর্তা ব্যক্তি একজন।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ

ঈশ্বর এক। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় নাই। এ বাংলা বাণীটির আরবী অর্থ– "লা ইলাহা ইলাল্লাহ" এর অনুরূপ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর শাব্দিক অর্থ হলো নাই প্রভু (ইলাহা) আল্লাহু ছাড়া (ইল্লাল্লাহ)। ইল্লাল্লাহ একটি শব্দ নয়। এটা যুক্ত শব্দ। ইল্লা অর্থ ব্যতীত বা ছাড়া। আল্লাহু অর্থ আল্লাহু বা মাবুদ বা প্রভু বা ঈশ্বর। ইল্লাল্লাহু যুক্ত শব্দের অর্থ হলো আল্লাহু ব্যতীত।

মাতৃ-পিতৃহীন ঈশ্বর

ঈশ্বরের কি পিতা-মাতা আছেন ? উপনিষদে এর জবাবও আছে। শ্বেতষ্য উপনিষদে লিখিত আছে তার (ঈশ্বরের) কোনো মাতা নেই। পিতা নেই। কোনো প্রভু নেই।–(শ্বেতষ্য উপনিষদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৩)। আল্লাহু তা'য়ালারও কোন প্রভু নেই। নেই কোনো মাতা-পিতা।

উপমাহীন ঈশ্বর

কোন উপমা বা উদাহরণ দিয়ে কি আল্লাহু তা'য়ালাকে বা ঈশ্বরকে বুঝা যায় ? ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম মতে তা পারা যায় না। শ্বেতষ্য উপনিষদের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, "তার মত কিছুই নেই"। – (শ্বেতষ্য উপনিষদ, অধ্যায়-৪, শ্লোক-১৯)।

ঈশ্বর সম্বন্ধে আরো বলা হয়েছে, তাঁর মত কিছুই নেই। যার মহিমা উজ্জ্বল (প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থাবলী, ভলিউম-১৫; উপনিষদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫৩; এস রাঁধা কৃষ্ণ, The Principal Upanisad, পৃষ্ঠা-৭৩৬, ৭৩৭)।

www.nagorikpathagar.org

উপমাহীন আল্লাহ্ তা'য়ালা

আল-কুরআনের সর্বাধিক পঠিত সূরা ইখলাস। সূরা ইখলাসে আল্লাহ্ তা'য়ালা স্বয়ং মানুষকে "অবগত করান, "তার সমতুল্য কেউই নেই"। সূরা ইখলাসে বলা হয়েছে "ওয়া লাম ইয়াকুন কুফুয়ান আহাদ" অর্থাৎ তার সমতুল্য বা সাদৃশ্য কেউ নেই। – (সূরা ইখলাস–১১২ ঃ ১১২ ৎ ৪)।

আল-কুরআনের সূরা শূরায় বলা হয়েছে "কোন কিছুই তার (আল্লাহ্ তা'য়ালার) সদৃশ্য নয়। তিনি সর্বশ্রোতা এবং জ্ঞাতা।–(সূরা শুরা-৪২ ঃ আয়াত-১১)।

উপরে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ঋগবেদে এবং উপনিষদে যা বলা হয়েছে তার অতিরিক্ত যদি কিছু পরবর্তীতে যোগ না হত- তা হলে মুসলিমদের কি কোন সন্দেহ হত যে, বেদ গ্রন্থ আল্লাহ্ তায়ালার নাযিলকৃত ?

মূল আদর্শ বিকৃতির প্রবণতা

হিন্দুদের রাম নেই। রাম রাজ্য নেই। মূল বেদ ও উপনিষদ নেই। আমাদের নবী রাসূল জীবিত নেই। কিন্তু আল হামদুলিল্লাহ "আল-কুরআন" অবিকৃত রয়ে গেছে। কিন্তু হাদীস কি আমরা কুরআনের আয়াতের মত অবিকৃত রাখতে সক্ষম হয়েছি? কল্পনা করুন! কুরআনুল কারীম যদি সাথে সাথে লেখা না হত এবং আল্লাহ্ তায়ালা নিজে এর হিফাজতের দায়িত্ব না নিতেন– তা হলে মওজু বা ভিত্তিহীন কল্পিত হাদীসের আলোকে আমাদের ইসলামের চেহারা কি হত !

বিগত এক শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরব সন্তান হলেন সউদী আরবের মরহুম রাজা ফয়সাল। আরবদের অর্থ সম্পদ এত প্রচুর যে, তারা ইচ্ছা করলে ফয়সালের করবের উপর একটি তাজমহল তৈরী করতে পারতো। কিন্তু রাজা ফয়সাল অথবা সউদী রাজ পরিবারের কারো করবের একটি নিশানা পর্যন্ত নেই।

বিদআত প্রবণতা

হযরত খাদীজা (রা.) বা আয়শা (রা.), উসমান (রা.) এবং সাহাবীদের কবরস্থানের স্মৃতি আছে, ঠিকানা আছে, কিন্তু কবরের নিশানা নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জীবনে কত খতম তারাবী পড়েছেন! হযরত আবূ বাকর (রা.) কি একবার জামাতে "খতম তারাবী" পড়েছেন! সাহাবীগণ কে কতবার হজ্জ করেছেন! আমাদের ইমাম আবূ হানিফা (রা.) কতবার হজ্জ করেছেন? ২০০৮ সালের বাংলাদেশ সরকারী হজ্জ টীমের একজন ভলান্টিয়ার ২৮ বার হজ্জ করেছেন। আলহামদু লিল্লাহ। মূল কথা হলো, অতি ভক্তদের হাতে পড়ে মূল বিষয়বস্তুর গুরুত্ব এবং চেহারা মূলের মত থাকে না।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর রওযা মুবারক থাকে অন্ধকার ! দেশে দেশে ইসলাম কত বিচিত্র। আমাদের সমাজে শিরক এর ভয়াভহতার প্রেক্ষাপটে লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে প্রবর্তিত হিন্দু ধর্মের বর্তমান রূপ দেখে আশ্চর্য হওয়ার কি কিছু আছে !

৭
নিরাকার ঈশ্বর

যজুর্বেদে বলা হয়েছে, ঈশ্বর নিরাকার এবং পবিত্র (যজুর্বেদ, অধ্যায়-৪০, শ্লোক-৮)। যজুর্বেদে আরো বলা হয়েছে, ঈশ্বর আলোময়, নিরাকার, নিস্পৃশ্য, তিনি বিশুদ্ধ। শয়তান তাকে বিদ্ধ করতে পারে না। তিনি অদৃশ্য, প্রাজ্ঞ। তিনি সব কিছু পরিবেষ্টনকারী। তিনি স্বয়ম্ভু (শিব)। তিনি যখন যা ইচ্ছা তাই করেন। তিনি চিরঞ্জীব। (যজুর্বেদ, অধ্যায়-৪০, শ্লোক-৮; ঃ রাল্ফ আহ এইচ গ্রীফিথ, সংকলিত যজুর্বেদ সংহিতা, পৃষ্টা ৫৩৮)।

ঈশ্বর সম্পর্কে অথর্ববেদে বলা হয়েছে, "অবশ্যই তুমি আলোময় (নূর)। তোমার প্রকাশ মহান (সুবহান)। তুমি সত্য (হাক্ক)। তুমি অদ্বিতীয়। যেহেতু তোমার প্রকাশ মহান, তাই তোমার মহানত্ব সর্ব স্বীকৃত। সত্যই মহান তোমার গুণাবলী হে মহা ঈশ্বর"। (উইলিয়াম ডেউইট হুইটনি, অথর্ববেদ সংহিতা, ভলিউম-২, পৃষ্ঠা-৯১০)। উপরোক্ত মর্মে আল কুরআনে বহু আয়াত আছে।

যজুর্বেদে বলা হয়েছে ঈশ্বর কল্পনার অতীত। তাকে কল্পনা করা যায় না, তার কোন আকার নেই (যজুর্বেদ, অধ্যায়-৩২, শ্লোক-৩)। যে ঈশ্বরের কোন আকার নেই, যিনি কল্পনার অতীত, তার লক্ষ লক্ষ প্রতিমূর্তি বা প্রতিমা কী করে হতে পারে ?

অতীত কল্পনার ঈশ্বর

তিনি (ঈশ্বর) হচ্ছেন এমন সত্ত্বা তার কোন প্রতিমা কল্পনা করা যায় না। ঈশ্বরের বিষয়ে কোন কল্পনা করা যায় না। তিনি এমন সত্ত্বা যিনি জন্ম গ্রহণ করেন নি। তিনি আমাদের উপাসনার যোগ্য। (যজুর্বেদ অধ্যায়-৩২, শ্লোক-৩)।

যজুর্বেদে বলা হয়েছে– ঈশ্বর কোন কিছু থেকে বা কারো থেকে জন্ম নেননি। তিনি আমাদের উপাসনার উপযুক্ত (দেবী চাঁদ এম.এ. সংকলিত যজুর্বেদ, পৃষ্ঠা-৩৭৭)।

আল কুরআনের সূরা ইখলাসে বলা হয়েছে, "তিনি (আল্লাহ্) কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি (সূরা ইখলাস-১১২ : আয়াত-৩)।

www.nagorikpathagar.org

আল কুরআনে সূরা ফাতিহায় বলা হয়েছে, "ইয়্যাকা নাবুদু" আমরা এক মাত্র তোমারই ইবাদত (আরাধনা) করি। শুধু তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি (সূরা ফাতিহা- ১, আয়াত-৪)।

যজুর্বেদের একটি প্রার্থনা

যজুর্বেদের একটি প্রার্থনা নিম্নরূপ ঃ হে ঈশ্বর! আমাদের সুপথে পরিচালিত করুন। আমাদের ঐ সমস্ত পাপ রাশি মুছে ফেলুন যা আমাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করে ও বিভ্রান্ত করে (যজুর্বেদ, অধ্যায়-৪০, শ্লোক-১৬)।

আল কুরআনের সূরা ফাতিহায় বলা হয়েছে, "আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর, তাদের পথ, যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ। তাদের পথ নয়, যারা তোমার ক্রোধে নিপতিত এবং পথভ্রষ্ট (আল কুরআন, সূরা ফাতিহা-১, আয়াত-৫, ৬, ৭)।

ঈশ্বর অদৃশ্য

হিন্দু ধর্ম মতে ঈশ্বর অদৃশ্য। তাকে কোন সৃষ্টি তার নয়ন দ্বারা দেখতে পায় না। উপনিষদে বলা হয়েছে- "তার (ঈশ্বরের) রূপ দেখা যায় না। কেউ তাঁকে চোখে দেখেনি"। (শ্বেতষ্য উপনিষদ, অধ্যায়-৪, শ্লোক-২০)।

আল কুরআনে বলা হয়েছে, "(সৃষ্টির) দৃষ্টি বা নয়ন সমূহ তাঁকে (আল্লাহ্কে) অবধারন করতে পারে না। কিন্তু, তিনি (আল্লাহ্ তা'য়ালা) অবধারন করেন সকল সৃষ্টি" (আল কুরআন, সূরা আনআম ৬ ঃ ১০৩)।

মূর্তি পূজা

হিন্দুদের মধ্যে মূর্তিপূজা এবং নিরাকার ঈশ্বরের পূজা অতীতে ছিল। অতি সুদূর অতীতে ছিল একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের পূজা। এখন সাকার ঈশ্বরের পূজা বা মূর্তিপূজাই হিন্দুধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঈছাই ধর্মে হযরত ঈছা কতটুকু আছেন?

যজুর্বেদে বলা হয়েছে– ঈশ্বরের কোন প্রতিরূপ অথবা প্রতিমা নেই। (যজুর্বেদ, অধ্যায়-৩২, শ্লোক-৩)।

'তাঁর (ইশ্বরের) মহিমা অত্যন্ত মহান। তিনি তাঁর মধ্যে সকল উজ্বল বস্তু ধারণ করেন। যেমন তিনি সূর্যকে ধারণ করেছেন। আমার প্রার্থনা এই– তিনি যেন আমার অকল্যাণ না করেন।'

প্রতিমা পূজা

যজুর্বেদের একটি শ্লোক হল- ঈশ্বর ন তস্যত প্রতিমা অস্তি। সংস্কৃত ন অর্থ নাই, নেই। তস্যত অর্থ তাঁর। প্রতিমা অর্থ মূর্তি। অস্তি অর্থ আছে। "ন তস্যত প্রতিমা অস্তি" অর্থ হল- না আছে তার কোন প্রতিমা। এ শ্লোকের শেষ শব্দ অস্তি

www.nagorikpathagar.org

এর শ্লোকে প্রথমে ন থাকার কারণে অর্থ হয়ে যায়– আছে না বা নেই। এটা ইংরেজী ***Have not*** এর অর্থ নেই এর অনুরূপ।

ভগবত গীতায় আছে, "যাদের বুদ্ধি এবং মেধা বস্তু পূজার ইচ্ছায় আচ্ছন্ন, তারা সাকার ঈশ্বরের অনুগত"। (ভগবত গীতা, অধ্যায়-৭, শ্লোক-২০)। বস্তু পূজারীগণ তাদের প্রকৃতি অনুসারে পূজনীয় বস্তু এবং পূজার নিয়ম-কানুন অনুসরণ করেন।

বর্তমানে হিন্দু ধর্মের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–মূর্তি পূজা। মূর্তি পূজার কারণ তারা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন। কোন কাজ সঙ্গত অথবা অসঙ্গত যে কোন একটি হতে পারে। সঙ্গত অথবা অসঙ্গত যাই হোক না কেন, কাজটি সম্পন্ন করার পর ইচ্ছা করলে কাজটি সম্পাদনের পেছনে যুক্তি দাঁড় করানো যায়। কিন্তু ঈশ্বরের কোন প্রতিরূপ বা প্রতিমা বা মূর্তি নেই। (যজুর্বেদ, অধ্যায়-৩২, শ্লোক-৩)।

প্রাকৃতিক শক্তি পূজা

প্রাকৃতিক কি কি বস্তুর পূজা করা হয় ? চন্দ্র, সূর্য, ইত্যাদি গ্রহ, নক্ষত্র প্রাকৃতিক শক্তি। অগ্নি, জল, বায়ু, ইত্যাদি, প্রাকৃতিক বিষয়। অগ্নি দেবতা, জল দেবতা, বায়ু দেবতার পূজা করা হয়। চন্দ্র, সূর্য, ইত্যাদি প্রাণহীন বিবেচনা করা হয় না। বরং এগুলো সর্বোচ্চ এবং সর্ব চেতন দেবতার আসনে অধিষ্টিত।

যজুর্বেদ অনুসারে এ সব প্রাকৃতিক শক্তির পূজা করা অন্ধকারে প্রবেশ করার মত। আরবী 'যুলমাত' শব্দের অর্থ অন্ধকার, জাহেলিয়াত শব্দের অর্থ মূর্খতা, অন্ধকার, প্রাণের অভাব, ইত্যাদি।

বস্তু পূজা

বস্তু পূজা সম্পর্কে যজুর্বেদে বলা হয়েছে– তারা অন্ধকারে জাহেলিয়াতে প্রবেশ করে, যারা প্রাকৃতিক শক্তির পূজা করে। যেমন বায়ু, জল, অগ্নি, ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তি পূজা অনেকে করে। তারা গভীর এক অন্ধকারে ডুবে যায়– যারা শম্ভূতি পূজা করে। (যজুর্বেদ, অধ্যায়-৪০, শ্লোক-৯)। শম্ভূতি অর্থ হলো– প্রতিমা, মূর্তি, চেয়ার, টেবিল, ইত্যাদি মানব সৃষ্ট বস্তু।

মূর্তি, প্রতিমূর্তি, পুতুল, গৃহ, মন্দির, মাসজিদ, চেয়ার, টেবিল, ইত্যাদি প্রাণহীন বস্তু বা শম্ভূতি। যজুর্বেদে বলা হয়েছে, যারা মানুষের তৈরী সৃষ্ট বস্তুর উপাসনা বা পূজা করে, তারা গভীর মূর্খতা, বা জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত। (Ralph I. H. Griffith সংকলিত যজুর্বেদ সংহিতা পৃষ্ঠা-৫৩৮)।

যজুর্বেদের প্রার্থনার মধ্যে আছে–যা আল-কুরআনে বলা হয়েছে– "আমাদের এরূপ পাপরাশি মুছে ফেলুন।" (যজুর্বেদ, অধ্যায়-৪০, শ্লোক-১৬)। আল

www.nagorikpathagar.org

কুরআনের প্রথম সূরা–সূরা ফাতিহার মর্মবাণীও তাই– আমাদেরকে সরল পথে (সিরাতুল মুসতাকামে) পরিচালিত করুন। যা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে এবং বিভ্রান্ত করে–(ধোয়াল্লীন) তাদের পথে নয়–যারা অভিশপ্ত (সর্ব প্রথম সূরা ফাতিহা)।

ঈশ্বর সম্পর্কে বলা হয়েছে, "দেব মহাঅসী অর্থাৎ ঈশ্বর মহান অসীম" (অথর্ববেদ, খণ্ড-৩০, অধ্যায়-৫৮, শ্লোক-৩)।

জাহেলিয়াত (অন্ধকার)

বস্তু পূজা সম্পর্কে যজুর্বেদে বলা হয়েছে, যারা প্রাকৃতিক কোন বস্তু বা শক্তি পূজা করে তারা অন্ধকারে (জাহেলিয়াতে) প্রবেশ করে। তারাই অন্ধকারে প্রবেশ করে যারা প্রাকৃতিক শক্তি পূজা করে। যেমন- বায়ু, পানি, অগ্নি ইত্যাদিকে পূজা করা হয় (যজুর্বেদ, অধ্যায়-৪০, শ্লোক-৯)।

তারা গভীরতর অন্ধকারে ডুবে যায় যারা- শম্ভুতির পূজা করে। শম্ভুতি হল মানব সৃষ্ট বস্তু যেমন- মূর্তি, প্রতিমা, চেয়ার, টেবিল, ইত্যাদি। (যজর্বেদ, অধ্যায়-৪০, শ্লোক-৯)। শিবের অপর একটি নাম হলো শম্ভুতি। একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে।

উপদেবতা

দেবতা, উপদেবতা সম্পর্কে ভগবদ গীতায় বলা হয়েছে, "যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি পার্থিব কোন বস্তু দ্বারা চুরি হয়ে গেছে, তারাই উপদেবতার উপাসনা করে"। যারা পার্থিব বস্তুর সন্ধানে থাকে, তারা বস্তুবাদী। তারা উপদেবতার পূজা করে। প্রতিমা একটি উপদেবতা। জড়বাদী বা বস্তুবাদীগণ ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করে প্রতিমা পূজায় ব্যস্ত থাকে (ভগবদ গীতা, অধ্যায়-৭, উপধারা-২০)।

ভগবদ গীতায় আরও বলা হয়েছে, মহান সত্ত্বা জন্মের পূর্ব থেকেই আমাকে জানেন। তার কোন আদি নেই। অন্ত নেই। তিনি জগত সমূহের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী (ভগবদ গীতা, অধ্যায়-১০, শ্লোক-৩)।

www.nagorikpathagar.org

৩য় অধ্যায়

৮

কল্কি পুরাণে মুহাম্মাদ (সা.)

আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ইবন আবদুল্লাহ্ শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য নবী ও রাসূল হিসাবে প্রেরিত হননি। তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন সমগ্র মানব জাতিকে পথ প্রদর্শন এবং তাদের হিদায়াতের জন্য।

স্রষ্টা-প্রদত্ত জীবন দর্শন পরিত্যাগ করলে আদমের আওলাদের মহা ক্ষতি হবে–ঐ বিষয়ে মানুষকে সতর্কের জন্য ঘটেছিল বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর আগমন। নবী হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আগমনের বিষয় মানব জাতির কাছে নাযিলকৃত অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ থাকা নিতান্ত স্বাভাবিক।

কল্কি অবতারের নাম

হিন্দু ধর্ম শাস্ত্র ভবিষ্য পুরাণে বর্ণিত আছে যে, "একটি বিদেশী ভাষা ভাষী একজন ম্লেচ্ছ (বিদেশী) আধ্যাত্মিক শিক্ষকের আবির্ভাব ঘটবে। তিনি শীষ্যসাথী পরিবেষ্টিত থাকবেন। তাঁর নাম হবে মোহ-মদ। ভারতের রাজা ভোজ এই দেব প্রকৃতির মোহ দেব আরবকে পঞ্চগঙ্গা এবং গঙ্গাজলে স্নান করাবেন। (অর্থাৎ তাঁকে পবিত্র জলে বিশুদ্ধ করবেন এবং তাঁকে, অর্পন করবেন অনেক ভক্তি এবং বলবেন)।

'আমি আপনার আনুগত্য স্বীকার করি। হে মানবতার গৌরব! পবিত্র স্থানের অধিবাসী। আপনি শয়তান দানবকে হত্যার জন্য বিরাট বাহিনী সৃষ্টি করেছেন। আপনি আপনার নিজেকে ম্লেচ্ছ প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে, মূর্তিপূজক এবং অসভ্যদের থেকে আত্মরক্ষা করে চলুন।"

"হে মহাপবিত্র ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি! সর্ববৃহৎ দেবেশ্বর। আমি আপনার দাস। দাস হিসাবে আমাকে আপনার পদতলে আশ্রয় দিন।" (ভবিষ্য পুরাণ)।

ভবিষ্যপুরাণে আরো বলা হয়েছে–"ম্লেচ্ছগণ অতি পবিত্র এবং পরিচিত আরব ভূমিকে বিনষ্ট করে ফেলেছে। ঐ দেশে আর্য ধর্মের কোন অস্থিত্ব নেই।" (ভবিষ্যপুরাণ)।

ভবিষ্যপূরাণে কল্কি অবতারকে সুস্পষ্ট ভাষায় মোহমদ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ভিন্ন অন্য কোন নবী মুহাম্মাদ বা মোহ-মদ নামে অন্য কোন ধর্ম গ্রন্থে উল্লেখিত হননি।

কল্কি পূরাণে উল্লেখিত কল্কি অবতার বা দেবতার নাম হবে 'সর্বানম' অথবা সর্ব-আনম'। "আনম" শব্দের অর্থ হল, যার নাম উল্লেখ করে নমনম বা স্তবস্তুতি করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

স্তবস্তুতি হল দেবতাদের প্রশংসা কীর্তন। সর্ব শব্দের অর্থ হলো সকল বা সমস্ত। কল্কি দেবতা হলেন সর্বানম অর্থাৎ সকলের নম বা প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত।

সুশ্রম

কল্কি অবতারের আর একটি নাম হচ্ছে সুশ্রম। সংস্কৃত ভাষায় সুশ্রম শব্দের একটি অর্থ সু-প্রশংসিত অথবা প্রশংসারযোগ্য (ঋগবেদ)। প্রশংসার যোগ্য শব্দদ্বয়ের আরবী প্রতিশব্দ মুহাম্মাদ (সা.)। সমগ্র বিশ্বের কোটি কোটি মুসলিম প্রতিদিনই তাঁর প্রশংসাসূচক দরূদ এবং সালাম পাঠ করে। মানব জাতির মধ্যে অন্য কোন ধর্ম প্রচারকের প্রশংসাসূচক এরূপ সর্বস্তুতি বা নাত পেশ প্রতিদিন নিয়মিত করা হয় না।

বস্তুত হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নাম 'মুহাম্মাদ' শব্দটি একটি সর্বস্তুতি বা প্রশংসাসূচক নাম। আরবী মুহাম্মাদ শব্দটির অর্থ প্রশংসিত। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ক্ষেত্রে এ মুহাম্মাদ শব্দটি সমগ্র মুসলিম জাতির পক্ষ থেকে স্রষ্টার দূত এর প্রতি সার্বজনীন প্রশংসা হিসেবে বিবেচিত হয়।

বেদ গ্রন্থ সমূহে কল্কি অবতারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কলি যুগের বা সর্বশেষ যুগের সর্বশেষ অবতারের নাম হচ্ছে বেদ শাস্ত্র মতে 'নরাশংস'। সংস্কৃত ভাষায় নরাশংস শব্দের অর্থ "প্রশংসিত"। ৫৭০ খৃষ্টাব্দে আরবে জন্ম গ্রহণকারী নবীর নাম মুহম্মাদ (সা.)। আরবী মুহাম্মাদ শব্দের অর্থ প্রশংসিত। এলাহাবাদ শহরস্থ প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মাচার্য অধ্যাপক ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় মহোদয়ের মতে আরবী মুহাম্মাদ এবং সংস্কৃত নরাশংস একার্থবোধক শব্দ।

কল্কির অবতার

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে কল্কি পুরাণে (কলি যুগে প্রেরিত পুরাণ গ্রন্থে) অবতারের আগমন সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। কল্কি এবং কলি একই অর্থবোধক শব্দ। এ শব্দ দুটির অর্থ হচ্ছে পাপ। কল্কি যুগ অথবা কলি যুগ অর্থ পাপের যুগ। কল্কি অবতারের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে- তা পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম প্রচারক অপেক্ষা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য।

হিন্দুদের বিশ্বাস এটা যে, সমগ্র মানবতার জন্য ত্রাণকর্তা হিসাবে একজন অন্তিম ঋষি বা চুড়ান্ত অবতারের আবির্ভাব হবে। যিনি তাঁর অনুসারীদের সকল পাপ বিনাশ করবেন এবং সমগ্র মানবতার প্রতি হবেন আর্শিবাদ স্বরূপ।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে ঐ চুড়ান্ত অবতার সম্পর্কে কিছু নিদর্শন উল্লেখ করা হয়েছে যার দ্বারা সর্বশেষ বা চুড়ান্ত অবতারকে চিহ্নিত করা সহজ হয়। হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রে উল্লেখিত চূড়ান্ত অবতারের বৈশিষ্ট্য সমূহ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

যে সব ঘটনার উল্লেখ হিন্দুধর্ম গ্রন্থে ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে–এর অনেকগুলো হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জীবনে সংঘটিত হয়েছে। কল্কি অবতার বা কলিযুগের অবতার সম্পর্কে যে সমস্ত কথা হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে– এর কিছু কিছু ইঙ্গিত এখানে করা যেতে পারে।

মাতা-পিতা

কল্কি অবতারের পিতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে বৈষ্ণব, বিষ্ণু দাস এবং মাতার নাম সুমতি। (কল্কি পূরাণ, অধ্যায় ২, শ্লোক-২)। বৈষ্ণব শব্দের অর্থ হল ঈশ্বরের দাস এবং সুমতি শব্দের অর্থ হলো শান্তি ও স্নিগ্ধতা। বিষ্ণু হলেন একজন ঈশ্বর। বিষ্ণু দাস অর্থ হল ঈশ্বরের দাস।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পিতার নাম আবদুল্লাহ। আরবী আবদ্ শব্দের অর্থ হল দাস। আবদ্ এবং আল্লাহু এই দুটি শব্দ সংযুক্ত হয়ে আরবী ব্যকরণ অনুসারে তৈরী হয়েছে আব্দুল্লাহ শব্দটি। আবদুল্লাহ শব্দের অর্থ হল আল্লাহু- বান্দা বা আল্লাহুর দাস।

রাসূল (সাঃ) এর মায়ের নাম আমিনা। আরবী আমিনা শব্দটির অর্থ হল আমান, শান্তি ও স্নিগ্ধতা। এখানে দেখা যায়– কল্কি দেবতার পিতার নাম বৈষ্ণব ও বিষ্ণু দাস এবং মাতার নাম সুমতি শব্দগুলোর সাথে আবদুল্লাহ এবং আমিনা শব্দের আশ্চর্যজনক মিল বা নৈকট্য লক্ষ্য করা যায়।

বিষ্ণু এবং বিষ্ণুব্যাস বা বিষ্ণুর দাস শব্দ দ্বয়ের অর্থ কি? বিষ্ণু হলেন হিন্দুদের তিন ঈশ্বরের অন্যতম। ব্যস অর্থ চাকর। এর অর্থ ভগবান বা মানুষও হয়। বিষ্ণু ব্যাস এ দু'শব্দের অর্থ হলো ঈশ্বর বিষ্ণুর দাস বা পূজারী। আরবী আবদুল্লাহ্ শব্দের অর্থ হল আল্লাহুর আবদ বা দাস এবং উপাসনাকারী।

কল্কি পূরাণ এবং ভাগবত পূরাণে উল্লেখ করা করা হয়েছে যে, কল্কি অবতারের পিতা কল্কির অবতারের জন্মের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করবে (কল্কি পূরাণ, ভাগবত পূরাণ-১২)। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর পিতা তাঁর মাতৃগর্ভে থাকা কালেই মৃত্যুবরণ করেন। কল্কি অবতারের মাতা তাঁর জন্মের ছয় বছরের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেন।

এ তথ্য থেকেও বুঝা যায়, হিন্দুধর্মের কল্কির অবতার হবে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)। কারণ, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জন্মের কয়েক মাস পূর্বেই তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন– তিনি মাতৃগর্ভে থাকাকালেই। শিশু মুহাম্মাদের ছয় বছর বয়ক্রমকালে তাঁর মাতা ইন্তিকাল করেন।

www.nagorikpathagar.org

কল্কি অবতারের বংশ মর্যাদা

ভাগবত পূরাণে উল্লেখ করা হয়েছে যে কল্কি অবতারের জন্ম হবে ব্রাহ্মণ বা মহান্ত পরিবারে। ব্রাহ্মণ এবং মহান্ত শব্দ দুটির অর্থ হলো সর্বোচ্চ ব্রাহ্মণ বা মহান্ত বা উপাসক। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জন্ম মক্কার কুরাইশ বংশে এবং হাশিম পরিবারে। কুরাইশ বংশ আরবের সবচেয়ে সম্মানিত বংশ। এ বংশের হাশিম উপবংশ বা পরিবার ছিল আরবের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবার।

হযরত মুহাম্মাদের (সাঃ) পিতা আবদুল্লাহ্ বিবাহের পর পুত্রের জন্মের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পিতামহ আবদুল মোতালিব ছিলেন তদানিন্তন মক্কা– তথা সমগ্র আরবের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। ভাগবত পুরাণ অনুসারে কল্কি অবতারের জন্ম যে ব্রাহ্মণ মহান্ত পরিবারে হওয়ার কথা–সেরূপ একটি পরিবারই ছিল আবদুল মোতালিব পরিবার। মুতালিব পরিবার ছিল হাশিমী বংশ ও কুরাইশ গোত্র ভুক্ত।

কল্কিপূরাণে বলা হয়েছে, আরব দেশে এক তারকার উদয় হবে এবং আরব দেশ গৌরব এবং সম্মানের অধিকারী হবে। কল্কি পূরাণের পর কোন অবতারের আবির্ভাব হবে না। অর্থাৎ তিনি সর্বশেষ প্রেরিত পুরুষ। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আবির্ভাবের সময় সমগ্র আরব ছিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তিনি মানব জাতির জন্য একজন উজ্জ্বল উৎকৃষ্ট মানব হিসাবে আবির্ভূত হন।

ভবিষ্যপুরাণে কল্কি অবতার সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হয়েছে যার সাদৃশ্য আরবের হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মধ্যে পাওয়া যায়। ভবিষ্যপুরাণ 'মোহমদ' এবং 'আহমাদ' এ দুটি শব্দে আরব নবীর নামেরও ইঙ্গিত রয়েছে (ভবিষ্যপুরাণ, তৃতীয় খন্ড, ৩-৩; ৫-২৭)।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে আল-কুরআনুল করীমে বলা হয়েছে "আমি আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি রহমত (করুণা) রূপে প্রেরণ করেছি (আল্-কুরআন, সূরা আম্বিয়া ২১ঃ১০৭)"। "কত মহান প্রভু তিনি যিনি (আল্লাহ্) তার বান্দার (নবী মুহাম্মাদ) প্রতি ফুরকান (সত্য এবং ভ্রান্তির মধ্যে পার্থক্যকারী) অবতীর্ণ করেছেন- যাতে তিনি বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারী (নাজির) হতে পারেন" (আল্-কুরআন, সূরা ফুরকান ২৫ঃ১)।

আল-কুর'আনে আরো বলা হয়েছে, আমি তো আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে সু-সংবাদদাতা (বাছীর) এবং সতর্ককারী (নাজীর) রূপে প্রেরণ করেছি (আল্-কুরআন, সূরা সা'বা ৩৪ঃ২৮)। আল-কুর'আনে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে উল্লেখ করা হয়েছে উম্মি রাসূল হিসাবে। যেমন- "যারা বার্তাবাহক উম্মি (নিরক্ষর) রাসূল কে অনুসরণ করে- যার উল্লেখ রয়েছে তাওরাত এবং ইঞ্জিলে- যা তাদের কাছে রক্ষিত আছে" (সূরা আরা'ফ ৭ ঃ ১৫৭)।

www.nagorikpathagar.org

জন্ম তারিখ

কল্কি পূরাণে বলা হয়েছে যে, কল্কি অবতারের জন্ম হবে ১২ই বৈশাখ (কল্কি পূরাণ, অধ্যায়-২, শ্লোক-১৫)। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জন্ম ১২ই রবিউল আউয়াল। হিন্দু এবং হিন্দী শাস্ত্রে বৈশাখ হল অত্যন্ত সম্মানিত এবং বিখ্যাত মাস।

হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে কল্কি দেবতার জন্ম হবে ৬২৮ বাকরমি সনের ১২ই বৈশাখ। কল্কি অবতারের জন্ম তারিখ ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই বৈশাখ এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জন্ম ১২ই রবিউল আউয়াল এর মধ্যে সাদৃশ্য আছে। ইংরেজী ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মুহাম্মাদের মৃত্যু হয়। কল্কি দেবতার জীবনকাল এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জীবনকাল কাছাকাছি।

হিন্দুদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ হল তুলসী দাস রচিত মহা-উপাখ্যান রামায়ন। সংগ্রাম পূরাণের ১২ খন্ডে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে যার বর্ণনা করা হয়েছে তার কিছু কিছু রামায়ণে উল্লেখ করা হয়েছে।

সূর্যসম চারজন ঋষি

এ প্রসঙ্গে তুলসী দাস বলেন "আমি কারো প্রতি মুগ্ধ হয়ে শাস্ত্রীয় কথা বলতে চাই না। বেদ এবং পূরাণ গ্রন্থ সমূহে সাধু ও ঋষিগণ যা বর্ণনা করেছেন তাতেই আমি আমার বক্তব্য সীমিত রাখব"। "কল্কি অবতার জন্মগ্রহণ করবেন সপ্তম বাকরামী শতাব্দীতে। তিনি আলোকিত হবেন তাঁর "চারজন সূর্যসম ঋষি" দ্বারা। তিনি আবির্ভূত হবেন গভীর তমসায় আচ্ছন্ন একটি দেশ ও সম্প্রদায়ে"।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর চারজন খলীফা (আবু বাক্‌র (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.), আলী (রাঃ) এর খ্যাতি এবং দ্বীপ্তি মুসলিম বিশ্বে সূর্যের ন্যায়। তাদেরকে মুসলিমগণ, মুসলিম উম্মাহ্ বা জাতির সূর্য হিসাবে গণ্য করে। "কল্কি অবতার" তাঁর ধর্ম প্রচার করবেন প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সঙ্গে। তিনি সু-সংবাদ শুনাবেন এবং নিষিদ্ধ বিষয় ঘোষণা করবেন।

শ্রীকৃষ্ণের ভবিষ্যতবাণী

হিন্দু পূরাণ গ্রন্থসমূহে কল্কি অবতারের আগমন বার্তা ঘোষিত হয়েছে। কল্কিপূরাণে এবং মহাভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উচ্চারিত কল্কি অবতারের উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণের ভবিষ্যত বাণীটি শ্রবণ করেছেন শ্রীসুখ মুণি এবং অন্যেরাও।

মহাভাগবত এবং কল্কিপূরাণ মতে, কলি যুগের ৩৬৫৮ অব্দে সম্ভল গ্রামে কল্কি অবতারের আবির্ভাব ঘটবে। তিনি বিশ্বের পাপভার বহন করবেন। তাঁর পিতার নাম হবে বিষ্ণু দাস। তাঁর মাতার নাম হবে সুমতী। তাঁর জন্ম হবে নারমিশাক মাসের ১২ তারিখ সোমবারে।

www.nagorikpathagar.org

সূর্যোদয়ের দুই নাজাহিকাস সময়ে তাঁর জন্ম হবে। এক নাজাহিকাস সমান হল– এক ঘন্টার এক পঞ্চমাংশ। অর্থাৎ কল্কি অবতারের জন্ম হবে সূর্যোদয়ের পর এক ঘন্টার পাঁচ ভাগের দুই ভাগ পরে। কল্কি অবতারের মাতৃগর্ভে থাকাকালে তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটবে। তাঁর শিশুকালে মাতৃ বিয়োগ ঘটে। দুটাই ঘটেছে মুহাম্মাদ সা. এর ক্ষেত্রে।

নরাশংস (প্রশংসিত নর)

হিন্দুধর্মীয় শাস্ত্র অনুসারে ব্রহ্ম কর্তৃক প্রেরিত হয়ে কল্কির অবতার পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন এবং ধর্ম প্রচার করেছেন। ধর্ম বিদ্বেষীগণ যাই বলুক না কেন তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। নরাশংস ছিলেন কল্কির অবতার।

শুক্ল যজুর্বেদের ২৬ নম্বর মন্ত্রে মহৎ ও ক্ষুদ্র বলতে পদমর্যাদা সম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি এবং বালকদেরকে বুঝানো হয়েছে। ২৪ নম্বর মন্ত্রে দেখা যায় ঋষি নরাশংসের ধর্মযুদ্ধে মাতা এবং নারীগণও যোগদান করতেন।

কল্কি পুরাণের উপরোক্ত বক্তব্যের সাথে মুসলিম ধর্মগ্রন্থ আল্-কুর'আনের বাণীর সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। আল্-কুর'আনে বর্ণিত আছে, 'হে নবী, আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি সু-সংবাদদাতা হিসাবে, সতর্ককারী রূপে ও সাক্ষী হিসাবে (আল্-কুরআন, সূরা-আহযাব, ৩৩ ঃ ৪৫)।

আপনি প্রেরিত হয়েছেন আল্লাহ্র নির্দেশে। তাঁর (আল্লাহ্র) দিকে আহবানকারী রূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে (আল্-কুরআন, সূরা- আহযাব, ৩৩ ঃ ৪৬)। আপনি মুসলিমদেরকে সু-সংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট রয়েছে মহা অনুগ্রহ (আল্-কুরআন, সূরা- আহযাব, ৩৩ ঃ ৪৭)।

জন্মস্থান

ভাগবতপুরাণে কল্কি অবতারের জন্মস্থান বলা হয়েছে "সম্বল গ্রাম"। সম্বল গ্রাম এর অর্থ হলো সম্মানজনক গ্রাম যেখানে ব্রাহ্মণ মহান্ত (ধর্মীয় ঋষি) বাস করে থাকেন (ভাগবতপুরাণ, খন্ড ১২, শ্লোক-১৮; কল্কি পূরাণ অধ্যায়-২, শ্লোক-৪)।

সম্ভল শব্দের অর্থ হল শান্তি। সম্ভল গ্রাম অর্থ হল শান্তিধাম অর্থাৎ শান্তিনগর বা শান্তিপূর্ণ গ্রাম। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জন্মস্থান মক্কা নগরীতে। মক্কা ছিল আরবের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ স্থান। এটা ছিল ধর্মীয় তীর্থস্থান। ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক কল্যাণের জন্য মূর্তিপূজক আরবগণ আরবের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় নগরী মক্কায় মিলিত হতেন।

শান্তিপূর্ণ নগরী বিধায় মক্কা ছিল বাণিজ্য নগরী। মূর্তি পূজক আরবগণ নানাবিধ কুসংস্কার, পাপাচার, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও হত্যাকান্ডে লিপ্ত হত। যেহেতু মক্কায়

www.nagorikpathagar.org

এ ধরণের প্রবণতা কম ছিল– তাই এ নগরীটি আরবের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য কেন্দ্রে উন্নীত হয়।

আল্-কুর'আনে মক্কা-মুকাররামা বা সম্মানিত নগরীর উল্লেখ করা হয়েছে "বালাদুল আমিন" শব্দ দ্বয়ে। বালাদুল আমীন শব্দের অর্থ শান্তিপূর্ণ নগরী (সূরা ইব্রাহিম ১৪ঃ৩৫)। এ নগরীকে শান্তির নগরী হিসেবে উন্নীত করার জন্য হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্র কাছে মুনাজাত বা প্রার্থনা করেছিলেন।

গুহায় স্বর্গীয় দূত

এক পর্বত গুহায় স্বর্গীয় দূত পরশুরাম কল্কি অবতারকে স্বর্গীয় বাণী শিক্ষা দেন। পরশুরাম বলতে স্বর্গীয় দূত জিবরাইল (আ.) কে বুঝানো হয়েছে। জন্মস্থান পরিত্যাগ করে কল্কি অবতার উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন। পরবর্তীতে তিনি জন্মস্থান পরিত্যাগ (হিজরত) করে কল্কি অবতার উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে (মদীনায়) পলায়ন করেন। পরবর্তীতে অস্ত্র হাতে তিনি জন্মস্থানে (মক্কা বিজয়কালে) প্রত্যাবর্তন করেন।

কল্কি অবতার

বেদ পুরাণ এবং হিন্দুশাস্ত্র মতে কল্কি অবতার হলেন সর্বশেষ অবতার। তার আবির্ভাব হবে সর্বশেষ বা কলি যুগে। কল্কি অবতার প্রচারিত কল্কি মতবাদ হল পৃথিবীর সর্বশেষ মতবাদ। হিন্দু ধর্ম শাস্ত্র গবেষণা করে আবিষ্কার করতে হবে, কে এ শেষ অবতার অথবা কলিযুগের পাপযুগের কল্কি অবতার। বেদ গ্রন্থ সমূহে কল্কি অবতারের নাম, পরিচিতি, বৈশিষ্ট এবং লক্ষণ সমূহ বর্ণিত হয়েছে।

মরুস্থলে (মরুভূমি) আবির্ভাব

ভবিষ্য পুরাণে উল্লেখিত হয়েছে মরুস্থলে কল্কি অবতারের আবির্ভাব হবে। মরুস্থল শব্দটির অর্থ মরুভূমি অথবা বালুকাচ্ছাদিত বিরাট ভূমি। এ বিষয়টি পরিস্কার যে, কল্কি অবতার আবির্ভূত হবেন–ভারত থেকে নয় বরং মরুস্থল বা মরুভূমি থেকে।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ছাড়া অন্য কোন নবী সম্পর্কে ভবিষ্য পুরাণে উল্লেখিত মোহ-মদ শব্দটি প্রযোজ্য হতে পারে না। মরুস্থলের মধ্যে হযরত মুহাম্মাদ ভিন্ন অন্য কোন নবীর আবির্ভাব বহু শতাব্দী পর্যন্ত হয়নি।

এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিস্কার যে, আর্য ধর্মের আবির্ভাব ও বিকাশ আরবে হয়নি, হয়েছে ভারতে। আরব নবী পঞ্চ গয়াতে স্নান করেননি এবং গঙ্গা জল দিয়ে তাকে স্নান করানো হয়নি। পবিত্র গঙ্গা জল শব্দটি ভবিষ্য পূরাণে যে উল্লেখ রয়েছে তা একটি ভাষারীতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ দ্বারা গঙ্গা জল নয় পবিত্র জল বুঝানো হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

আরব দেশে পবিত্রতম পানি হল যমযমের পানি। যমযমের পানিতে হাজিগণ গোসল করেন। তারা মনে করেন যে, যমযমের পানি দিয়ে গোসলের ফলে দেহ এবং হৃদয় থেকে অনেক অপবিত্রতা দূরীভূত হয়। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে তাঁর অনুসারীগণ মাসুম বা নিষ্পাপ মনে করেন।

ভবিষ্য পূরাণে রাজা ভোজকে বলা হয়েছে "তোমার পূর্বেও বহু সৎপথভ্রষ্ট শয়তান বা পিশাচের আবির্ভাব হয়েছিল। যাদেরকে আমি ধ্বংস করেছি। অত্যন্ত শক্তিশালী শত্রু হিসেবে তাকে পুনরায় ভূ-খন্ডে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিভ্রান্ত শত্রুদেরকে সৎ পথ প্রদর্শনের জন্য এবং সু-নির্দেশনার জন্য বিখ্যাত মোহ-মদকে (মুহাম্মাদ) প্রেরণ করা হয়েছে। তাকে ব্রহ্ম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তিনি পিশাচদেরকে সঠিক ধর্মপথে আনয়নের জন্য চেষ্টা করেছেন। হে রাজা ভোজ! বর্বর পিশাচদের দেশে তোমার যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি যেখানে আছ সেখানেই থাক। আমার দয়ায় তুমি পবিত্রতা অর্জন করবে (ভবিষ্যপুরাণ)।

৯
কল্কি অবতার ও মুহাম্মাদ (সাঃ)

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে মুসলিমদের ধারণা, আদি যুগে হিন্দুদের মধ্যে তাওহীদ এবং এক ঈশ্বরবাদ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে হিন্দুগণ এক ঈশ্বরবাদ ত্যাগ করে বহু ঈশ্বরবাদ এবং প্রাণহীন মূর্তির পূজা প্রবর্তন করেছেন। তারা বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্মীয় নীতিমালাও যথা প্রয়োজন পরিবর্তন করেন। সকল মানুষের জন্য একই পূজা প্রবর্তন না করে হিন্দু ব্রাহ্মণগণ শ্রেণী স্বার্থে গোষ্ঠি পূজা প্রবর্তন করেন। এটা শুধু যে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে হয়েছে– তা নয়, খ্রীষ্টানগণও তাদের ধর্মে বহু মানবকৃত সংশোধনী এনেছেন।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো আলোচনা এবং বিশ্লেষণে বুঝা যায় যে, হিন্দুধর্মে একেশ্বরবাদ, তাওহীদ এবং ঈশ্বরের দূত হিসাবে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রসঙ্গ ও ভবিষ্যতবাণী বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

গৌতম বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী

গৌতম বুদ্ধ বলেছেন- আমি একমাত্র বুদ্ধ নই। আমার পরে যথাসময়ে একজন বুদ্ধের আবির্ভাব হবে। তাঁর নাম হবে মৈত্রিয়। কোন কোন বানানে মৈত্রেয়। মৈত্রিয় শব্দের অর্থ হলো মিত্রতা, দয়া, করুণা, অনুভূতি ও ভালোবাসা। এই গুণগুলীর আরবী অর্থ হল রহমত।

www.nagorikpathagar.org

আল-কুরআনুল কারীমে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে বর্ণনা করা হয়েছে 'রাহমাতুল্লিল-আলামীন' শব্দদ্বয়ে। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের প্রতি করুণা, অনুগ্রহ, দয়া এবং ভালবাসা হিসাবে (কুরআন)।

পর্বতে কল্কি অবতারের দৈববাণী লাভ

হিন্দুধর্ম গ্রন্থ কল্কি পূরাণে উল্লেখ আছে যে, দেবদূত "পরশুরামের" মাধ্যমে কল্কি অবতার পর্বত গুহায় দৈববাণী লাভ করবেন। এটা সর্বজন জ্ঞাত যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) হেরা পর্বত গুহায় জিব্রাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে নুবুওয়াত বা রিসালাতের (প্রেরিত পুরুষ) দৈববাণী লাভ করেন– তাঁর উপরে নাযিলকৃত ওয়াহীর (অবতীর্ন) মাধ্যমে।

প্রথম নাযিলকৃত আল-কুর'আনের বাণীটি হল "ইক্‌রা বেইসমে রাব্বী কা ল্লাজী খালাকাল ইনসানা মিন আলাক" যার অর্থ হলো "পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে, যিনি মানব প্রজাতিকে সৃষ্টি করেছেন আলাক (জমাট-বদ্ধ রক্ত) থেকে"। এ আয়াত (বাণী) হেরা গুহায় নাযিল হয়েছিল (আল-কুরআন, সূরা আলাক ৯৬ ঃ ১-৩)।

জিব্রাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নামে পড়ার জন্য আদিষ্ট হওয়ার প্রেক্ষিতে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছিলেন, 'আমি তো পড়তে জানি না।' প্রথম নুবুওয়াতের (দৈববাণী) ঘটনাটির অনুরূপ ঘটনা বাইবেলে ঈসাই অধ্যায়ের ১২ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে (ঈসাই অধ্যায় ২৯, বাক্য-১২)।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং অবতারের সাদৃশ্য ঃ ত্বকচ্ছেদকৃত

ভবিষ্যপুরাণে একজন ঋষির উল্লেখ আছে, যার বর্ণনা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ব্যক্তিগত বৈশিষ্টের সাথে মিলে যায়। ভবিষ্যপুরাণে ঈশ্বর একজন অবতার সম্বন্ধে বলেছেন, "আমার অনুসারী হবে এমন ব্যক্তি যার পুরুষাঙ্গ হবে ত্বকচ্ছেদ কৃত অর্থাৎ খাতনা কৃত।

বর্তমান হিন্দুধর্মে ও সমাজে খাতনা বা তকচ্ছেদ প্রথা নেই। ঐ অবতার উপসনালয়ে (মাসজিদে) উপসনার জন্য ঘোষণা বা আহবানের (আযান) পদ্ধতি প্রবর্তন করবেন। তিনি সকল বৈধ খাদ্য আহার করবেন। তিনি শূকর বা বরাহমাংস ছাড়া সকল মাংসই ভক্ষণ করবেন (ভবিষ্যপূরাণ)।

টিকিহীন অবতার

হিন্দু ধর্মীয় ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিতগণ মস্তকে টিকি গুচ্ছ রাখেন। হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থের বর্ণনা মতে কল্কির অবতারের কোন টিকি থাকবে না। অন্য দিকে তিনি হবেন শ্মশ্রুধারী। বর্তমান যুগেও দেখা যায় যে, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ চোয়ালে শ্মশ্রু সংরক্ষণ করেন। মুসলিমগণ বিশেষ করে ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ দাড়ি রাখেন।

www.nagorikpathagar.org

উষ্টারোহী ঋষি

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) উটে চড়তেন। মক্কা থেকে মদীনায় গিয়েছেন উটে চড়ে। অথর্ব বেদে কল্কির অবতারকে বলা হয়েছে উষ্টারোহী ভারতীয় ঋষি। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ভারতীয় ছিলেন না।

অথর্ববেদ মতে, ৬০,০৯০ শত্রু বেষ্টিত উষ্টারোহী ঋষি এর একটি নাম হল মামাহ। মামাহ, মাহ দুটি শব্দ একই অর্থসূচক। মামা, মাহ, মুহা, মহা ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বুঝানো হয় উচ্ছ, মহান, সম্মানিত, শ্রদ্ধেয়।

কোন কোন প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নাম অর্থাৎ আরব নবীর নাম সুস্পষ্ট মুহামদই উল্লেখ করা হয়েছে।

কল্কি পুরাণ এবং সংগ্রাম পূরাণে বলা হয়েছে, কল্কি অবতার বহু অলৌকিক ঘটনা দেখাবেন এবং তিনি হবেন ঈশ্বরের বন্ধু (হাবীবুলাহ্)।

কল্কি অবতারের অলৌকিকতা বা মোজেজার মধ্যে একটি ছিল চন্দ্র দ্বি-খন্ডিত করণ (সংগ্রাম পূরাণ, খন্ড-১২, অধ্যায়-৬)।

বাহন এবং অস্ত্র

কল্কি পূরাণে বলা হয়েছে যে, কল্কি অশ্বারোহণে চলবেন এবং উটের পিঠে চড়বেন। তিনি ধর্মের শত্রু এবং দানবদের বিরুদ্ধে তরবারী নিয়ে সংগ্রাম করবেন। এতে দেখা যায়, কল্কি অবতার এর আবির্ভাব হবে এমন যুগে যখন উট এবং ঘোড়া হবে সাধারণ বাহন এবং তিনি অস্ত্র হিসাবে তরবারী বহন করবেন। বাহন এবং অস্ত্র ক্ষেত্রেও দেখা যায় হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এবং কল্কি অবতারের মধ্যে সাদৃশ্য আছে।

ভবিষ্যতে একবিংশ শতাব্দীতে এবং পরে কোন বড় যুদ্ধ অশ্বারোহী বা উষ্ট্রারোহীর মাধ্যমে হবে না। এখন ব্যবহার হবে- ট্যাংক, মিসাইল, রকেট লাঞ্চার, ইত্যাদি। অস্ত্র হিসেবে তরবারীরও ব্যবহার হবে না। এক দেশ থেকে আরেক দেশে আরোহী বিহীন বিমানের মাধ্যমে রকেট লাঞ্চার, মিসাইল এবং বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

যেহেতু কল্কি অবতার এর উল্লেখ হিন্দু শাস্ত্রে আছে এবং যদি তাঁর আবির্ভাব ভবিষ্যত বাণী মতেই হয়ে থাকে- তবে তা হাজার বছর পূর্বেই বাস্তবায়িত হয়ে গেছে।

চন্দ্র দ্বি-খন্ডিত করার ঘটনা

কল্কি পূরাণ মতে, কল্কির অবতার চন্দ্র দ্বি-খন্ডিত করবেন। (সংগ্রাম পুরান, খণ্ড ১, অধ্যায় ৬)। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জীবনে এখন থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে চন্দ্র দ্বি-খন্ডিত করণের ঘটনা ঘটে। মক্কার অধিবাসীগণ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে বলেন–তিনি যদি আল্লাহ্র নবী হন, তবে তিনি একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে পারেন।

www.nagorikpathagar.org

এ প্রেক্ষাপটে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) চন্দ্র দ্বি-খন্ডিত করেন। মক্কাবাসীগণ হেরা পর্বত থেকে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। আল্-কুরআনেও চন্দ্র দ্বি-খন্ডিত হওয়ার ঘটনাটির উল্লেখ আছে (আল্-কুরআন, সূরা কামার, (চন্দ্র) ৫৪ ঃ ১)। হিযরতের পাঁচ বছর পূর্বে নুবুওয়াতের অষ্টম বর্ষে হজ্বের মৌসুমে এ ঘটনা ঘটে।

হজ্বের জন্য আগত আরবগণ মিনায় রাসূল (সাঃ) এর কাছে একটি মুজিজা বা অলৌকিক ঘটনা দেখাবার জন্য চ্যালেঞ্জ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আল্লাহুর নির্দেশে চন্দ্রের দিকে শাহাদাত আঙ্গুলী দিয়ে ইশারা করেন- এর ফলে চন্দ্র 'দু' খন্ডে বিভক্ত হয়ে একখন্ড পশ্চিমে আরেক খন্ড পূর্বে স্থির হয়। কিছুক্ষণ পর উভয় খন্ড মিলিত হয়ে পূর্বাকর ধারণ করে (বুখারী, মুসলিম)।

ঈশ্বর থেকে উড়ন্ত অশ্ব প্রাপ্তি

ভাগবত পূরাণে উল্লেখ আছে যে, কল্কি দেবতা ঈশ্বর থেকে একটি উড়ন্ত অশ্ব লাভ করবেন। ঐ অশ্বটি হবে বিদ্যুতের থেকে অনেক বেশী দ্রুতগামী। এ অশ্বে আরোহণ করে কল্কির অবতার সমগ্র পৃথিবী এবং সপ্ত আকাশ পরিভ্রমণ (মিরাজ) করবেন (ভাগবত পূরাণ, খন্ড-১২, অধ্যায়-২, শোক-১৯-২০)। কল্কি অবতারের সপ্তাকাশ পরিভ্রমণের ঘটনার সাথে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মিরাজের ঘটনার আশ্চর্য মিল রয়েছে।

আল্-কুরআনে বলা হয়েছে–পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রজনী যুগে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন। মসজিদুল আকসার পরিবেশ বরকতময় করেছেন আল্লাহু তাঁর নিদর্শন দেখাবার জন্য (আল-কুরআন, সূরা বণী ইসরাইল ১৭, আয়াত-১)।

মিরাজের এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হাদীস গ্রন্থসমূহে আছে। হাদীসের বর্ণনা মতে মিরাজের সময় রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) সপ্তাকাশ ভ্রমণ করেন এবং অন্যান্য নবীদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

এই মিরাজ বা পরিভ্রমণের জন্য আল্লাহু তা'য়ালা তাঁর প্রিয় নাবীকে বারক (বোরাক) নামে একটি উড়ন্ত অশ্ব দান করেছিলেন। বার্ক একটি আরবী শব্দ। এর অর্থ হলো বিদ্যুত। মিরাজ শব্দের অর্থ হলো উচ্চতা এবং মই। মিরাজের ঘটনা থেকেও কল্কি অবতারের সাথে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ঘটনার সাদৃশ্য আছে।

কল্কি অবতারের চারজন সঙ্গী

কল্কি পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, কল্কি অবতারের থাকবে বিশেষ চারজন সঙ্গী। তারা দানবদেরকে হত্যা করবেন (কল্কি পূরাণ, অধ্যায়-২, শোক-৫)। সংগ্রাম পুরাণেও বলা হয়েছে, কল্কি অবতারের হবে চারজন সম্মানিত সঙ্গী। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর খলিফা চতুষ্টয়– (১) আবু বাক্র (রাঃ), (২) উমর (রাঃ),

www.nagorikpathagar.org

(৩) উসমান (রাঃ) ও (৪) আলী (রাঃ) কে মুসলিমগণ তাদের ইতিহাসে 'খুলাফায়ে রাশেদীন' নামে আখ্যায়িত করে। খুলাফায়ে রাশেদীন হলেন পবিত্রতম প্রতিনিধিবৃন্দ। তারা চারজনই ছিলেন রাষ্ট্র প্রধান।

কল্কি পুরাণ রচিত হয় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর জন্মের হাজার হাজার বছর পূর্বে। এটা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক যে, উক্ত গ্রন্থে চারজন বিশিষ্ট সঙ্গীর কথা বলা হয়েছে।

সংগ্রাম পুরাণে আরো বলা হয়েছে, কল্কি অবতার আবির্ভূত হবেন এবং তাঁর জীবন দর্শন প্রচারিত হবে। তার জন্যে থাকবে মহা পুরস্কার এবং সম্মানিত আশ্রয়। কল্কি অবতারের যে আশ্রয় ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি "সংগ্রাম পূরাণে" বর্ণিত হয়েছে তার প্রতিধ্বনি কুর'আনুল কারীমে পাওয়া যায়।

আল্-কুরআনে বলা হয়েছে, কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ্ তা'কে দাখিল করবেন জান্নাতে (স্বর্গে) যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে এবং তাই মহা সাফল্য (আল্-কুরআন, সূরা নিসা-৪ ঃ ১৩)।

আরো বলা হয়েছে, "কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করলে তিনি তাকে অগ্নিতে বা নরক বা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে চিরস্থায়ী হবে। তথায় তার জন্য থাকবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি" (আল-কুরআনে সূরা নিসা-৪ঃ১৪)। আল্-কুর'আনে বলা হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য কর। যাতে তোমরা কৃপা লাভ করতে পার (সূরা আল-ইমরান- ৩ঃ১৩২)।

অসমকক্ষ অবতার

রামায়ণ হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। রামায়ণ এর রচয়িতা তুলসী দাস বর্ণনা করেন–কল্কি অবতার হবেন অতুলনীয় এবং তাঁর মত বা সমকক্ষ আর কেউ হবে না। তুলসী দাস কল্কি অবতার সম্বন্ধে যা বলেন, তা সত্য। আল্-কুরআনে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে– তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে (খুলুকিন আজিম) অধিষ্ঠিত (সূরা কালাম-৬৮ঃ৪)। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্বন্ধে আল্-কুর'আনে আরো বলা হয়েছে–মুমিনদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহ্র (সাঃ) এর মধ্যে (উসওয়াতুন হাসানাতুন) অর্থাৎ সর্বোত্তম আদর্শ (সূরা আহযাব-৩৩ ঃ ২১)।

কল্কি অবতারের দশ হাজার সঙ্গী

কল্কি অবতার সম্পর্কে ঋগবেদে বলা হয়েছে, ঐ বাহিনী প্রধান সত্যবাদী, সত্যপ্রিয়, মহাজ্ঞানী, মহাশক্তিশালী। মহান, উদার, ঈশ্বর, মামাহকে (মুহাম্মাদ সা.- কে) তাঁর বাণী দ্বারা অনুগ্রহীত করেছেন। সর্বশক্তিমানের পুত্র তিনি। তিনি সর্ব গুণধারী এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য করুণা (রহমত) স্বরূপ। তিনি দশ হাজার সঙ্গীসহ সু-বিখ্যাত হবেন (ঋগ বেদ, ৫ম খন্ড, অধ্যায়-২৭, মন্ত্র-১)।

www.nagorikpathagar.org

ঋগবেদে উল্লেখিত দশ হাজার সঙ্গীর বিষয়টি মক্কা বিজয়কালে হযরত মুহাম্মদের সাথে যে দশ হাজার সঙ্গী ছিলেন তারই উল্লেখ বলা যেতে পারে। এই বিজয়কালে কোন রক্তপাত হয়নি।

অথর্ববেদে কুনতপ শুক্তে এবং তৃতীয় মন্ত্রে একজন মামাহ ঋষির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ঐ মামাহ ঋষি বা মহা ঋষিকে ঈশ্বর দিয়েছেন ১০০ (একশত) স্বর্ণ মুদ্রা, ১০ (দশ) টি অলংকার, ৩০০ (তিনশত) টি ভারবাহী পশু এবং ১০,০০০ (দশ) হাজার গাভী (কুনতপ সুক্ত, অথর্ববেদ, মন্ত্র- ৩)।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সঙ্গী দশ হাজার গাভী দ্বারা অথর্ববেদে কি বুঝানো হয়েছে? সংস্কৃত ভাষার 'গ' 'গো' শব্দ দ্বারা গাভী বুঝানো হয় এবং যুদ্ধের প্রতীকও বুঝানো হয়। এখানে ১০,০০০ (দশ হাজার) গাভী দ্বারা বুঝানো হয়েছে বিনা যুদ্ধে গাভীর মত ধীর, শান্ত এবং সুদৃঢ়ভাবে মক্কা বিজয়ী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ১০,০০০ (দশ হাজার) সাহাবীদেরকে।

আসহাবুস সুফফা

উল্লেখিত ঋক বেদে সংখ্যাগুলো অর্থবোধক এবং ভবিষ্যত ঈঙ্গিতবহ। ১০০ স্বর্ণ মুদ্রা দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সংঘাতময় এবং দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ মক্কা জীবনের ১০০ সংগ্রামী সাহাবীকে বুঝানো হয়েছে। তাঁরা সকলেই মদীনায় তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। তাঁরা খ্যাত ছিলেন 'আসহাবুস সুফ্ফা' মদীনার মসজিদের বারান্দার অধিবাসী নামে। মক্কায় তাঁদের ঘর-বাড়ী, সম্পদ, ইত্যাদি সব কিছু পরিত্যাগ করে মদীনায় হিযরত করেছিলেন। আসহাব অর্থ সাহাবীগণ বা সঙ্গীগণ। সুফফা শব্দের অর্থ গৃহের বারান্দা বা বর্ধিত অংশ।

সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন ঃ আশারা মুবাশশারা

মক্কার নবীর ১০টি অলংকার দ্বারা বুঝানো হয়েছে দশ জন সর্বোত্তম সাহাবী বা সঙ্গী। যাদেরকে বলা হয় আশারা (দশ) মুবাশ্বারা (সু-সংবাদ প্রাপ্ত)। এ দশজন সঙ্গীকে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় জান্নাতের সু-সংবাদ দিয়েছিলেন। এরা ছিলেন (১) আবূ বাকর (রা.), (২) উমার (রা.), (৩) উসমান (রা.), আলী (রা.) (৫) আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা.), ((৬) জুবায়ের (রা.), (৭) তালহা (রা.), (৮) সদে ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং (৯) আবু উবায়দাহ ইবন জাররাহ (রা.), (১০) সাইদ ইবন যায়িদ (রা.)।

৩০০ অশ্ব (৩০০ বদরী সাহাবী)

৩০০ (তিনশত) ভারবাহী অশ্ব দ্বারা বুঝানো হয়েছে বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে অংশগ্রহণকারী সাহাবীবৃন্দকে। তাঁদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। সংখ্যা বর্ণনায় ক্ষুদ্র সংখ্যা (১৩) বড় সংখ্যার (৩০০ এর) অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

কল্কি অবতার নরাশংস

অথর্ববেদে কল্কি অবতার এর বর্ণনার সাথে বাস্তব মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর বহু সাদৃশ্য আছে। অথর্ববেদে বলা হয়েছে, কল্কির অবতার হবেন নরাশংস বা প্রশংসিত (মুহাম্মাদ) নর। তিনি হবেন কৌরম (দেশত্যাগী), শান্তির বরপুত্র অথছ দেশত্যাগকারী।

কল্কির অবতার ৬০,০৯০ শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েও থাকবেন নিরাপদ। তিনি একজন উষ্টারোহী ঋষি। তার বাহন স্বর্গ (মিরাজ) পর্যন্ত স্পর্শ করবে (অথর্ববেদ, খন্ড-২০, (স্ত্রাত্র-১২৭, বাক্য-১/১৩)।

নরাশংস

নরাশংস সংস্কৃত ভাষার একটি শব্দ। এর অর্থ প্রশংসিত ব্যক্তি। আরবী মুহাম্মাদ শব্দটির অর্থ প্রশংসিত। হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে কল্কি অবতারের বর্ণনা করা হয়েছে নরাশংস এবং কৌরম (দেশত্যাগী) শব্দে। কৌরম ঋষি শান্তির বাণী প্রচার করবেন এবং শান্তি প্রবর্তন করবেন। ইসলাম শব্দের অর্থ হলো শান্তি এবং তাই হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) প্রচার করেছেন। তিনি প্রচার করেছেন মানুষে মানুষে শান্তির বাণী। তিনি প্রচার করেছেন সার্বজনীন মানব ভ্রাতৃত্বের বাণী।

কৌরম

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মতে, সকল মানুষই হযরত আদম (আঃ) এর বংশধর এবং আদম ছিলেন মাটির তৈরী। সংস্কৃত কৌরম শব্দের অর্থ দেশ ত্যাগী, অর্থাৎ হিজরত কারী।

সাম্ভাল নগরীতে কল্কি অবতারের আবির্ভাব

কল্কি পূরাণে উল্লেখ আছে যে, কল্কি অবতার তার প্রচার মিশন "সাম্ভাল" নগরী থেকে শুরু করবেন। কিন্তু উক্ত সাম্ভাল (মক্কা) নগরীর অধিবাসীগণ কল্কি অবতারের বিরুদ্ধে উত্থান ঘটাবে। তাঁর উপর নির্যাতন করবে এবং তিনি পর্বত ঘেরা অন্য একটি শহরের দিকে পলায়ন করবেন। অবশেষে কয়েক বছর পর তিনি তাঁর নগরীতে স্বশস্ত্রভাবে তরবারী হস্তে প্রত্যাবর্তন করবেন। শুধুমাত্র সাম্বাল (মক্কা) নগরীই নয়, সমগ্র দেশই তাঁর পদানত হবে।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আরব উপদ্বীপের অন্তর্গত মক্কা নগরীতে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। কিন্তু জনগণের বাধা এবং নির্যাতনের কারণে তাকে মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিযরত করতে বাধ্য হতে হয়। কয়েক বছর পর তিনি দশ হাজার সঙ্গী সাথীসহ মক্কায় ফিরে আসেন। শুধু মক্কা নয়, সমস্ত আরবমূলক তাঁর দখলে চলে আসে।

মহামতি বুদ্ধ বলেছেন, (আরব) মৈত্রিয় (মহানবী) তাঁর জন্মভূমি (মক্কা) থেকে অন্যত্র (মদীনা) চলে যাবেন। মক্কা ছিল আরবের শ্রেষ্ঠ নগরী। মক্কার তৎকালীন

www.nagorikpathagar.org

জনসংখ্যা ছিল ৬০,৯০০ (ষাট হাজার) হাজারের বেশী এবং ৭০,০০০ (সত্তর হাজারের) কম। হিযরতের সময় মুসলিম জনসংখ্যা ছিল কয়েক শত। অথর্ববেদ মতে ৬০,০৯০ শত্রুর মধ্য থেকেও কৌরম নরাশংস ছিলেন নিরাপদ (অথর্ববেদ, খন্ড-২০, (স্ত্রাত্র-১২৭, বাক্য/১-১৩)।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জন্ম নগরী মক্কা ত্যাগ করে তাকে মদীনায় হিযরত করতে হয়েছিল। মদীনা নগরীও বিশেষ বিশেষ দিকে পর্বতঘেরা। অহুদ প্রান্তর ও পর্বত মদীনার চার মাইলের মধ্যে অবস্থিত। এই ভবিষ্যত বাণীটিও সর্বাংশে সত্য হয়ে যায় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ক্ষেত্রে।

যুদ্ধে স্বর্গীয় দূতের সাহায্য

কল্কি পূরাণে উল্লেখ আছে যে, স্বর্গীয় দেবদূতগণ কল্কি অবতারকে যুদ্ধের সময় সাহায্য করবেন (কল্কি পূরাণ, অধ্যায়-২, শোক-৭)। কাফির বা আল্লাহ্‌র ধর্ম বিরোধীদের সাথে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উহুদ এবং বদর যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে সাহায্যের জন্য ফেরেশতা এসেছিলেন (কুরআন, সূরা আল-ইমরান ৩ ঃ ১২৩, ১২৪, ১২৫)।

আল-কুরআনে বলা হয়েছে, বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছেন। স্বরণ কর, যখন তুমি মুমিনদেরকে বলতেছিলে– এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক প্রেরিত তিন সহস্র ফিরিশতা দ্বারা তোমাদেরকে সহায়তা করবেন (সূরা আল্-ইমরান, ৩ ঃ ১২৩, ১২৪, ১২৫)।

আল-কুরআনে আরো বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনায়েনের যুদ্ধের দিনে। আল্লাহ্ এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যা তোমরা দেখতে পাওনি (সূরা তওবা, ৯ ঃ ২৫, ২৬)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন– মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং শেষ (খাতামা) নবী (আল্-কুরআন, সূরা আহজাব, ৩৩ ঃ ৪০)।

শেষ নবী (সর্বশেষ অবতার)

ভাগবত পুরাণ মতে কল্কি অবতার হলেন অন্তিম ঋষি, সর্বশেষ অবতার বা নবী। অবতারের সংখ্যা হবে ২৪ এবং কল্কি হবেন সর্বশেষ অবতার (ভাগবত পূরাণ, প্রথম খন্ড, অধ্যায়- ৩, শোক- ২৫)।

ভাগবত পূরাণে উল্লেখ আছে যে, চব্বিশ জন অবতার আসবেন। ভিন্ন বর্ণনায় দশজন অবতারের কথা বলা হয়েছে। দেব ও ঈশ্বরগণ অবতার হিসেবে মাটির পৃথিবীতে অবতরণ করেন।

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম ধর্মে যারা নবী রাসূল–হিন্দুধর্মে তারা অবতার হিসেবে সমাদৃত। কল্কি অবতার হবেন সর্বশেষ অবতার। আল্-কুর'আনে সর্বমোট ২৬ জন নবীর উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) একজন এবং সর্বশেষ নবী।

১০
রাজা ভোজ এবং অবতার মুহাম্মাদ (সা.)

ভারতের গুজরাটের অর্ন্তগত কাসিম অঞ্চলের একটি নগরীর নাম "ভোজ"। তদানিন্তন রাজা ভোজের নাম অনুসারে এ নগরীর নামকরণ করা হয়। পূরাণ রচিত হওয়ার বহু বছর পর ভোজ রাজ্যে রাজা ভোজের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সমকালীন রাজা।

বিশেষজ্ঞদের মতো রাজা ভোজ ছিলেন রাজা শালীবাহনের দশম প্রজন্ম। হয়ত কোন এক রাজা ভোজের সময়ে সপ্তম শতাব্দীতে ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাব হয়েছিল।

ভোজ রাজ বংশ

রাজা ভোজ কি এক ব্যক্তির নাম অথবা এক বংশের বা গোত্রের নাম? রাজা ভোজ কোন এক বিশেষ ব্যক্তির নাম নয়। মুঘল সম্রাট বা পাঠান সুলতান বলতে এক ব্যক্তিকে বুঝায় না। একই বংশের একাধিক ব্যক্তিকে বুঝায়।

জুলিয়াস সিজার নামে একজন রোম সম্রাট ছিলেন। তবে জুলিয়াস একজন রাজা বা সিজারের নাম। কিন্তু সিজার একমাত্র এক ব্যক্তির নাম নয়। রোমের সকল সম্রাটই ছিলেন সিজার উপাধিধারী। সিজার বলতে যা বুঝায় ভারতীয় ইতিহাসে রাজা, মহারাজা, সুলতান, সম্রাট বলতে তা বুঝায়। গুজরাটে বহু রাজার উপাধি ছিল ভোজ। তার মধ্যে একজন ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সমসাময়িক। ভোজ রাজাগণের সকলেই ছিলেন শালীবাহন রাজ বংশের রাজা।

মিশরের ফিরাউন কোন এক বিশেষ রাজা নন। তারা ফিরাউন বংশের রাজা। যে ফেরাউনের সময় হযরত মূসা (আঃ) এর আবির্ভাব হয়েছিল– ঐ ফেরাউনের নাম হল ফেরাউন রামেসীস দ্বিতীয়। তার মৃত দেহের মমী এখনো যাদুঘরে রক্ষিত আছে। ঐ বংশের সকল রাজারই উপাধি ছিল ফেরাউন।

মোঘল সম্রাটগণ কোন এক বিশেষ রাজা নন। মোঘল সম্রাট, পাঠান, সুলতান, সিজার ইত্যাদি রাজ বংশের উপাধি। রাজা ভোজ নামে প্রাচীন ভারতে বহু রাজা ছিলেন। সংস্কৃত ব্যাকরণবিদ পানীনি আবির্ভূত হয়েছিলেন মহানবী মুহাম্মাদের আর্বিভাবের পূর্বে। তিনি তাঁর ব্যাকরণে রাজা ভোজের উল্লেখ করেছেন

www.nagorikpathagar.org

(অধ্যায়-১ ঃ ১০৭৫)। সংস্কৃত ভাষায় বহু শতাব্দী পূর্বে রচিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ পঞ্চকে একজন রাজা ভোজের উল্লেখ আছে। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ পঞ্চক- ৮ ঃ ১২; ১৬ ঃ ১৭)।

এক রজনীতে রাজা ভোজ চন্দ্র দ্বি-খন্ডিত হওয়ার ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন। তিনি এ সম্পর্কে হিন্দু শাস্ত্রীয় পন্ডিতদের নিকট থেকে শাস্ত্রীয় তত্ত্ব জানতে চান। হিন্দু পন্ডিতগণ বেদ পূরাণ অধ্যয়ন করে রাজাকে বলেন যে, শেষ অবতারের জীবনের এটা একটি অলৌকিক ঘটনা। তাঁর আবির্ভাব হয়ে গেছে।

নরাশংস

রাজা ভোজ তখন কল্কির অবতারের চিহ্ন বা নিদর্শনমূলক তথ্য জানতে চান। তারা ধর্ম শাস্ত্র গবেষণা করে জানান যে, শেষ অবতারের জন্ম হবে এক শান্তিপূর্ণ নগরীতে। কল্কির ঐ অবতারের নাম হবে নরাশংস। সংস্কৃত ভাষায় নরাশংস শব্দের বাংলা অর্থ হল প্রশংসিত নর। তাঁর থাকবে চারজন বিখ্যাত প্রতিনিধি এবং এক ডজন স্ত্রী।

নরাশংস সম্পর্কে তথ্য সন্ধান করে রাজা ভোজ অবগত হলেন যে, আরব দেশে অন্তিম ঋষি বা শেষ অবতারের আবির্ভাব হয়েছে। নরাশংস এর সন্ধানে রাজা ভোজ আরবে আসেন এবং মক্কায় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। রাসূল (সাঃ) তাঁর নাম দেন আবদুল্লাহ্।

মরুস্থল নিবাসী মহাদেব মহামদ ঃ রাজা ভোজ

ভবিষ্য পুরাণ মতে রাজা ভোজ এবং "মহামদ" সমসাময়িক। পৃথিবীব্যাপী ধর্মের অধপতন দেখে রাজা ভোজ আরব দেশে গমন করেন। তথায় তিনি সহচর পরিমন্ডিত একজন ম্লেচ্ছ আচার্যের সাথে সাক্ষাত করেন। ঐ আচার্যের নাম "মহামদ"।

রাজা ভোজ মরুস্থল নিবাসী মহাদেবকে সম্বোধন করে বলেন, "হে মরুস্থল নিবাসী ত্রিপুরাসুর নাশক! আপনি উচ্চজ্ঞানের অধিকারী। ম্লেচ্ছ কর্তৃক আপনি সুরক্ষিত। আপনি পবিত্র ও সত্য, চৈতন্য ও স্বরূপানন্দ শঙ্করী। আপনাকে নমস্কার। আমাকে আপনি আপনার চরণতলে উপস্থিত দাসরূপে গ্রহণ করুন"। (ভবিষ্যপুরাণ, মন্ত্র- ৫-৮ঃ ধর্মাচার্য অধ্যাপক ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়, বেদ পুরাণে আল্লাহু ও হযরত মোহাম্মদ, পৃষ্ঠা- ৭৫)।

মরুস্থল নিবাসী এবং গিরিজানাথ অর্থাৎ পাহাড়াধিপতি সংক্রান্ত শ্লোকটি এর অর্থ হল– হে গিরি পর্বতে বসবাসকারী অধিপতি ! আপনাকে নমস্কার বা প্রণতি জানাই। শ্লোকটির সংস্কৃত ভাষ্য–নমশ্লে গিরিজানাথ মরুস্থল নিবাসিনে। ত্রিপুরাসুরনাশায় বহুমায়াপ্রবর্তিনে (ভবিষ্য পুরাণ)।

www.nagorikpathagar.org

রাজা ভোজের ম্লেচ্ছ ধর্ম গ্রহণ

মরুস্থল নিবাসী ম্লেচ্ছ আচার্যের সঙ্গে সাক্ষাতকালে রাজা ভোজের নিকট একটি প্রস্তর মূর্তি ছিল। মূর্তিটি দেখে মোহম্মদ সাহেব (সা.) বললেন– "যাহাকে তোমরা পূজা কর, উহা আমার উচ্ছিষ্ট খেতে পারে। এটা বলে মোহাম্মদ সাহেব মূর্তিকে তাঁর উচ্ছিষ্ট খাওয়ায়ে দিলেন। এতদশ্রবণে ও দর্শনে রাজা ভোজ হতবাক। অতপর রাজা ভোজ ম্লেচ্ছ ধর্ম গ্রহণ করেন"। (ভবিষ্য পুরাণ, মন্ত্র-১৫-১৭)।

গঙ্গাজলে স্নান

রাজা ভোজ আরবের মরুস্থল নিবাসী মহাদেবকে গঙ্গাজল দ্বারা স্নান করান। গঙ্গা নদী হিন্দুধর্মে অত্যন্ত পবিত্র। গঙ্গা নদীটি পরিচিত। গঙ্গাজলে স্নান করে পাপীগণ পবিত্র বা নিষ্পাপ হন। ঝরনার নদীর জলে স্নান করে খৃষ্টানগণ নিষ্পাপ হন। যমযম কূপের জল পবিত্র পানীয়। মুসলিমগণ এ কূপের জলে স্নান করেন। তবে নিষ্পাপ হন এইরূপ কোন ধারণা নেই। জমজম জলে স্নান করলে সীমাহীন পূণ্য লাভ হয়।

পঞ্চগব্য

পঞ্চগব্যযুক্ত চন্দনাদি দ্বারা পূজা করে রাজা ভোজ শিব দেবকে সন্তুষ্ট করেন। গাভী সংক্রান্ত পঞ্চ গব্য হলো– (১) দুগ্ধ, (২) দধি, (৩) ঘৃত, (৪) গো-মুত্র এবং (৫) গোময় বা গোবর। পঞ্চ গব্য গোজাত পঞ্চ বস্তু যা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এবং ঋষি আপ্যায়নে ব্যবহৃত হয়। গব্য শব্দের অর্থ গাভী সম্পর্কীয়।

গঙ্গাজল এবং পঞ্চগব্য সংক্রান্ত শ্লোকটি হল–"গঙ্গাজলৈশ্চ সংস্নাপ্য পঞ্চগব্য সমন্বিতৈঃ। চন্দনাদি ভিরভ্যর্চ তুষ্টাব মনসা হরম।"

রাজা ভোজ মহামানব মুহাম্মাদ সম্পর্কে ভবিষ্য পুরাণে যা উল্লেখ করেছেন– তার উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হল নিম্নরূপ ঃ মহর্ষী বেদব্যাস কর্তৃক ভবিষ্য পুরাণে যে অবতার বা মহামানবের সম্বন্ধে ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে– (১) তিনি একজন ম্লেচ্ছ ধর্মীয় শিক্ষক, (২) তাঁর সঙ্গী সাথী/সাহাবী থাকবে, (৩) তাঁর নাম মুহামদ, (৪) রাজা ভোজ এ মহামদকে পঞ্চগব্য দিয়ে আপ্যায়ন করাবেন এবং গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করাবেন, পবিত্র করবেন। তাঁকে উপহার দেবেন।

মুহাম্মদ আরবদেশী মানব। তিনি মানব জাতির গর্ব। তিনি বিরাট শক্তি সঞ্চয় করে শয়তানকে ধ্বংস করবেন, (৫) তিনি নিজেকে ম্লেচ্ছ মুসলিম বিরোধীদের হাত থেকে রক্ষা করবেন। তিনি মহান। (৬) রাজা ভোজ তাঁর দাস এবং (৭) রাজা ভোজ ঐ মহা পুরুষের পদতলে আশ্রয় চেয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

ভবিষ্য পুরাণে রাসূলুল্লাহ্ মুহাম্মাদ (সা.)

মুম্বাই এর ভেংকটেশ্বর প্রেস থেকে মুদ্রিত ভবিষ্য পূরাণের স্বর্গ পর্বে (৩ঃ৩, ৩ঃ৩,৫ঃ৮) বলা হয়েছে–"একজন ম্লেচ্ছ ধর্মীয় শিক্ষক (অবতার) তাঁর সঙ্গীদের (সাহাবীদের) নিয়ে আবির্ভূত হবেন। তাঁর নাম হবে "মহামদ"। রাজা ভোজ মহাদেব আরবকে পঞ্চ গব্য ও গঙ্গাজলে স্নান করাবেন। তাঁকে পবিত্র করবেন।

তারপর তাঁর নিকট অর্ঘ নিবেদন করে তাঁকে বলবেন– হে আরববাসী মহামানব! আপনি মানব জাতির গৌরব! আপনি বিরাট শক্তি সঞ্চয় করেছেন শয়তানকে ধ্বংস করার। আপনি নিজেকে ম্লেচ্ছ বিরোধীদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আপনি মহান। আমি আপনার দাস। আমাকে আপনার পদতলে স্থান দিন।

পৈশাচধর্ম

রাজা ভোজ এর মরুস্থল নিবাসী মুহাম্মদ নামক ম্লেচ্ছ আচার্যের সঙ্গে সাক্ষাত উপলক্ষে আরবে থাকাকালে আরেকটি ঘটনা ঘটে। এক দেবদূত পৈশাচদেহ ধারণ করে রাজা ভোজকে বললেন, হে রাজন ! যদিও তোমার ধর্ম সর্বাপেক্ষা উত্তম ধর্ম, কিন্তু এখন ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে তোমার ধর্মকে পৈশাচ ধর্ম নামে স্থাপন করব।

এবার লিঙ্গচ্ছেদিত, টিকিহীন, শ্মশ্রুধারী, উচ্চস্বরে আহবানকারী (আযান দাতা) হবেন আমার প্রিয়। তিনি বিশুদ্ধ পশু ভক্ষণকারী হবেন। কুশ দ্বারা যেরূপ সংস্কার হয়, তদ্রুপ তিনি মুষল (মুদগর) দ্বারা সংস্কার করবেন। এটাই আমার পৈশাচ ধর্ম। এটা বলে দেবদূত অদৃশ্য হয়ে গেলেন। (ভবিষ্য পুরাণ, মন্ত্র- ২৩-২৮)।

মাংস ভক্ষণকারী

ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, পিশাচ এর ছদ্মবেশে অতি বিচক্ষণ ও দেব চরিত্রসম এক ব্যক্তি রাজা ভোজকে বললেন– হে রাজা ভোজ! তোমার ধর্ম এমন যে, তা সকল ধর্মের উপর বিরাজ করবে। কিন্তু ঈশ্বর পরমাত্মার ইচ্ছা এই যে, মাংস ভোজীদের আদর্শ নীতিমালা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে (ভবিষ্য পুরাণ)।

বর্তমানে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র মতে, গোমাংস আহার করা মহাপাপ। বৈদিক যুগে অবশ্য গোমাংস আহার করা নিষিদ্ধ ছিল না। শাস্ত্র মতে এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, কল্কি অবতার হবেন মাংসভোজী। তা থেকে মনে হয় কল্কি অবতার হিন্দুধর্মের অন্তর্ভূক্ত হবেন না।

আল-কুরআনে বলা হয়েছে, সকল উত্তম এবং আইন সঙ্গত খাদ্য যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বিধিসম্মত করেছেন– তা তোমরা আহার কর (আল-কুরআন, সূরা মায়িদাঃ ৫ ঃ ৮৮)। তবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন মৃত প্রাণী, রক্ত এবং শুকরের মাংস (আল-কুরআন, সূরা বাকারা ২ ঃ ১৭৩)।

www.nagorikpathagar.org

কল্কি অবতার হবেন মুসলিম

কল্কি অবতার রাজা ভোজকে বলেন–আমি অবশ্যই হবো মাংসভোজী ধর্মের প্রবর্তক এবং ধর্ম প্রচারকারী (ভবিষ্য পুরাণ)। ভবিষ্য পুরাণে মুসলিমদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা (মুসলিমগণ) লতা-পাতা বা গাছ-গাছালী ব্যবহার করে পবিত্রতা অর্জন করবে না। তারা পবিত্রতা অর্জন করবে সংগ্রাম বা জিহাদের মাধ্যমে। যেহেতু তারা ধর্মহীনদের সাথে সংগ্রাম করবে, তারা মুসলিম নামে পরিচিত হবে।

আরব দেশে ভ্রমণ শেষে রাজা ভোজ তাঁর রাজ্যে ফিরে আসেন। কিন্তু তাঁর পরিবার, বংশ এবং জনগণ তাঁর আদর্শ গ্রহণ করেননি এবং তাকেও গ্রহণ করেননি।

রাজা ভোজ রাজ্য ত্যাগ করে সমগ্র জীবন একমাত্র স্রষ্টার আরাধনা এবং নবীর যিকির ও স্মৃতি স্মরণে কাটিয়ে দেন (কমলাকান্ত তিওয়ারি, কলিযুগ, অন্তিম ঋষি পৃ.- ৫; পন্ডিত বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় রচিত অন্তিম ঈশ্বরদূত, পৃ- ৯৭)।

১১
অগ্নি দেবতা

বৃহৎ বন জঙ্গল বৃক্ষের ডালের পারস্পরিক ঘাত প্রতিঘাতের ফলে অন্য কোন প্রাণীর সাহায্য ছাড়া বনে আগুন জ্বলে ওঠে। অগ্নির উপকারিতা এবং দহন ক্ষমতা সীমাহীন। অগ্নিকে এত শক্তিশালী দেখে বিশ্বের তৎকালীন পারস্যবাসীগণ অগ্নিকেই স্রষ্টা বা ঈশ্বর বা আল্লাহু বলে ধারণা করে নিলেন।

যেহেতু স্রষ্টার মধ্যে সৃষ্টির ধারণা আছে তাই, অগ্নি উপাসকগণ এবং ধর্ম ব্যবসায়ীগণ ধারণা করে নিলেন যে, স্রষ্টা খোদ নিজেকে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ স্বয়ং সৃষ্ট হয়েছেন।

মানবিক দর্শনে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ধারা এবং পরিণতিতে অগ্নিদেব হয়ে গেলেন ঈশ্বর। তারপর কোন দিকে এবং কতটুকু গেলেন! পারস্য উৎস থেকে স্বয়ং সৃষ্ট সয়ম্ভু স্রষ্টার ধারণাটি বহু দেশীয় দর্শনে অতি সুক্ষ্মভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। বিশেষ করে ভারতীয় ধর্মে।

অগ্নিদেবতা

পূজার মধ্যে অগ্নিপূজা করা হয়। অগ্নি বলতে শুধু অগ্নি বুঝানো হয় না। অগ্নি বলতে যিনি অগ্রে নিয়ে যান তাকেও বুঝানো হয়েছে! (যজুর্বেদ, অধ্যায়-৩, সুক্ত-১৩)। অগ্নি বলতে শুধু জলন্ত অগ্নি নয়, অগ্নি, রশ্মি বা আলো ও বুঝানো হয়েছে- (শ্রী পরিতোষ ঠাকুর মহাশয়ঃ সামবেদের ভূমিকাঃ ১২৭৯ সুক্ত)।

www.nagorikpathagar.org

বেদে অগ্নিদেবতা বলতে শুধুমাত্র যে অগ্নি আমরা দেখি সেই বস্তুগত, তাপময়, জলন্ত অগ্নি বুঝানো হয়নি। অগ্নি বলতে এমন শক্তি ও সত্ত্বাকে বুঝানো হয়েছে যিনি অগ্রে নিয়ে যান। (শ্রীবিজন বিহারী গোস্বামী, মহাশয়কৃত। যজুর্বেদ টীকা; তৃতীয় অধ্যায়, ১৩ নং সুক্ত)।

শ্রী পরিতোষ ঠাকুর মহাশয় এবং বিজনবিহারী গোস্বামী মহাশয়ের মতে, প্রাথমিক যুগের মানুষ নিরাকার ঈশ্বর বা ব্রহ্মাকে পূজা করত। কিন্তু সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার জন্য বেদের ভাগবত এবং আধ্যাত্মগত বিষয়গুলো জড়বাদীতায় রূপ দেয়া হয়েছে। বস্তুগত মূর্তিরূপ দিয়ে মূর্তি পূজা শুরু করা হয়েছে। বেদের মর্মবাণী মূর্তিপূজা বা অগ্নিপূজা নয়।

"নরাশংস" স্মৃতিযোগ্য দেবতা, "বরণীয় ঋষি"। মানব জাতিকে আধ্যাত্মিকতার উচ্চমার্গে নিয়ে যান নরাশংস। তিনি রশ্মিময়, জ্যোর্তিময়। তাই, এরূপ নরাংশসকে অগ্নি আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

বস্তুগত অগ্নিকে পূজা করা সকল পূজারীর উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু পরিণতিতে তা হয়ে গেল এবং বিভিন্ন দিকে গতি লাভ করল। শুধু অগ্নি দেবতাই একক ভাবে পূজনীয় কেন? বরুণ বা জল দেবতা অগ্নিদেবতা হতে কম কিসে ? জল তো অগ্নিকে নিভিয়ে ফেলতে পারে। তবে অগ্নিদেবও জলকে বায়ুতে পরিণত করতে পারেন।

তাই বায়ু আর একজন দেবতা হলেন। বহু-ঈশ্বরবাদে বাই টার্ন অর্থাৎ একজনের পর একজন সব কিছুই দেবতা। সব কিছুই দেবতা হলে দেবত্ব এবং রাজত্ব নিয়ে দেবতাদের মধ্যে ঝগড়া ফাসাদ স্বাভাবিক। আল্লাহ্ তায়ালা এবং পরমেশ্বরকে বাদ দিয়ে মানবিক কল্পনার ভিত্তিতে ধর্ম এবং দেবতা আবিস্কার করলে এমন ফাসাদ হতে পারে।

ঈশ্বরকে কেউ সৃষ্টি করেনি- তিনি খোদ বা স্বয়ং সৃষ্ট হয়েছেন। তাই তাঁর নাম হয়েছে খোদা, অর্থাৎ খোদ সৃষ্ট অথবা সয়ম্ভু। বনে খোদ বা স্বয়ং বা নিজে নিজে আগুন জ্বলার কারণে অগ্নি উন্নীত হলেন খোদা মর্যাদায়।

দেব রাজ্যে খোদার আগমন

উপনিষদের ঈশ্বর স্বয়ম্ভু। তিনি স্বয়ং নিজেকে সৃষ্টি করেছেন। খোদা অস্তিত্বশীল বলে ইরানিয়ান ধর্মে স্রষ্টা অগ্নিদেবতা খোদ অর্থাৎ নিজে নিজে এসেছেন বা সৃষ্টি হয়েছেন। তাই তিনি খোদা নামে অবিহিত।

www.nagorikpathagar.org

খোদা এমন সত্ত্বা যে নিজের শক্তিবলে নিজেকে সৃষ্টি করেছেন। তাই, তিনি অভিহিত হলেন খোদা নামে। ঈশ্বরের সাথে সৃষ্টি সংক্রান্ত ধারণা সংযুক্ত হলেই প্রশ্ন এসে যায়– ঈশ্বর নিজেকে সৃষ্টি করার পূর্বে কি কিছুই ছিল না?

স্রষ্টা নিজেকে খোদ সৃষ্টি করলেও স্থান কালের প্রশ্ন জাগে। তিনি কোথায় নিজেকে সৃষ্টি করেছেন, কখন বা কোন সময় নিজেকে সৃষ্টি করেছেন ? যদি খোদা নিজেকে সৃষ্টি করে থাকেন, তবে তাঁর সৃষ্টির পূর্বে কি ছিল ?

ঈশ্বর কোথায় এবং কখন নিজেকে সৃষ্টি করেছেন এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেলে নতুন প্রশ্ন জাগে- কি আকারে তিনি নিজেকে সৃষ্টি করেছেন? স্রষ্টার সৃষ্টি সংক্রান্ত ধারণা এলেই প্রশ্ন উঠে– তিনি নিজেকে সৃষ্টির পূর্বে খোদা বা ঈশ্বরের বিকল্প কি ছিল ? কিছু যদি থেকে থাকে- সে কিছুটি কি এবং কত বড় ?

যদি তাঁর সৃষ্টির পূর্বে অন্য কিছু থেকে থাকে- তবে সে সত্ত্বা হল সিনিয়র বা জ্যেষ্ঠতর। এরূপ ধারণা শিরকী এবং কুফরী।

এ সম্পর্কে ইসলামের ধারণা সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট। স্রষ্টা নিজেকে বিশেষ সময়ে সৃষ্টি করেননি। তিনি সৃষ্টির পূর্ব থেকেই আছেন এবং পরকালে থাকবেন। তাঁর পূর্বেও কিছু ছিল না। অর্থাৎ সকল সৃষ্টির পূর্ব হতেই তাঁর অস্তিত্ব আছে।

ইরানীয়ান স্রষ্টার ধারণা– খোদা এবং খুদী শব্দগুলোর ধর্মীয় দর্শনে সক্রিয় অনুপ্রবেশ ঘটার পরিণতিতে তৌহিদের ধারণাটির উপর অপপ্রভাব বিস্তার হয়েছে। পারস্য প্রভাবে প্রভাবিত মুসলিম ভারতে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'য়ালার অর্থে খোদা শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এটি একটি চরম ভ্রান্তি।

ইরানের মাধ্যমে ইসলাম প্রধানতঃ ভারতে আসে। তবে আরবগণ সমুদ্র পথে ইরানিয়ানদের পূর্বেই ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং চীনে গমন করে। সেকালে স্থল পথ অপেক্ষা নৌপথ অধিকতর নিরাপদ ছিল। ইউরোপিয়ানগণ স্থল পথে ভারতে এবং পূর্ব দক্ষিণ এশিয়ায় গমন করেনি। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ব্যাপক ভাবে মুসলিমগণ স্থল পথে ইরান হয়েই ভারতে প্রবেশ করে। ইরানিয়ানগণ নিজেদেরকে প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী মনে করেন।

পৃথিবীর বহু দেশে আরবগণ যে ভাবে এবং ভাষায় ইসলাম শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবেই এবং ভাষায় স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ ইসলাম গ্রহণ করেন যেমন– করেছেন মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়াবাসীগণ।

ইরানিয়ানগণ ইসলাম বরণ করলেন। কিন্তু আল্লাহু রাব্বুল আলামীনকে আল্লাহ্ নামে যতটুকু তারা স্মরণ করেন, তাদের অগ্নিদেবতা খোদা নামে ডাকেন আরো বেশী। এ প্রবণতা শুরুতে যে ছিল, তা নয়, এখনো ইরানে আছে এবং ইরানের প্রভাবে ভারতেও আছে।

www.nagorikpathagar.org

ইরানিয়ানগণ মাবুদ হিসাবে আল্লাহ্‌কে স্বীকার করে নিলেন। তবে তাঁদের প্রিয় খোদার নামটি বাদ দিলেন না। আল্লাহ্‌ তায়ালার সাথে সাথে খোদাও তাদের গৃহিত ইসলাম ধর্মে থেকে গেল। তাদের অনুসারী হিসাবে উপ মহাদেশের ইসলাম অগ্নিদেবতার প্রিয় "খোদা" নামটি আল্লাহ্‌ তায়ালার পাশে দুর্দান্ত প্রতাপে বিরাজ করছে। ইরানিয়ান খোদাতায়ালা একাই আসলেন। জামাতে আসলেন না। নবী রাসূলকে তারা গ্রহণ করলেন, তবে পয়গম্বর নামে। আফ্রিকায় এবং ইন্দোনেশিয়ায় আল্লাহ্‌ এবং রাসূল আছেন–খোদা এবং পয়গাম্বর নেই।

ভারতীয় আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল ইরানে। ভারতের পূজায় ব্যবহৃত নম, নম, নমজ, নমস্ত, নমস্তে, ভারতীয় আর্যদের পূজায় আছে। ভারতীয় আর্যদের পূর্ব পুরুষগণ ইবাদতের বিধি হিসাবে সালাত গ্রহণ করেছেন তবে সালাত নামে নয়, নামায নামে। সিয়াম গ্রহণ করলেন, তবে সিয়াম নামে নয়, রোযা নামে।

আর্য প্রভাবিত উপমহাদেশে এবং উপমহাদেশীয় মুসলিমদের নিকট আল্লাহ্‌ অপেক্ষা খোদা, সালাত অপেক্ষা নামায, সিয়াম অপেক্ষা রোযা অধিকতর গ্রহণীয়। উপমহাদেশ ভিন্ন অন্যত্র আল্লাহ্‌ হাফেয অপেক্ষা খোদা– হাফেজ অধিক শুনা যায় না। মানুষ হিফাজতকারী নন, আল্লাহ্‌ই হিফাযতকারী। তাই তাদের কণ্ঠে খোদা হাফেয অপেক্ষা আল্লাহ্‌ হাফিয অধিকতর উচ্চারিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

৪র্থ অধ্যায়

১২

ঋগবেদে নরাশংস মুহাম্মাদ (সা.)

নরাশংস হবেন আধ্যাত্মিক পুরুষ। বেদে তাঁর আধ্যাত্মিকতাকে কবি শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। কবি নরাশংস শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে আধ্যাত্মিক পুরুষ নরাশংসকে। নরাশংস সম্বন্ধে বেদে বলা হয়েছে, তাঁর মাধ্যমে গৃহে গৃহে আধ্যাত্মিকতার আলো এবং জ্ঞান প্রকাশিত এবং প্রসারিত হবে। তাঁকে জ্ঞানের প্রসারকও বলা হয়েছে।

কবি নরাশংস

সংস্কৃত ভাষায় কবি শব্দের এক অর্থ ঈশ্বরের দূত। নরাশংসের ঈশ্বরের দূত হওয়ার যোগ্যতা আছে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, হলেন দেবতা। এই দেবতারা যেখানে পৌঁছতে পারেন না, কবি কল্পনার রথে চড়ে সেখানে পৌঁছতে পারেন। এ অর্থেই হয়ত ঋগবেদে নরাশংসকে কবি বলা হয়েছে। ঋগবেদের ভাষায় নরাশংসঃ সূষুদতীমংযজ্ঞ মদাভ্যঃ। কবি হি মধু হস্ত্যঃ।-(ঋগবেদ সংহিতা, কাণ্ড-৫, অধ্যায়-৫, মন্ত্র-২)।

প্রশংসা কীর্তন এবং নাতে রাসূল

বেদ গ্রন্থসমূহে নরাশংসের মহত্ব, গুণাবলী এবং প্রশংসাকীর্তন হয়েছে– পুনঃ পুনঃ। ঋগবেদ যুগে যজ্ঞ করার সময়ও নরাশংসের প্রশংসা কীর্তন বা স্তুতি নিবেদন করা হত। প্রশস্তি, গাঁথা, প্রশংসা, কীর্তন, স্তুতি, গীত ইত্যাদি শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হল নাত । এ নাত বিগত ১৪০০ বছর পর্যন্ত যে কোন ধর্মানুসারী মুসলিমের প্রতি দিনের ইবাদাতের অংশ হিসাবে গণ্য হয়।

কীরি

শেষ অবতার সম্পর্কে ঋগবেদের একটি শ্লোকের মর্ম হলো– যিনি প্রভুর ভক্ত তিনি প্রভুর সাথে সম্পর্কিত। সংস্কৃত শ্লোকটি হল– "যো রূদ্রস্য চোদিত্যযঃ কৃশস্য। মোব্রনো নাম মানষ্যকীরেঃ।-(ঋগবেদ, ২য় খণ্ড, দ্বাদশ মন্ডল/অধ্যায়, শ্লোক নম্বর-৬)। উপরোক্ত মন্ত্রের জপকারীকে বলা হয়েছে কীরি। কীরি অর্থ হল মহা প্রভুর সর্বশেষ জপকারী। জপকারীর অর্থ হল প্রশংসাকারী। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর দুটি নাম মুহাম্মাদ এবং আহমাদ। মুহাম্মাদ শব্দের অর্থ– প্রশংসিত। আহমাদ নামের অর্থ প্রশংসাকারী, নাতকারী বা জপকারী।

পরোক্ষ জ্ঞান

বেদ গ্রন্থসমূহে নরাশংসের বর্ণনা দেয়া হয়েছে মধু জিহব, মধুর ভাষী এবং পরোক্ষ জ্ঞান সম্পন্ন। এ পরোক্ষ জ্ঞান কি? এ পরোক্ষ জ্ঞান বলতে প্রত্যাদেশ

www.nagorikpathagar.org

বুঝানো হয়েছে। প্রত্যাদেশের শব্দ ওয়াহী এবং ইংরেজী শব্দ *Revealation .(V.S. Apte, The Students Sanskit English Dictionary, page-140).*

পাপ নিবারক

ঋগবেদে নরাশংসকে বলা হয়েছে মানুষকে সকল পাপ থেকে নিবৃতকারী।-(ঋগবেদ, কাণ্ড-১, অধ্যায়-১০৬, মন্ত্র-৪)। ঋগবেদে যদিও নরাশংসকে পাপ নিবৃতকারী বলা হয়েছে– তাঁকে পাপ থেকে উদ্ধারকারীও বলা হয়েছে। যেমন ঋগবেদে বলা হয়েছে, "বিশ্বস্মাত্রো অহংসো নিষ্পিপর্তন" এর অর্থ – আমাদেরকে বিশ্বের সকল পাপ থেকে উদ্ধার করুন।-(ঋগবেদ, কাণ্ড-১, অধ্যায়-১০৬, মন্ত্র-৪; ধর্মাচার্য ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়, "বেদ পূরাণে আল্লাহ্ ও হযরত মুহাম্মাদ (বাংলা অনুবাদ)" ই.সা.প্র. হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, শিখ ধর্ম সংক্রান্ত ঐক্য বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ; প্রকাশনা নং-১৭, পৃষ্ঠা-৩৭-৩৮, ২০০৭)।

মধু জিহব

ঋগবেদ যুগে নরাশংস বিভূষিত হতেন মধু জিহবা বা মিষ্ট কণ্ঠ এবং প্রিয় স্তুতি বা বিশেষণে। ঋগবেদে বলা হয়েছে–নরাশংস ছিলেন মিহপ্রিয় মহিস্মন্যজ্ঞ। মধু জিহব হবিষকৃতম (ঋগবেদ সংহিতা)।

জ্যোতির্ময়তা ঃ নূরানী

ঋগবেদে নরাশংসের একটি বর্ণনা হল– তিনি ছিলেন স্বর্চি। সংস্কৃত ভাষার শব্দ স্বর্চি এর বাংলা হল সুন্দর দীপ্তি। স্বর্চি শব্দের তাৎপর্য হল তিনি এমন সুন্দর এবং কান্তিময় যে, তার মুখমন্ডল থেকে জ্যোতি, রশ্মি উদ্ভাসিত হয়। ঋগবেদে স্বর্চি নরাশংস সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তাঁর মহত্ব প্রভায় সকল গৃহ আলোকিত হবে। সংস্কৃত ভাষ্য–"জ্বলাবসোর্ণ পৃংস্য, চির্জ্যোতি, ভদ্যোতষ্টাষ্ঠিষূ"।

স্বর্চির আবির্ভাব অঞ্চলে এবং বিশ্বে এমন কোন গৃহ থাকবে না যেখানে তাঁর প্রশংসা উচ্চারিত হবে না। বস্তুত নরাশংস নামের অর্থ হল– প্রশংসিত ব্যক্তি বা প্রশংসিত মানুষ।

ঋগবেদে নরাশংসকে বলা হয়েছে, "হে দেবগণের মধ্যে শুচি, পাবকো, অদ্ভুতো, যজ্ঞং, যজ্ঞ সম্পাদনকারী নরাশংস ! দ্যুলোক হতে তিনবার আমাদের যজ্ঞে এসে মধুর সাথে মিশ্রিত হোন"। সংস্কৃত শ্লোকটি "শুচিঃ পাবকো অদ্ভুতো মদ্ভা যজ্ঞং মিশিক্ষাত। নরাশংসস্ত্রিরা দিবো দেবো দেবেষু জাজ্ঞয়ঃ"।-(ঋগবেদ, ১ম খণ্ড, ১৪২ অধ্যায়, ৩ শ্লোক)।

www.nagorikpathagar.org

কান্তিবান পুরুষ নরাশংস

ঋগবেদে নরাশংস সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, নারশংস হবেন অত্যন্ত সুন্দর কান্তিবান ও সুদেহী পুরুষ। তিনি প্রতি গৃহে জ্ঞানের আলো প্রজ্বলিত করবেন। দৈহিকভাবে রাসূলুল্লাহ্ মুহাম্মাদ সা. ছিলেন অতীব সুন্দর এবং কান্তিবান পুরুষ।

মানব জাতির মধ্যে হযরত ইউসুফ (আ.) কে সুন্দরতম ধরা হয়। সমকালীন মানুষদের মধ্যে আরবে সবচেয়ে সুদর্শন এবং কান্তিবান পুরুষ ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ সা.।

একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর কনিষ্টা স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা.) কে কোন এক জিহাদকালে সফর সঙ্গী করেননি। এ বিচ্ছেদ ব্যথায় বিহবল হয়ে হযরত আয়েশা রা. সর্প গিরিতে গমন করে সাপের গর্তের মুখে পা রেখে কান্না জুড়ে দেন। স্বামী তাঁকে সফরসঙ্গী করেন নি বলে সাপকে আহ্বান করতে থাকেন। বলতে থাকেন মাতম করে যে, আমার স্বামী আমাকে সফরসঙ্গী করেনি। তোরা আমাকে গ্রহণ কর।

Reverend Bosword Smith তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, বিরোধী ব্যক্তিগণও নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর আকর্ষণ শক্তি ও প্রভায় প্রভাবিত হয়ে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য হতেন।-(Reverend Bosword Smith : Muhammad and Muhammadalism, Page-111).

অঞ্জনময়তা ও সুন্দর দীপ্তি

নরাশংস সম্বন্ধে ব্যবহৃত আরেকটি শব্দ প্রতিধামান্যঞ্জন। এর অর্থ গৃহে গৃহে প্রকাশিত উজ্বল দীপ্তি। প্রতিধামান শব্দের অর্থ হল– গৃহে গৃহে। অঞ্জন শব্দের অর্থ প্রকাশিত হওয়া আলো, রঙ, ইত্যাদি। প্রতিধামান্যঞ্জন শব্দের অর্থ প্রত্যেক গৃহে গৃহে প্রকাশিত উজ্জ্বল আলো নরাশংস বা প্রশংসিত মানুষ।

স্বর্চি শব্দের আরেকটি অর্থ হল– শোভনা এবং অর্চিয়স্যমঃ। অর্চিয়স্যমঃ শব্দের অর্থ সুন্দর দীপ্তি। নরাশংসকে অঞ্জন বলা হয়েছে। অঞ্জনের এক অর্থ প্রত্যেক গৃহে গৃহে প্রকাশিত আলো। এ আলো এমন উজ্জ্বল যে, এর দ্বারা গৃহ জ্বলে ভস্ম হয়ে যেতে পারে। তবে নরাশংসের অঞ্জন বা আলো ঐ অর্থে ব্যবহার করা হয়নি।

একই শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহার হয়। সংস্কৃত ভাষায় একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যাত্রা, অভিনয়ের মধ্যে সৈন্ধব শব্দ দ্বারা অশ্ব বুঝায়। কিন্তু ভোজনকালে সৈন্ধব শব্দ দ্বারা লবণ বুঝায়।

তনুৎপদ

গর্ভস্থ নরাশংসকে তনুৎপদ বলা হয়। যখন তিনি প্রত্যক্ষ হন, তখন তিনি বলবান নরাশংস হন। এর সংকৃত শ্লোক-তনুংনপাদুচ্যতে গর্ভ আসুরো নরাসংসো ভবতি যদ্ধি যায়তে। – (ঋগবেদ, ৩ খন্ড, ২৯ অধ্যায়, ১১ সুক্ত)।

www.nagorikpathagar.org

নরাশংসের বাহন

নরাশংসের অবস্থান এবং বাহন সম্পর্কে ঋগবেদে বলা হয়েছে, "দেবতাদের অগ্রে যিনি চলেন তিনি নরাশংস। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। নরাশংসকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, আপনি নানা বর্ণধারী ঘোটক যোগে এবং স্থানে আসুন। মহানবী মুহাম্মাদ (সা.) এর বাহন ছিল ঘোড়া এবং উট। ঋগবেদের এ শ্লোকটির সংস্কৃত ভাষা "আ দেবানামগ্রয়াবেহ যাতু নরাশংসো বিশ্বরূপে ভিরঐশ্বং। ধাতস্য পথা নমসা মিয়েধো দেবেভ্যো দেবতমঃ সুষুদৎ। – (ঋগবেদ, ১৯ কাণ্ড, ৭০ অধ্যায়, ২ শ্লোক বা মন্ত্র)।

পোরান পর্বত/হেরা পর্বত

হযরত মূসা (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন মহা প্রভু সিনাই পর্বত থেকে আবির্ভূত হবেন এবং ঐ উপত্যকায় তাদের কাছে আসবেন এবং পোরান পর্বত থেকে আপন তেজ প্রকাশ করবেন। তিনি দশ সহস্র সাধু সন্ন্যাসী সাথে নিয়ে আসবেন। তাদের জন্য তার দক্ষিণ হস্ত থেকে অগ্নিময় বিধি ব্যবস্থা প্রকাশ পাবে। (Deuteronomy, 33 ঃ 2, ২য় বিবরণ ৩৩ ঃ ২)। মক্কা বিজয়কালে রাসূলুল্লাহ এর সাথী সঙ্গী সাহাবী সংখ্যা ছিল ১০,০০০ হাজার।

বাইবেলের পোরান শব্দটি হল আরব দেশের ল্যাটিন নাম। আদি পুস্তকের সোলায়মানের গীত সঙ্গীতে (Psalm) বলা হয়েছে-My Beloved is white and red, the Chief among 10 thousands. (আদি পুস্তক, সুলাইমানের সঙ্গীত-৫)। এর অর্থ আমার প্রিয় হবে শুভ্র এবং লোহিত বর্ণীয় ব্যক্তি। তিনি দশ সহস্রের মধ্যে প্রধান নেতা। এ দশ সহস্র কথাটির পুরাতন বিবরণ বা ইয়াহুদী বাইবেলে উল্লেখিত হওয়ার তাৎপর্য কি ? নতুন বাইবেলে একই বিষয় উল্লেখিত হয়েছে–দেখ, সদা প্রভু দশ সহস্র দরবেশদেরকে সাথে নিয়ে আগমন করেছেন।- (Behold, The Lord cometh with ten thousand of his saints (New Testament) Jude-1 ঃ 14, জিহুদা-১ ঃ ১৪)।

১৩
ঋগবেদে মামাহ ঋষি

ঋগবেদে বলা হয়েছে "চক্র" বিশিষ্ট যানের অধিকারী (অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন) সত্যবাদী, সত্যপ্রিয়, চরম জ্ঞানী, শক্তিশালী ও মুক্ত হস্ত "মামাহ' দেব মানবকে তাঁর বাণী দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন। সর্ব শক্তিমানের পুত্র সম মামাহ সর্বগুণের অধিকারী নিখিল বিশ্বের হিতকারী দশ সহস্র অনুচরসহ বিখ্যাত হবেন।

www.nagorikpathagar.org

ঋগবেদের সংস্কৃত শ্লোকটি অনস্বন্ত সৎপতি মামহে মে গাবা চেতিষ্ট অসুরো মঘোনঃ। ত্রৈবৃষ্ণো অগ্নে দশভিঃ সহস্রৈর্বেশ্বানর এ্যরুণ শ্চিকেত (ঋগবেদ, ৫ম মন্ডল, ২৭ সুক্ত, ১ শ্লোক; ড. ধর্মাচার্য অধ্যাপক বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-১১০)।

মিত্র, বরুন, মামাহ

ঋগবেদের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, হে মিত্র, বরুণ, মামাহ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী, দূত, আমাদেরকে রক্ষা করুন। মিত্র, বরুণ এবং মামাহ প্রমুখ একই স্ত রের দেবতা। মামাহ ঋষি সংক্রান্ত ঋগবেদের শ্লোকটি হল, (১) "মিত্র (২) বরুণ, (৩) মামাহ, (৪) অদিতি, (৫) সিন্ধু, (৬) পৃথিবী, (৭) দূত আমাদেরকে রক্ষা করুন"। এটা একটি শ্লোকের শেষ অংশ।

এ শ্লোকটিতে বলা হয়েছে- তন্নো মিত্র, বরুণ, মামাহন্ত, আদিতিঃ; সিন্ধু, পৃথিবী, দূত, দৌঃ। আমাদেরকে রক্ষা করুন। এ শ্লোকগুলোতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে- আয়ু, ধন, সৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্য। শত্রুকে পরাজিত করার প্রার্থনাও এ সূত্রে করা হয়েছে।

মামাহ ঋষির বর্ণনা ঋগবেদে আছে এবং অথর্ববেদেও আছে। অথর্ব বেদ মতে মামাহ ঋষি হবেন- (১) উষ্ট্রারোহী, (২) মরুস্থলবাসী (অর্থব বেদ, ২০ মন্ডল (অধ্যায়), ৯ অনুবাক, ৩১ সুক্ত)।

ঋগবেদ মতে, মামাহ ঋষির থাকবে ১০ সহস্র অনুচর। (ঋগবেদ, ৫ মন্ডল, ২৭ সুক্ত)। মামাহর আবির্ভাব হবে এমন যুগে যখন দেব রচনা ছাড়া অন্য শাস্ত্র গ্রন্থ ও মন্ত্র রচিত হবে এবং যজ্ঞে পঠিত হবে। (ঋগবেদ, ১ম মন্ডল, ১৯ সুক্ত, ২য় শ্লোক)।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক Washington Irving তাঁর রচিত Life of Muhammed গ্রন্থে মহানবীর মক্কা অভিযান সম্পর্কে লিখেছেন "The Prophet Muhammed departed (from Madina) with ten thousand men on this Momentous enterprise to Mecca, page-17".

উষ্টারোহী, দশ সহস্র সঙ্গী বিশিষ্ট অনার্য

মণু সংহিতায় মামাহ ঋষির বর্ণনার মধ্যে আছে মামাহ ঋষি হবেন- আর্য জাতি বহির্ভূত। তিনি হবেন মরুনিবাসী এবং উষ্ট্রারোহী। উষ্ট্রের মাংস ভক্ষণ করলে অপকৃচ্ছ প্রায়শ্চিত্য করতে হবে (মণু সংহিতা, ১১ঃ১৫৭)। তদুপরি আর্য জাতির জন্য উষ্ট্র দুগ্ধ পান নিষিদ্ধ (মণু সংহিতা, ৫ঃ৮)। উষ্ট্রে আরোহন করলে প্রাণায়াম শাস্তিযোগ্য পাপ হবে (মণু সংহিতা-১১ঃ১০২)।

www.nagorikpathagar.org

উষ্টারোহী ঋষি বা মহর্ষী বা প্রেরিত পুরুষ যে আর্য ঋষি মনীষী থেকে ভিন্নরূপ হবেন– তা দেখা যায় ঋগবেদ, অথর্ববেদ এবং মণু সংহিতায় রয়ে গেছে। প্রশ্ন হল, মণু সংহিতা, ঋগবেদ, অথর্ব বেদ এর উৎস পরম স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'য়ালা না হলে ঋগবেদ রচয়িতাগণ উষ্ট্রারোহী এবং মক্কা বিজয় কালে দশ সহস্র সঙ্গী বিশিষ্ট মামাহ ঋষি সম্বন্ধে অবহিত হলেন কিভাবে?

জামাত ও সালাত

ঋগবেদে জামাত এবং সালাত শব্দগুলোও ব্যবহার করা হয়েছে। এ জামাত এবং সালাত বলতে ঋগবেদে কি বুঝানো হয়েছে? এতে মত পার্থক্য আছে।

ঋগবেদে মামাহ, বরুণ, মিত্র, আদিতি, ইত্যাদি যেমন আছে জামাত এবং সালাত শব্দ দু'টিও আছে। ঋগবেদে বলা হয়েছে– হে ঈন্দ্র ও অগ্নি (দেব)! আমাকে জামাত এবং সালাত অপেক্ষাও অধিক এবং বহুবিদ ধন দান কর। অত্রব হে ঈন্দ্র ও অগ্নি! আমি তোমাদের সোম প্রদানকালে পাঠের জন্য একটি নতুন শ্লোক রচনা করছি।

সংস্কৃত শ্লোকটি নিম্নরূপঃ অশ্রবং হি ভুরিদাবওরা বাং বি জামার্তু রুত বা ঘা সালাত। অর্থাৎ সোমস্য প্রযতী যুবভ্যা মিন্দ্রাগ্নীয় স্তোমং জনয়ামি নব্যং। (ঋগবেদ, ১ম মন্ডল, ৯ সুক্ত, ২ শ্লোক)।

ঋগবেদের এক ভাষ্যকার উপরোক্ত শ্লোকে জামার্তু এর অর্থ করেছেন গুণবিহীন জামাতা। পিতা কন্যার স্বামী লাভের জন্য কন্যার কর্তাকে ধন দান করেন। মনীষী সায়ন জামাতা অর্থ করেছেন অপত্য বা সন্তান। ঋষি সায়ণ সালাতের অর্থ করেছেন শ্যালক। ঋষি সায়ন সালাতের অপর অর্থ করেছেন কুল্যের খৈ। এগুলো তাদের অনুমান।

সালাত

ঋগবেদে দেখা যায় মামাহ ঋষির মাধ্যমে প্রার্থনা, আরাধনা বা সালাতের নতুন স্তোত্র বা শ্লোক অবতীর্ণ হবে। এ স্তোত্র বা শ্লোকগুলো সালাত, নামায বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পাঠ করা হবে।

এ শ্লোকগুলোর সঠিক অর্থ মামাহ ঋষির মক্কায় আবির্ভাবের হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে রচিত। তাই তারা সঠিক অনুমান করতে পারেননি। শব্দ দুটি সংস্কৃত শব্দ নয়। আরবী ভাষার শব্দ। মূলকথা ঋগবেদের উপরোক্ত শ্লোকের উৎস বা জ্ঞাতা এমন সত্ত্বা যিনি সালাত এবং জামাত শব্দের সঠিক অর্থ অবহিত। পরবর্তীদের জ্ঞান মতে, সালাত এবং জামাত সমবেতভাবে আদায়যোগ্য প্রার্থনা।

www.nagorikpathagar.org

ঋষিগণ তাদের ইচ্ছামত যজ্ঞ বা উপাসনার মন্ত্র তৈরী করতে সর্বক্ষেত্রে পারেন না। পরমেশ্বরই নির্ধারণ করে দেন কিরূপ প্রার্থনায় কি মন্ত্র পাঠ করতে হবে? প্রার্থনার মন্ত্র ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত বা রচিত শাস্ত্রীয় গ্রন্থে থাকে।

ঋগবেদ ও অথর্ববেদে উল্লেখিত ঋষিদের মধ্যে মামাহ ঋষি নতুন। অন্যান্য ঋষিগণ প্রাচীন। মামাহ ঋষি আবির্ভূত হওয়ার পর প্রার্থনায় নতুন মন্ত্র তৈরী হওয়ারই কথা। জামাত এবং সালাত শব্দ দুটি যেমন–অসংস্কৃত মামাহ শব্দটিও অসংস্কৃত।

মামাহ ঋষি

মামাহ ঋষির উল্লেখ হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রে বহু আছে। ঋগবেদে বহু শ্লোকে মামাহ ঋষির উল্লেখ বার বার করা হয়েছে। ঋগবেদে ১ম মন্ডল (অধ্যায়) এর ১৯টি শ্লোকে মামাহ ঋষির উল্লেখ করা হয়েছে। ঋগবেদের ১ম মন্ডলের এ ১৯টি শ্লোক হল– (১) মন্ডল ১, ৯৪ সুক্ত, ১৬ শ্লোক; (২) মন্ডল ১, ৯৫ সুক্ত, ১১ শ্লোক; (৩) মন্ডল ১, ৯৬ সুক্ত, ৯ শ্লোক; (৪) মন্ডল ১, ৯৮ সুক্ত, ৩ শ্লোক; (৫) মন্ডল ১, ১০০ সুক্ত, ২৯ শ্লোক; (৬) মন্ডল ১, ১০১ সুক্ত, ১১ শ্লোক; (৭) মন্ডল ১, ১০২ সুক্ত, ১১ শ্লোক; (৮) ১ম মন্ডল, ১০৩ সুক্ত, ৮ শ্লোক; (৯) ১ম মন্ডল, ১০৫ সুক্ত, ১৯ শ্লোক; (১০) ১ম মন্ডল, ১০৬ সুক্ত, ৭ শ্লোক; (১১) ১ম মন্ডল, ১০৭ সুক্ত, ৩ শ্লোক; (১২) ১ম মন্ডল, ১০৮ সুক্ত, ১৩ শ্লোক; (১৩) ১ম মন্ডল, ১০৯ সুক্ত, ৮ শ্লোক; (১৪) ১ম মন্ডল, ১১০ সুক্ত, ৯ শ্লোক; (১৫) ১ম মন্ডল, ১১১ সুক্ত, ৫ শ্লোক; (১৩) ১ম মন্ডল, ১০৯ সুক্ত, ৮ শ্লোক; (১৪) ১ম মন্ডল, ১১০ সুক্ত, ৯ শ্লোক; (১৫) ১ম মন্ডল, ১১১ সুক্ত, ৫ শ্লোক; (১৬) ১ম মন্ডল, ১১২ সুক্ত, ৫০০ শ্লোক; (১৭) ১ম মন্ডল, ১১৩ সুক্ত, ১০ শ্লোক; (১৮) ১ম মন্ডল, ১১৪ সুক্ত, ১১ শ্লোক; (১৯) ১ম মন্ডল, ১১৫ সুক্ত, ৬ শ্লোক। ঋগবেদের এই শ্লোকগুলো মামাহ ঋষি সংক্রান্ত।

১৪

শুক্ল যজুর্বেদে নরাশংস মুহাম্মাদ (সাঃ)

যজুর্বেদের বহু অধ্যায়ে উপাস্যগণ কর্তৃক ঋষি নরাশংসের স্তুতি (নাত) এর উল্লেখ আছে। নরাশংস শব্দের অর্থ প্রশংসিত নর। মুহাম্মাদ শব্দের অর্থ প্রশংসিত ব্যক্তি।

শুক্ল যজুর্বেদে বলা হয়েছে যে, দেবগণ হবি (ঘৃত) এবং সোম (যজ্ঞের ঘৃত)– উভয় প্রকার ঘৃত পানীয় পান করেন। তাদের কর্ম শোভন। তা নিষ্পাপ ও বুদ্ধির ধারক।

www.nagorikpathagar.org

যজ্ঞের ঐ দেবগণের আরাধ্য নরাশংসের আমরা স্তুতি (নাত) পাঠ করি। এ স্তুতির সংস্কৃত ভাষ্য হল– "নরাশংসস্য মহিমামান মেষাম্মপ স্তোষাম যজতস্য যজ্ঞইঃ। যে শুক্র তবঃ সচইয়ো ধিন্ধাঃ সদস্তি দেব্য উবয়ানি হব্যা"। (শুক্ল যজুর্বেদ, ২৯ অধ্যায়, ২৭ সুক্ত)।

বরণীয় আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদ

"আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) যে বরণীয়"-এ বাক্যটি যজুর্বেদের। যজুর্বেদের সংস্কৃত বাক্যটি হল, "আল্লা রাসূল মোহাম্মাদ রকং বরস্য"। আল্লাহ্‌ শব্দটি প্রকাশিত হয়েছে সংস্কৃত অল্লো এবং আল্লা শব্দে।

সুক্তে বা শ্লোকে নরাশংস শব্দটি উল্লেখ করা না হলেও এর সমার্থক শব্দ "স্পৃতি যোগ্য, বরণীয়, শব্দাবলী ব্যবহার হয়েছে"। (শুক্ল যজুর্বেদ, ২৯ অধ্যায়, ২৮ সুক্ত)।

নরাশংসের আগমনকাল

নরাশংসের আগমনকাল সম্পর্কে বেদের ঘোষণা কিরূপ ? বেদ রচিত হয়েছে মহানবী মুহাম্মাদ মোস্তাফা (সাঃ) এর জন্মের বহু শতাব্দী এমন কি সহস্র সহস্র কাল পূর্বে। যখন কোন ঘটনা ঘটার পূর্বেই গ্রন্থ রচিত হয়– তখন তাতে ঘটনার পূর্বাভাস বা ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষিত হয়। ঘটনা ঘটার পর যদি সে কাহিনী বর্ণনা করা হয়, তা ইতিহাস হিসাবেই পরিগণিত হয়।

বহু বৈশিষ্ট্যের আকর নরাশংস

নরাশংস মুহাম্মাদ (সাঃ) ছিলেন দীর্ঘকেশী, মুন্ডিতকেশী, পর্বতাশ্রয়ী, অর্থাৎ পর্বতে আশ্রয় গ্রহণকারী। তদুপরি তপস্যাকারী, ধনুককারী, বানধারী, ইত্যাদি। এ বিশেষণগুলো রাসূলুল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে অধিকতর সঠিকভাবে প্রযোজ্য।

শুক্ল যজুর্বেদে ঋষি নরাশংসের বন্দনা হয়েছে– নিম্নরূপ ভাষায়। দ্বিধাহীন, নির্ভীক, বিচারকরূপী, রুদ্রকে নমষ্কার। বাণধারী ও তুনীরধারী রুদ্রকে নমষ্কার। তীক্ষবাণ ও আউধধারী রুদ্রকে নমষ্কার। সংস্কৃত ভাষ্যে– "নম ধৃষ্ণবে চ প্রমৃশায় চ। নমঃ নিষঙ্গীন চেষুধিমতে। নমস্তি ক্ষানেষ বে চাইউধিনে। নমঃ স্বাষুধায় চ সুবন্বনে চ"।

ধনুকধারী রুদ্র

ধনুকধারী রুদ্রের সঙ্গীদের বন্দনা ও স্তুতিবাদ করা হয়েছে শুক্ল যজুর্বেদে। সাহাবীদের স্তুতিবাদ ও বন্দনার ভাষা ছিল নিম্নরূপঃ হে ধনুক ধারী রুদ্র ! তোমায় নমষ্কার। ধনুতে জা ও বাণ যোজনাকারী রুদ্র সঙ্গীদের নমষ্কার। ধনুর আকর্ষণ ও বাণ নিক্ষেপকারী রুদ্রদের নমষ্কার। শত্রুর প্রতি বাণ নিক্ষেপকারী ও তাদের তাড়নাকারী রুদ্রদের নমষ্কার" (মন্ত্র নং-২২)।

www.nagorikpathagar.org

ধনুকবাণ বর্ষণকারী নরাশংস

শুক্ল যজুর্বেদে বলা হয়েছেঃ জট জটাধারী ও মুন্ডিত কেশ রুদ্রকে নমস্কার। সহস্রাক্ষ ও বহু ধনুকধারী রুদ্রকে নমস্কার। পর্বত শ্রয়ী ও অন্তর্যামী রুদ্রকে নমস্কার। বর্ষণকারী ও বাণধারী রুদ্রকে নমস্কার। সংস্কৃত ভাষ্যে আছে "নমঃ কপর্দ্বিনে চ ব্যুপ্তকেশায় চ। নমঃ সহস্রাক্ষায় চ শতধন্বনে চ। নমো গিরিশয়ায় চ শিপিবৃষ্টায় চ। নমো মীষ্টমায় চেষূমতে (বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৯৫)।

গিরিশ ঋষি

শুক্ল যজুর্বেদে যে সবিতৃদেব, রুদ্র নেড়ে ঋষির বর্ণনা করা হয়েছে-তিনি হবেন গিরিশ। গিরিশ তাকেই বলা হয়, যিনি পীরীতে বা পর্বতে তপস্যা করেন এবং সিদ্ধি লাভ করেন। বৈদিক মুণি, ঋষিগণ বনে জঙ্গলে তপস্যা করতেন।

রাসূলুল্লাহ্ মুহাম্মাদ (সা.) মক্কা নগরীতে বাস করতেন। তিনি সংসার ত্যাগী ছিলেন না। সংসার ত্যাগী না হয়েও তিনি হেরা পর্বতে তপস্যা করতেন। তাঁর ভৃত্য যায়েদ ছিল তাঁর পুত্রের মত। সঙ্গীগণ ছিলেন ভৃত্যের চেয়েও অনেক বেশী অনুগত।

বৌদ্ধধর্ম প্রচারক গৌতম বুদ্ধ মুন্ডিত কেশ সম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু, তিনি ধনুক বহনকারী এবং পর্বতে সিদ্ধি লাভকারী ছিলেন না। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর স্বাভাবিক কেশবিন্যাস ছিল দীর্ঘ কেশ সংযুক্ত। তিনি বাবরী চুল রাখতেন। তবে মাঝে মাঝে তিনি কেশ মুন্ডিত হতেন।

বিশ্বব্যাপক নরাশংস

হে দেব, সকলের কল্যাণের জন্য তোমাকে অর্চনা করি। সকল বিশ্ববাসী তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করুক। বিশ্বব্যাপী সকলকে তুমি সঞ্জীবিত কর (শুক্ল যজুর্বেদ, ৪র্থ অধ্যায়, মন্ত্র-২৫)।

উপরে সবিতি- দেবের যে বন্দনা এবং পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে– তাঁর সাথে বেদের দেব দেবতাদের সঙ্গতি কতটুকু ? বেদ পাঠ ও শ্রবণে ব্রাহ্মণ ছাড়া পৃথিবীর কোন মানুষের অধিকার নেই।-(অথর্ব বেদ, ৭ম কান্ড, ৬ষ্ঠ অনুবাক)। অথচ সবিতৃ দেব বিশ্বব্যাপক। বিশ্ববাসীর সকলে তাকে হৃদয়ে ধারণ করবে। তিনি বিশ্বব্যাপী সকলকে সঞ্জীবিত করবেন।

নরাশংস আর্য দেবতা নন

এরূপ বিশ্ব দেবতা সবিতৃ দেব কি বেদের দেবতা? বেদ পাঠ তো আর্যাবর্ত ভিন্ন পৃথিবীর বহু স্থানে ও কালে পাঠ ও শ্রবণ নিষিদ্ধ (অথর্ববেদ, ৭ম কান্ড, ৬ষ্ঠ অনুবাক)। আর্যদেবতা হলে এরূপ সবিতিদেব কিভাবে দেশ, কাল, পাত্র নির্বিশেষে বিশ্ব মানবের সকলকে ঐশী জ্ঞান দান করবেন?

www.nagorikpathagar.org

সবিতিদেব বিশ্বব্যাপক। তিনি আর্য দেবগণের ন্যায় কেবলমাত্র আর্যাবর্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। বিশ্বব্যাপক সবিতিদেব কেবলমাত্র আর্য জাতির দেবতা হবেন না। সবিতিদেব সমগ্র বিশ্বে এবং আর্য, অনার্য সকল বিশ্ব মানবের দেবতা হবেন।

বিশ্বনবী নরাশংস

আরব নরাশংস মুহাম্মাদ (সা.) রাজা ছিলেন, শাসক ছিলেন, তিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতি "রহমাতুল্লিল আলামীন" বা বিশ্বের প্রতি করুণাস্বরূপ ছিলেন। নরাশংস মুহাম্মাদ দেশ, কাল, পাত্র নির্বিশেষে প্রত্যেককে তাঁর প্রচারিত ধর্ম গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন। তাঁর ঐশ্বরিক গ্রন্থ কুরআন পাঠের আবেদন করেছেন। সবিতিদেবের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য নরাশংস মুহাম্মাদ এবং তাঁর প্রভু ঈশ্বরের অবতীর্ণ গ্রন্থে পাওয়া যায়।

অগ্নি দেবতা ও নরাশংস

অগ্নি হিন্দুদের এক দেবতা। পূজার মধ্যে অগ্নির পূজা করা হয়। অগ্নি বলতে শুধু অগ্নি বুঝানো হয় না। অগ্নি বলতে এক শক্তি ও সত্ত্বাকে বুঝানো হয়েছে (যজুর্বেদ, অধ্যায়-৩, সুক্ত-১৩)।

শুক্ল যজুর্বেদের ১৬, অধ্যায়ে রুদ্রদেবের অর্চনা করা হয়েছে শতাধিকবার। তাঁর বিভিন্ন গুণাবলী উল্লেখ করে স্তব, স্তুতি করা হয়েছে। শুক্ল যজুর্বেদে স্তব, স্তুতিগুলো নিম্নরূপ।

দুঃখনাশক রুদ্র

হে দুঃখনাশক জ্ঞানপদ রুদ্র! তোমার ক্রোধের উদ্দেশ্যে নমস্কার। তোমার ক্রোধের ভয়ে তোমাকে প্রণতি করি। তোমার বাণ ও বাহু যুগলকে নমস্কার। এর সংস্কৃত ভাষ্য "নমস্তে রুদ্র মনব্য উতো ত ইষবে নমঃ। বাহুভ্যামুত তে নমঃ"। (শুক্ল যজুর্বেদ, ১৬শ অধ্যায়)।

পূণ্যময়, মঙ্গলময় রুদ্র

শুক্ল যজুর্বেদে আরো বলা হয়েছেঃ-"হে রুদ্র! তোমার মঙ্গলময়, সৌম্য, পূণ্যপদ দেহ আছে। হে গিরিশ! ঐ সুখতম শরীরের দ্বারা আমাদের দিকে তাকাও। এর সংস্কৃত ভাষ্য "যা তে রুদ্র শিবা তনুরগোরাহ পাপ কাশিনী। তয়া নস্তন্বা শন্তময়া গিরিশ ত্বাভি চাকসীহি"। (শুক্ল যজুর্বেদ, ১৬শ অধ্যায়)।

নিদ্রিত এবং জাগ্রত নরাশংস

স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থা অনুভবকারী রুদ্রদের নমস্কার। নিদ্রা ও উপবেশন অবস্থায় অবস্থানকারী রুদ্রদের নমস্কার। নমস্কার স্থির ও ধাবিত রুদ্রদের! (শুক্ল যজুর্বেদ, মন্ত্র নং-২৩)।

www.nagorikpathagar.org

ভৃত্য পূজ্য রুদ্র

শুক্ল যজুর্বেদে আরো আছেঃ চির তরুণ সহস্রাক্ষ নীলকণ্ঠের প্রতি নমষ্কার। তার যারা ভৃত্য– তাদেরও আমি নমষ্কার করি। এর সংস্কৃত ভাষ্যঃ পঃনমো হস্ত নীল গ্রীবায় সহস্রাক্ষায় মীতুষে। অথো যো ঐস্য সত্ত্বানোহহং তেব্যোহ করং নমঃ"। (শুক্ল যজুর্বেদ, ১৬শ অধ্যায়)।

মুন্ডিত কেশ রুদ্র নেড়ে নরাশংস

শুক্ল যজুর্বেদে ১৬ অধ্যায়ে রুদ্র দেবের অর্চনা করা হয়েছে শতাধিকবার। তাঁর গুণাবলী উল্লেখ করে স্তব, স্তুতি করা হয়েছে।

হজ্ব উমরার সময় কেশ মুন্ডন রাসূলুল্লাহ এর সুন্নাত। বাবরী কেশ অপেক্ষা মুন্ডিত কেশ রাসূলের অনুসারীদের অনেকের অনুসৃত পদ্ধতি। এজন্য মুসলিমগণ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বিশেষ করে ভারতীয় হিন্দুদের কাছে 'নেড়ে' খ্যাতিতে চিহ্নিত হয়ে আছেন।

উপ-মহাদেশীয় হিন্দুগণ মুসলিমদেরকে নেড়ে খ্যাতিতে আখ্যায়িত করেন। ওয়ালী বুযুর্গদের অনেকেই নিয়মিত কেশ মুন্ডন করে থাকেন। আর্য ঋষিগণ সাধারণত ওয়ালী বুজুর্গদের ন্যায় মুন্ডিত কেশ সম্পন্ন নন।

সংসারী এবং সংসার ত্যাগী রুদ্র সম্বন্ধে শুক্ল যজুর্বেদে ১৬শ অধ্যায়ে বলা হয়েছেঃ সংসারের পরপারে ও সংসার জ্ঞাতরূপী রুদ্রকে নমষ্কার। পাপ তাড়নের কারণরূপী রুদ্রকে নমষ্কার।

তীর্থে ও কূলে জ্ঞাতরূপী রুদ্রকে নমষ্কার। কূশাদিতে ও ফেন্যায় জ্ঞাতরূপী রুদ্রকে নমষ্কার। এর সংস্কৃত ভাষ্য নিম্নরূপঃ "নমঃ পার্যায় চাবার্যায় চ। নমঃ প্রতরণায় চোওরণায় চ। নমস্তীর্থায় চ কুলায় চ। নমঃ শষ্পায় চ ফেন্যায় চ"।

সংসার ত্যাগী নরাশংস রুদ্র

উপরোক্ত শ্লোকে নমষ্কার জ্ঞাপন করা হয়েছে ভবিষ্যতে আবির্ভূতব্য রুদ্র দেবতাকে। যে রুদ্র দেবতা হবেন ঋষিদের মত সংসার ত্যাগী এবং বৈরাগী। কিন্তু, শুক্ল যজুর্বেদে যে রুদ্রের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তিনি হবেন একই সাথে সংসারী এবং সংসারে অনাসক্ত বৈরাগী। এ নরাশংস দেবের কর্মক্ষেত্র এবং রাজত্ব হবে মানব সমাজে ও তীর্থক্ষেত্রে সমভাবে।

উপরে মুন্ডিত কেশ রুদ্র নেড়ের যে বর্ণনা শুক্ল যজুর্বেদে দেওয়া আছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সবিতিদেব রুদ্র ঋষির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে (১) তিনি হবেন দুঃখনাশক, জ্ঞানপদ ও মঙ্গলময়। তবে, তিনি হবেন তার ধর্ম শত্রুদের প্রতি কঠোর। (২) তাঁর ভৃত্য অর্থাৎ শিষ্য হবে বহু।

www.nagorikpathagar.org

নরাশংসের শীষ্য সাহাবী

শুক্ল যজুর্বেদে শুধুমাত্র মহা ঋষি নরাশংসের বন্দনা এবং প্রশংসা কীর্তন করা হয়েছে– তা নয়। তাঁর শীষ্য সাহাবীদেরও বন্দনা ও স্তুতিবাদ করা হয়েছে।

ভৃত্য বনাম সঙ্গী

হিন্দুধর্ম শাস্ত্রের আলোকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, দেবতাগণ হন পূজার যোগ্য এবং পূজ্য। তাদেরকে মনুষ্য বা অন্য সৃষ্টি পূজা করে। দেবতাদের কোন ভৃত্য থাকে না। ভৃত্য থাকে মানুষের। নরাশংসের অনুসারীরা নরাশংসের আপ্রাণ সেবা করে। সাহচর্যে থেকে সঙ্গী হয়।

শুক্ল যজুর্বেদ মতে গিরিশ ঋষির ভৃত্য সংখ্যা ছিল অসংখ্য। ইসলামী ইতিহাস মতে, রাসূলুল্লাহ্‌র সাহাবী সংখ্যা ছিল মৃত্যুকালে লক্ষাধিক। এরূপ সৌভাগ্য অন্য কোন নবী বা ঋষির হয়নি।

শুক্ল যজুর্বেদের নিম্ন বর্ণিত কয়েকটি মন্ত্রেও নরাশংসের উল্লেখ এবং স্তুতি পরিলক্ষিত হয়- (১) শুক্ল যজুর্বেদ, অধ্যায়-২০, মন্ত্র-৩৭; (২) অধ্যায়-২০, মন্ত্র-৫৭; (৩) অধ্যায়-২১, মন্ত্র-৩১; (৪) অধ্যায়-২১, মন্ত্র-৫৫; (৫) অধ্যায়-২৭, মন্ত্র-১৩; (৬) অধ্যায়-২৮, মন্ত্র-২; (৭) অধ্যায়-২৮, মন্ত্র-১৯; (৮) অধ্যায়-২৮, মন্ত্র-৪২।

১৫
শুক্ল যজুর্বেদের উদার যোদ্ধা নরাশংস

মানব ইতিহাসে রাসূলুল্লাহ্ মুহাম্মাদ (সা.) ছাড়া অন্য কোন নবীকে বা রাসূলকে অথবা ঋষিকে অস্ত্রধারী যোদ্ধা হিসেবে দেখা যায় না। হযরত মুসা (আ.) এর একমাত্র অস্ত্র ছিল হাতের লাঠি। হযরত দাউদ (আ.) এবং সুলায়মান (আ.) রাজা ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তাদেরকে দেখা যায় না। খৃস্টান লেখকগণ মুহাম্মাদ (সা.) সম্বন্ধে লিখেছেন যে, তিনি এক হাতে কুরআন এবং অন্য হাতে তরবারি নিয়ে ইসলাম প্রচার করছেন। (Prof Philip K. Hitti, History of the Arabs, Chapter-11). শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে ছিলেন যোদ্ধা হিসেবে নয়। তবে বীর যোদ্ধা অর্জুনের গুরু এবং উপদেষ্টা হিসেবে।

দেব সেনাপতি রুদ্র

শুক্ল যজুর্বেদের শ্লোকগুলোতে নরাশংস দেব (নবী) এবং তাঁর সঙ্গী মানবীয় রুদ্রদের (সাহাবীদের) প্রশংসামালা গীত হয়েছে। তাদের গুরুর নির্দেশে

www.nagorikpathagar.org

সাহাবীগণ রুদ্রদের ন্যায় ধনুকধারী শত্রুদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করবেন। তাঁরা শত্রুগণকে বিবিধ প্রকার আঘাত করবেন।

তারা ঐশী জগতের রাজ্য লিপসু সম্রাটের অধিনস্ত সৈন্য নন। তাঁরা ধর্মের উদ্দেশ্যে কলির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সৈন্য। তাই তাদেরকে দেব সেনা আখ্যা দেয়া হয়েছে।

নরাশংস মুহাম্মাদ (সা.) শত্রুদের প্রতি প্রয়োজনে কঠোর ছিলেন। যুদ্ধ শেষে এবং জয়ে তিনি ছিলেন উদার। তিনি শত্রুদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ করেন। যুদ্ধ শেষে তাঁর মাঝে কোন নিষ্ঠুরতা ছিল না। বৈদিক ঋষিদের মত তিনি শুধু ঋষিই ছিলেন না, যোদ্ধাও ছিলেন। নরাশংস চরিত্রের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ মুহাম্মাদ (সা.) এর সাদৃশ্য সুস্পষ্ট।

উদার যোদ্ধা নরাশংস

হিন্দু ধর্মগ্রন্থ শুক্ল যজুর্বেদে যোদ্ধা নরাশংসের অনুসারীদের স্তুতি কীর্তন কল্পে গীত হয়েছেঃ "সেনাপতিরূপে স্থিত রুদ্রদের নমস্কার। অশ্ব ও অশ্বপতিরূপে স্থিত রুদ্রদের নমস্কার। সাহসী ও বিবিধ প্রকার আঘাতকারী দেবসেনারূপ রুদ্রদের নমস্কার। সানুচর মাতৃগণ ও হনন সমর্থ রমণীগণকে নমস্কার"।

সেনা ও সেনাপতিরূপ রুদ্রদের নমস্কার। রথি ও অরথিদের নমস্কার। রথাবিষ্ঠাতা অশ্ব সংগ্রাহক সারথীদের নমস্কার। মহত ও ক্ষুদ্রদের নমস্কার। (শুক্ল যজুর্বেদ, মন্ত্র নং-২৪)।

এরূপ স্তুতি বাক্যের সংস্কৃত ভাষ্য নিম্নরূপঃ "নম আতন্বানেভ্যঃ প্রতিদধানেভ্যশ্চ বো নমো। নম আবচ্চদ্ভ্যো হসদ্ভ্যশ্ বো নম। নমো বিস্বজদ্ভ্যো বিদ্ধ্যদ্ভ্যশ্চ বো নমো। নমঃ সভাভ্যঃ সভাপতিভ্যশ্চ বো নমো। নমোহশ্বেভ্যো হশ্বপতিভ্যশ্চ বো নমো। নম আব্যাধিনীভ্যো বিবিধ্যন্তীভ্যশ্চ বো নমো। নব উগণাভ্য স্তংহতীভ্যশ্চ বো নমঃ। নম সেনাভ্যঃ সেনানিভ্যশ্চ বো নমো। নমো রথিভ্যো অরথেভ্যশ্চ বো নমো। নমঃ ক্ষত্তৃভ্যঃ সংগ্রহীতৃভ্যশ্চ বো নমো। নমো মহদ্ভ্যো অর্ভকেভ্যশ্চ বো নমঃ"।

বদর যুদ্ধ

মক্কায় ধর্ম প্রচারক রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর কাফিরদের অত্যাচার চরমে পৌঁছে। তারা সকল গোত্রের প্রতিনিধি নির্বাচন করে সম্মিলিতভাবে তাঁকে হত্যার প্রস্তুতি নেয়। জীবন রক্ষার জন্য তিনি ৩০০ মাইল দূরবর্তী মদীনায় আশ্রয় নেন নবুয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে।

www.nagorikpathagar.org

মক্কাবাসীগণ এক হাজার শসস্ত্র সৈন্য নিয়ে মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এ বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সা. ৩১৩ জন সাহাবী সঙ্গী নিয়ে বদর প্রান্তরে মক্কা বাহিনীর মোকাবিলা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বাহিনীতে কিশোরগণও যোগ দিয়েছিলেন। শুক্ল যজুর্বেদে "মহৎ ও ক্ষুদ্র" বলে কিশোর বালকদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে। শুক্ল যজুর্বেদে ২৪ নম্বর মন্ত্রে মুজাহিদ মাতৃগণ এবং ভগ্নীদের উল্লেখ করা হয়েছে।

উহুদ যুদ্ধ

বদর যুদ্ধে এক হাজার সৈন্য নিয়ে পরাজয়ের পর ক্ষিপ্ত কুরাইশ বাহিনী পরবর্তী বছর ৩য় হিজরীতে মুসলিমদেরকে গ্রাস করার জন্য মদীনার দিকে ধাবিত হয়। কুরাইশ পক্ষে তখন সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন হাজারের অধিক। মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিল নারীসহ ৭০০ জন। শুক্ল যজুর্বেতে ২৪ নম্বর শ্লোকে মাতৃগণ এবং যুদ্ধে সক্ষম রমনীদের প্রতি নমস্কার স্তুতি জানানো হয়েছে। উহুদ যুদ্ধ অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

খন্দক যুদ্ধ

৫ম হিজরী সনের শাওয়াল মাস। মক্কাবাসীগণ ১০ হাজার সৈন্যের বিরাট বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণ করেন। মুসলিমদের ঐ সময়ে মুজাহিদ সংখ্যা ছিল মাত্র এক হাজার। তাই তারা খোলা ময়দানে শত্রুর মোকাবিলা না করে মদীনার চারিদিকে পরিখা খনন করে শত্রুর মোকাবিলা করেন।

যুদ্ধে মুসলিমদের জন্য দৈব এবং ঐশ্বরিক সাহায্য হিসাবে ঝড় বৃষ্টি বর্ষিত হয়। এ বৃষ্টির ফলে কুরাইশদের বাহিনী পরিচালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। কিন্তু মুসলিম বাহিনী ক্ষুদ্র হওয়ায় তাদের পক্ষে দ্রুত চলা সহজ হয়। এ বিষয়টি শুক্ল যজুর্বেদ ৬৪ মন্ত্রে বলা হয়েছেঃ দ্যুলোকে এবং ভূলোকে যে রুদ্রগণ আছেন–বৃষ্টি যাদের বাণতুল্য আউধ (অস্ত্র)–ঐ রুদ্রদের প্রতি নমস্কার"।

ঐশ্বরিক সাহায্য হিসাবে ঝড় বায়ু প্রবাহিত হয়। এ বৃষ্টির ফলে কুরাইশদের উন্মুক্ত স্থানে স্থাপিত মক্কার কুরাইশ শত্রু বাহিনীর শিবিরসমূহ স্থানচ্যুত হয়ে উড়ে যায়। এ বিষয়টি সম্পর্কে বহু সহস্র বছর পূর্বে রচিত যজুর্বেদের ৬৫ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে– "পৃথিবীতে যে "রুদ্রগণ আছেন, অন্নই যাদের বায়ুতুল্য আউধ (অস্ত্র)। তাদের প্রতি নমস্কার। তাদের উদ্দেশ্যে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও উর্ধ্বদিকে অঞ্জলীবদ্ধ করে নমস্কার করি।" এরূপ

www.nagorikpathagar.org

নমস্কার স্তুতির মাধ্যমে প্রায় শতাধিক নমস্কার সূচক শ্লোক উচ্চারিত হয়ে শুক্ল যজুর্বেদের ১৬শ অধ্যায় সমাপ্ত হয়।

শুক্ল যজুর্বেদের রুদ্রগণ যে, মানব জাতীয় রুদ্র হবেন-এই ইঙ্গিত শুক্ল যজুর্বেদে আছে। শুক্ল যজুর্বেদে ৬৬ নং মন্ত্রে নরাশংস মুহাম্মাদ সা. এবং মুসলিম বাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ব্যক্ত হয়েছে–পৃথিবীতে যে রুদ্রগণ আছেন অন্নই যাদের বাণতুল্য আউধ (অস্ত্র)। তাদের প্রতি নমস্কার। দেবগণ অন্ন আহার করেন না। সঙ্গীগণ মানব জাতীয় দেবতুল্য যোদ্ধা।

নরাশংসের পশুলাভ

কৃষ্ণ যজুর্বেদে নরাশংসকে দেবতা কল্পনা করা হয়েছে। তাঁর পূজা বা ত্যাগের দ্বারা পশু লাভ হয়। প্রজাপতি নরাশংস একজন দেবতা। দেবতাদের অশ্ব দ্বারা নরাশংসকে স্বর্গলোকে প্রেরণ করা হয়।-(কৃষ্ণ যজুর্বেদ, ১ম কান্ড, সপ্তম অর্ধায়, মন্ত্র-৪)।

কৃষ্ণ যজুর্বেদে নরাশংসের যুদ্ধের "মালে গণিমত" হিসাবে শত্রু পক্ষ থেকে পশু লাভ সম্পর্কে বলা হয়েছে– "নরাশংস দেবতার দেবযোগের দ্বারা বহু পশু লাভ হবে"। এর সংস্কৃত বর্ণনা হল– "নরাশংস স্যাহম দেবষজ্যায়া পশুমান ভূয়াসমপ্নে"।-(কৃষ্ণ যজুর্বেদ, ১ম কাণ্ড, ৬ অধ্যায়, ৪ সুক্ত)।

যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে পশুলাভ সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে, নরাশংস দেবতার দেবযোগের দ্বারা তিনি পশুযুক্ত হবেন। প্রজাপতি নরাশংস অগ্নি সৃষ্টি করেছিলেন। ঐ সৃষ্টি দ্বারা তিনি পশু অর্জন করেছিলেন। এ বেদ বাক্যের সংস্কৃত ভাষারূপ হলঃ নরাশংসেন বৈ প্রজাপতিঃ পশুসৃজত তেনৈব পশুনৎ সৃজতে হগনেঃ।-(কুষ্ণ যজর্বেদ, ১ম কাণ্ড, ৭ অধ্যায়, ৪ ণং সুক্ত)।

যুদ্ধের মাধ্যমে অজস্র পশু লাভের ঘটনা ঘটেছিল মহানবী মুহাম্মাদ (সা.) এর মক্কা বিজয়ের পর হুনায়নের যুদ্ধে। এ জিহাদে জয়ের পর মুসলিমগণ ২৪,০০০ উষ্ট্র, ৪০,০০০ এর বেশী বকরী, ভেড়া, ইত্যাদি শত্রুপক্ষকে পরাজিত করে অর্জন করেছিলেন। প্রায় ১২,০০০ মুসলিম বাহিনীর হাতে শত্রু পক্ষের বন্দী ছিল ৬০০০। এরূপ সজ্জিত দু'বাহিনীর মধ্যে অনুষ্ঠিত হুনায়ন যুদ্ধে নিহত হয় একজন মাত্র নারী। বন্দী হয়েছিল বহু নারী।

হুনায়নবাসীগণ মক্কা জয়ের উদ্দেশ্যে তাদের কাবিলা থেকে বহির্ভূত হয়। মহানবী তাদের বিপুল প্রস্তুতির খবর পেয়ে মক্কা থেকে বহির্গত হয়ে হুনায়নের

www.nagorikpathagar.org

প্রান্তরে ৮ম হিজরী ১০ই শাওয়াল হাওয়াযিন গোত্রবাসীদের মোকাবিলা করেন। মুসলিমদের অতি উৎসাহ এবং অসতর্কতার পরিণতিতে প্রাথমিক বিপর্যয় সত্ত্বেও হুনায়নের যুদ্ধে মুসলিমদের ব্যাপক বিজয় ঘটে।

ঐশ্বরিক রাজা সবিতৃ

শুক্ল যজুর্বেদে এক ঐশ্বরিক রাজা সবিতৃ এর বর্ণনা রয়েছে। এই ঐশ্বরিক রাজা সবিতৃ এর যে বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে–তাঁর অধিকাংশই নরাশংস মুহাম্মাদ সা এর বর্ণনার সঙ্গে সাদৃশ্যমান।

নরাশংস শব্দের অর্থ প্রশংসিত নর/মানব। প্রশংসিত নর, দেবতা নন। শুক্ল যজুর্বেদে বলা হয়েছে! এস! আমরা ঐশ্বরিক রাজা সবিতৃ এর অপূর্ব রাজ্য শাসন দৃশ্যকে ধ্যান করি। এই দৃশ্য এবং ধ্যান আমাদের বুদ্ধিকে পরিচালিত করুক। (শুক্ল যজুর্বেদ, অধ্যায়-৩, সুক্ত-৩৫)।

ঐশ্বরিক রাজা সবিতৃ দেবের যে বিস্তৃত বর্ণনা শুল্ক যজুর্বেদে দেয়া হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে– "বিশ্বব্যাপক, মেধাবী, সত্যস্বরূপ, বিবিধ রত্নের ধারক সবিতৃ দেবের অর্চনা করি। সকলের প্রতি আস্পদ, মননযোগ্য, ক্রান্তদর্শী (সর্বদর্শী), প্রসিদ্ধ সবিতৃ দেবের অর্চনা করি। যার কিরণ নিখিল কর্ম প্রকাশের উর্ধ্ব গগনের সকল বস্তু প্রকাশ করে। হিরণ্য পানি ও স্বর্ণের মত মূল্যবান জ্ঞানধন প্রদানে যিনি মুক্ত হস্ত। শোভন ক্রতুষজ্ঞ সম্পন্ন ঐ সবিতৃ দেব জনগণের কল্পনার অতীতে বিরাজ করেন।

ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা নরাশংস

নরাশংসের অনুসারীগণ শত্রুকে পর্যুদস্ত করে ধর্ম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাম্মাদ (সা.) ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোন নবী, রাসূল, ঋষি, অবতার ধর্মযুদ্ধের মাধ্যমে ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেননি। নবী সুলায়মান (আ.) এর রাজ্য এবং রাজত্ব ছিল ব্যতিক্রম ধর্মী।

রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন বীর যোদ্ধা। তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে শত্রুদের উপর আঘাত হানেন এবং তাদেরকে পর্যুদস্ত করেন। তারা ইহ জগতের রাজ্য পিপাসু সম্রাটের অধিনস্ত সৈন্য ছিলেন না।

যজুর্বেদের রুদ্রদের এবং কল্কি পুরাণের কল্কি অবতার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, তিনি অশ্ব যোগপতি হবেন। যুদ্ধ দ্বারা ধর্মশত্রু ও কলির বিনাশ সাধন করে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবেন।

www.nagorikpathagar.org

রাজা ও প্রশাসক নরাশংস

সংসারে থেকেও সংসার ত্যাগী মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ছাড়া আর কে এরূপ প্রশংসিত নর আছেন ? তিনি সংসার বিরাগী ঋষি দরবেশ ছিলেন। তিনি ছিলেন রাজা, প্রশাসক এবং বিচারক। তিনি ছিলেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত মহান সেনাপতি।

১৬
অথর্ববেদে মামাহ ঋষি মুহাম্মাদ (সা.)

হিন্দু ধর্মের সর্বপ্রধান গ্রন্থরাজি চার বেদ এর একটি অথর্ববেদ। অথর্ববেদ "ব্রহ্মবেদ" নামেও পরিচিত। মুন্ডক উপনিষদে অথর্ব বেদকে বলা হয়েছে "ব্রহ্মা বিদ্যা" বা ঐশ্বরিক জ্ঞান সংক্রান্ত বিদ্যা। এটা সর্ব প্রকার মন্ত্রের অন্যতম সংকলন। ঋগবেদ গবেষণামূলক গ্রন্থ। সামবেদ একটি সাহিত্যিক রচনা। যজুর্বেদ রচিত হয়েছে উপাসনা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। ঋগবেদ, সামবেদ এবং যজুর্বেদের বৈশিষ্ট্য এবং বিষয় বস্তুর অনেক কিছু অথর্ববেদে পাওয়া যায়।

অন্যান্য বেদে উল্লেখিত সর্ব প্রকার মন্ত্রাদি ছাড়াও অথর্ববেদে আছে অতিরিক্ত বহু মন্ত্র। এর মাধ্যমে বিশ্বাসের মধ্যে জটিল মারাত্মক অসুস্থতার চিকিৎসা হয়। যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার মন্ত্র জানা যায়। স্বর্গ, নরকের আভাস পাওয়া যায়।

মামাহ শব্দটি বিশেষজ্ঞদের মতে সংস্কৃত নয়। এটা বিদেশী ভাষার শব্দ। মামাহ শব্দটি প্রকৃতপক্ষে আরবী মুহাম্মাদ শব্দের সংস্কৃতরূপ। (ধর্মাচার্য বেদ-প্রকাশ উপাধ্যায়, বেদ-পুরাণে আল্লাহু ও হযরত মুহাম্মাদ, মূল হিন্দি থেকে বাংলা অনুবাদকঃ ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ইসলামী সাহিত্য প্রকাশনালয়, ৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০। পৃষ্ঠা-৫২)।

মামাহ্ ঋষি

অথর্ববেদের ২০ কান্ডের ৩য় বৈদিক শ্লোকের নাম কুন্তাপ মন্ত্র। এই তৃতীয় কুন্তাপ মন্ত্রে মামাহ ঋষি নামক একজন অবতারের উল্লেখ আছে। হিন্দু ধর্ম বিশেষজ্ঞদের কারো কারো মতে, অথর্ববেদের মামাহ ঋষি এবং আল্-কুরআনের মুহাম্মাদ (সা.) একই ব্যক্তি। শুধু অথর্ববেদের তৃতীয় কুন্তাপ মন্ত্রে নয়, ঋগবেদের প্রথম মন্ডলের ১৯ শ্লোকে বার বার এবং পঞ্চম মন্ডল, ২৭ নং সুক্ত এবং ১ নং মন্ত্রে মামাহ ঋষির উল্লেখ আছে।

www.nagorikpathagar.org

মামাহ্ ঋষি পরিচিতি

বেদ শাস্ত্রে মামাহ ঋষির কি কি বর্ণনা আছে? মামাহ ঋষির বর্ণনা ঋগবেদে আছে এবং অথর্ববেদেও আছে। ঋগবেদ মতে, মামাহ ঋষির থাকবে ১০ সহস্র অনুচর সঙ্গী (ঋগবেদ, ৫ মন্ডল, ২৭ সুক্ত)। ঋষি মামাহ এর আবির্ভাব হবে এমন যুগে যখন বেদ ছাড়া অন্য শাস্ত্র গ্রন্থ ও মন্ত্র রচিত হবে এবং যজ্ঞে পঠিত হবে। (ঋগবেদ, ১ম মন্ডল, ১৯ সুক্ত, ২য় শ্লোক)।

অথর্ববেদ মতে মামাহ ঋষি হবেন– (১) উষ্ট্রারোহী, (২) মরুস্থলবাসী।- (অথর্ববেদে, ২০ মন্ডল (অধ্যায়), ৯ অনুবাক, ৩১ সুক্ত)। মামাহ ঋষি এবং নরাশংস (প্রশংসিত নর) একই সত্বা। নরাশংস ঋষি হবেন প্রশংসিত, প্রশংসার্হ (প্রশংসাযোগ্য), কৌরম (দেশত্যাগী) এবং উষ্ট্রে আরোহনকারী (অথর্ববেদ, কুন্তাপ মন্ত্র-১-২)।

সংস্কৃত নরাশংস শব্দের শাব্দিক অর্থ প্রশংসিত। আরবী মুহাম্মাদ শব্দের অর্থও প্রশংসিত।

উষ্ট্রারোহী

অথর্ববেদে নরাশংসকে অশ্বারোহী না বলে উষ্ট্রারোহী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। উষ্ট্রকে বলা হত মরুভূমির জাহাজ। যেহেতু মরুভূমির প্রধান বাহন উষ্ট্র, উষ্ট্রারোহী নরাশংসের আবির্ভাব মরুভূমিতে হওয়াই স্বাভাবিক। অথর্ববেদে নরাশংসের বাহন সম্পর্কীয় সংস্কৃত বাক্যটি হল–"উষ্ট্রা যস্য প্রবাহনো বধুমন্তো দ্বির্দশ"। এর অর্থ নরাশংস উষ্ট্রে আরোহন করে প্রবাহিত হবেন অর্থাৎ চলাফেরা করবেন এবং তাঁর বধু সংখ্যা হবে দ্বাদশ। (অথর্ববেদ, ২০, অধ্যায়, সুক্ত-১২৭, শ্লোক-২)।

অথর্ববেদ এর কুন্তাপ মন্ত্রের উল্লেখিত ঋষি উষ্ট্রে আরোহনকারী হওয়ার তাৎপর্য হল– তিনি মরুভূমি জাতীয় দেশের অধিবাসী হবেন। কারণ উট মরুভূমির জাহাজ। যদিও উট ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতিতে উট পরিতেজ্য।

হিন্দু ব্রাহ্মণের জন্য উটে আরোহন করা নিষিদ্ধ (মনু স্মৃতি ১১ঃ২০১)। হিন্দুদের জন্য উটের দুধ এবং মাংস খাওয়াও নিষিদ্ধ (মনু সংহিতা ৫ঃ৮; ১১ঃ ১৫৭)।

www.nagorikpathagar.org

মামাহ ঋষি এবং মুহাম্মাদ (সা.)

অথর্ববেদের কুন্তাপ সুক্তে মামাহ ঋষি এর সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "হে লোকসকল! মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর। নরাশংস (প্রশংসিত জন) লোকদের মধ্য থেকে উত্থীত হবেন। আমরা পলাতককে (কৌরম) ৬০,০৯০ জনের মধ্যে পেলাম"। এর সংস্কৃত হল– "ইদং জন্য উপশ্রুত নরাসংশ। ভবিষ্যতে ষষ্টি সহস্রা নবতিং চকৌরম অরুষমেষু দমে।

এ শ্লোকে মামাহ ঋষি সম্পর্কে দুটি বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। একটি হল– প্রশংসিত। জন আরেকটি হল– পলাতক বা স্থান পরিত্যাগকারী কৌরম। এ পলাতক শব্দ দ্বারা হিযরতকে বুঝানো হয়েছে। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) রাতের অন্ধকারে মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় হিযরত (ধর্ম প্রচারের স্বার্থে গোপনে প্রস্থান) করেছিলেন। এ শ্লোকে মক্কা বিজয়ের কিছু ঈঙ্গিত রয়েছে। মক্কা বিজয়ের সময় মক্কা নগরীর জনসংখ্যা ছিল ষাট হাজারের সামান্য উর্ধে।

অথর্ববেদে বলা হয়েছে, "আল্লার মহমদ রসূলং বরেষ্য। এর অর্থ হল– আল্লাহুর রসূল "মহমদ" তোমাদের জন্য বরণীয়। অথর্ববেদের এ শ্লোকে মহমদকে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহুর রাসূল বলা হয়েছে।

নরাশংস প্রশংসার্হ বা প্রশংসারযোগ্য ব্যক্তি। তিনি সদা প্রশংসিত হন। কৌরম (দেশত্যাগীকে) ঋষিকে ৬০,০৯০ (ষাট হাজার নব্বই) ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যাবে। (অথর্ববেদ ঃ কুন্তাপ মন্ত্র–১)।

ভবিষ্যপুরাণে মামাহ্ ঋষি

সকল বেদ প্রণেতা শ্রী বেদব্যাস রচিত ভবিষ্য পূরাণেও মামাহ ঋষির উল্লেখ আছে। ভবিষ্যপূরাণে ভবিষ্যত সম্পর্কে কতগুলো ভবিষ্যতবাণী আছে। তাই এ পূরাণ খন্ডের নাম হয়েছে ভবিষ্যপুরাণ। তবে পুরাণ বৈদিক যুগের পরবর্তী কালের চর্চা।

ভবিষ্য পুরাণে ভবিষ্যত বাণী করা হয়েছে যে, সারা বিশ্বে অধর্মের বাণী প্রচারিত হবে। ঐ প্রেক্ষাপটে একজন বিদেশী আচার্যের আবির্ভাব ঘটবে। তাঁর নাম হবে মহমদ। তাঁর আভির্ভাব হবে শিষ্য সমন্বয়ে মানবতার কল্যাণের জন্য। ভবিষ্যপুরাণের "মহমদ" এবং আরব নবী মুহাম্মাদ (সা.) একই ব্যক্তিত্বকে ঈঙ্গিত করা হয়েছে বেদব্যাসের ভাষ্যে।– (ভবিষ্যপূরাণ, খন্ড-৩, অধ্যায়-৩, শ্লোক-২৫)।

বেদব্যাসের নিজস্ব শব্দে বলা হয়েছে–"মহমদ" নামক শিষ্য সমন্বিত একজন ম্লেচ্ছ আচার্যের আবির্ভাব ঘটবে। ম্লেচ্ছ শব্দটি এখানে "বিদেশী" অর্থে ব্যবহার

www.nagorikpathagar.org

করা হয়েছে। মুণী বেদব্যাসজী এটাও উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর আবির্ভাব স্থান ভারতে নাও হতে পারে। যদিও ভারতীয় ধর্মগ্রন্থে তাঁর আবির্ভাবের ঈঙ্গিত করা হয়েছে।

স্ত্রী সঙ্গ

মুনি ঋষিগণ যৌনতামুক্ত না হলেও তারা স্ত্রী সঙ্গ পরিহার করেন। কিন্তু ইসলাম ধর্মের প্রচারক মুহাম্মাদ (সা.) সফরকালেও স্ত্রীদেরকে সঙ্গে নিতেন। অথর্ববেদে বর্ণিত হয়েছে – বিংশ উষ্ট্র নরাশংস কৌরম (দেশত্যাগী) ঋষির রথ টানে। স্ত্রীগণ সদা তার সাথে থাকে। তার রথ-চূড়া স্বর্গ স্পর্শ করে না। সদা থাকে অবনত হয়ে। (অথর্ববেদ ঃ কুন্তাপ মন্ত্র ২)।

দ্বাদশ পত্নী

অথর্ববেদ অনুসারে নরাশংসের পত্নী সংখ্যা হবে দ্বাদশ।-(অথর্ববেদ ২০ মন্ডল, ১২৭ সুক্ত ২ শ্লোক)। নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর পত্নী সংখ্যা ছিলেন ত্রয়োদশ। তারা হলেন– (১) খাদীজা বিনতে খোয়াইলিদ (রা.), (২) সাওদা বিনতে যামআহ (রা.), (৩) আয়েশা বিনতে আবু বাকর (রা.), (৪) হাফসা বিনতে উমার (রা.), (৫) জয়নব বিনতে খুজায়মা (রা.), (৬) হিন্দ উম্মে সালমা বিনতে আবূ উমাইয়াহ (রা.), (৭) জয়নব বিনতে জাহাশ (রা.), (৮) জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস (রা.), (৯) রামলা উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফয়ান (রা.), (১০) সুফিয়া বিনতে হুয়াইয়ি (রা.), (১১) বাররা মায়মুনা বিনতে হারীছ (রা.), (১২) রায়হানা বিনতে যায়েদ (রা.), এবং মিশর রাজ প্রেরীত দাসী মারিয়া বিনত শামউন কিবতিয়া (রা.)।

হযরত মারিয়া কিবতিয়া বিনতে শামউনকে বহু বর্ণনায় যথাযথ স্ত্রী হিসেবে গণ্য করা হয় না। কারণ, মিশর রাজ মারিয়া বিনত শামউন কিবতিয়া নামক তার এক দাসীকে উপহার হিসেবে মহানবী (সা.) এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। মারিয়া কিবতিয়া এর গর্ভেই রাসূলুল্লাহ (সা.) এর তৃতীয় এবং কনিষ্ঠ পুত্র ইব্রাহীমের জন্ম হয়। তাঁর প্রথম পুত্রের নাম কাসেম, দ্বিতীয় পুত্রের নাম আবদুল্লাহ (তাহের ও তাইয়েব)। তারা ছিলেন হযরত খাদিজা (রা.) এর গর্ভজাত পুত্রদ্বয়। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর অনুসারীদের অন্য কারোরই চারি জনের অধিক স্ত্রী নেই। আল্লাহু তা'য়ালার কুদরতে একমাত্র তাঁরই ছিল ত্রয়োদশ পত্নী।

www.nagorikpathagar.org

ইন্তেকালের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ৯ জন স্ত্রী জীবিত ছিলেন এবং আর ছিলেন মাত্র এক জীবিত কন্যা ফাতিমা (রা.)। কারবালার প্রান্তরে নবী পরিবারের একমাত্র পুরুষ জীবিত সন্তান ছিলেন শিশু যায়নুল আবেদীন (রা.)। তাঁকে কেন্দ্র করেই আমরা মুসলিম উম্মাকে শিয়া সুন্নী দু'ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছি।

অথর্বেদের কুন্তাপ মন্ত্রে বলা হয়েছে,"শিকারী যেমন দেখিয়া শিকার করেন। বলশালী বৃষবৎ করিয়া পলায়ন। গৃহেতে থাকে কেবল বৎসগণ। অপেক্ষা করিয়া থাকে গাভীদের কারণ"।

এ মন্ত্রটির প্রেক্ষাপট হল মক্কা বিজয়ের ঘটনা। বিজয়ীগণ যুদ্ধ বিজয় করে বৃষের মত যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করেন। শিকারীগণ যেমন শিকার করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। তাদের সন্তান বৎসগণ এবং গাভীরূপ স্ত্রীগণ বিজয়ীদের প্রত্যাবর্তনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন (অথর্ববেদ কুন্তাপ মন্ত্র-৫)।

মামাহ ঋষি পৃথিবীর নাভীস্থানীয় গিরি নগর মক্কা বিজয় সম্পর্কে অথর্ব বেদে যে মন্ত্রগুলো আছে, এগুলো বৎস কম্ব ঋষি কর্তৃক উচ্চারিত। বৎস কম্ব ছাড়া আরো একশত ঋষি ছিলেন। অথর্ববেদের মক্কা সংক্রান্ত মন্ত্রগুলোর উপাস্য দেবতা হলেন ঈন্দ্র। কম্ব ছিলেন– ঈন্দ্রের পুত্র।-(ধর্মাচার্য অধ্যাপক ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়, বেদ পূরাণে আল্লাহু ও হযরত মুহাম্মাদ, বাংলা অনুবাদ ঃ ড. অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, ইসলামী সাহিত্য প্রকাশনায়, পৃষ্ঠা-৭৯)।

১৭
অথর্ব বেদের কুন্তাপ মন্ত্রে মামাহ্ ঋষি

হিন্দুধর্ম শাস্ত্র সমূহে মামাহ ঋষি নামক একজন বৈদিক ঋষির প্রশংসা কীর্তন এবং বর্ণনা হয়েছে বিভিন্ন ভাবে। সকল বেদ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। কিন্তু মামাহ্ শব্দটি সংস্কৃত নয়। এটা বিদেশী ভাষার শব্দ। বিশেষজ্ঞদের মতে মামাহ্ শব্দটি আরবী ভাষার একটি শব্দের সংস্কৃত রূপ (ধর্মাচার্য ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়, বেদ পুরাণে আল্লাহু ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), মূল হিন্দী থেকে অনুবাদক ডঃ অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, ইসলামী সাহিত্য প্রকাশনালয়, বাংলাবাজার , ঢাকা-১১০০, পৃঃ- ৫২)।

www.nagorikpathagar.org

ঋগবেদের প্রথম মন্ডল (অধ্যায়) এর ১৯ টি শ্লোকে বা মন্ত্রে মামাহ্ ঋষি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ঋগবেদের ৫ম মন্ডল (অধ্যায়) ২৭ নং সুক্তের ১ নাম্বার শ্লোকে মামাহ্ ঋষি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যে "চক্র বিশিষ্ট যানের অধিকারী" (অর্থাৎ উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন), সত্যবাদী, সত্যপ্রিয়, চরম জ্ঞানী, শক্তিশালী, এবং মুক্ত হস্ত মামাহ্ আমাকে তার বাণী দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন। সর্ব শক্তিমানের পুত্রসম সর্বগুণের অধিকারী নিখিল বিশ্বের হিতকারী মামাহ্ দশ সহস্র অনুচরসহ বিখ্যাত হবেন। (ঋগবেদ, ৫ম মন্ডল, ২৭ নং সুক্ত, শ্লোক- ১; ধর্মাচার্য ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় পৃঃ- ১১০)।

অথর্ববেদের কিছু কিছু শ্লোককে বিশেষ গুরুত্বের কারণে বিশেষ বিশেষ নাম দেয়া হয়েছে। অথর্বেদের ২০ নং কান্ডের তৃতীয় শ্লোক বা মন্ত্রের নাম কুণ্ডাপ মন্ত্র। এটি একটি বড় মন্ত্র এবং গুরুত্বপূর্ণও বটে। অথর্বেদের এ তৃতীয় কুন্তাপ মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, মামাহ্ ঋষিকে ঈশ্বর কতৃর্ক ১০টি শির মাল্য, ১০০ টি স্বর্ণ মুদ্রা, ৩০০ টি অর্বন (অশ্ব) এবং দশ সহস্র গাভী প্রদান করা হয়েছে। (অথর্ব বেদ তৃতীয় কুন্তাপ মন্ত্র)। ঋগবেদে বলা হয়েছে মামাহ্ ঋষিকে ১০ সহস্র অনুচর বা সঙ্গী দেয়া হয়েছে। (ঋগবদে, ৫ম মন্ডল, ২৭ নং সুক্ত)।

কুন্তাপ মন্ত্রের প্রতীক এবং বাস্তবতা

অথর্ববেদের তৃতীয় কুন্তাপ মন্ত্রে ১০০ স্বর্ণমুদ্রা, ১০ শিরোমাল্য, ৩০০ অর্বন (অশ্ব), ১০ সহস্র গাভীর তাৎপর্য বা ব্যাখ্যা কি ? তৃতীয় কুন্তাপ মন্ত্রের ১০০ স্বর্ণমুদ্রা, ১০ স্বর্ণমাল্য, ৩০০ অর্বন (অশ্ব) এবং ১০ সহস্র গাভী অবশ্যই নয়। আমাদের বোধ্য পার্থিব মুদ্রা, শিরমাল্য, অর্বন, অর্শ্ব, গাভী, ইত্যাদি নয়। বরং, এগুলো ঐশ্বরিক। তৃতীয় কুন্তাপ মন্ত্রের মামাহ ঋষি তৃপ্ত থাকতে পারেন না স্বর্ণমুদ্রা, কণ্ঠহার, অশ্ব, গাভী, ইত্যাদি দ্বারা। এগুলোর মাধ্যমে মামাহ ঋষির অনুসারীদের স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্যই প্রতিফলিত হয়েছে।

আসহাবে সুফফা ! ১০০ স্বর্ণমুদ্রা ! ১০০ নিক্ষ !

আধ্যাত্মিকতা এবং ধার্মিকতার ক্ষেত্রে মামাহ ঋষির ১০০ জন অনুসারী এমন ছিলেন যারা ১০০ স্বর্ণমুদ্রার সঙ্গে তুলনীয়। ১০ জন ছিলেন কণ্ঠহার স্বরূপ। ৩০০ অশ্ব ছিল বদর প্রান্তরের ৩১৩ জন ধর্মযোদ্ধার রূপক।

হযরত মুহাম্মাদ সা. এর ১০০ জন সংসার ত্যাগী এবং পরমেশ্বরের প্রাত নিবেদিত প্রাণ শীষ্যবর্গ "আসহাফে সুফফা" নামে মুসলিম ইতিহাস উজ্বল করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

অথর্ববেদে বলা হয়েছে– পরমেশ্বর মামাহ ঋষিকে একশত নিষ্ক অর্থাৎ স্বর্ণ মুদ্রা দান করেছেন। তাঁকে তিনি ১০ স্বর্ণ শিরোমাল্য দান করেছেন। ৩০০ অর্বন অশ্ব দান করেছেন। ঐ অশ্বগণ তেজস্বী। ঈশ্বর মামাহ ঋষিকে দশ সহস্র গাভী দান করেছেন (অথর্ববেদ ঃ কুন্তাপ মন্ত্র ৩)।

নিষ্ক অর্থ স্বর্ণমুদ্রা। অথর্ব বেদের নরাশংসকে একশত স্বর্ণ মুদ্রা অথবা একশত নিষ্ক প্রদান করা হয়েছে বলা হয়েছে। এই এক শত নিষ্ক স্বর্ণ মুদ্রা নয়, বরং স্বর্ণ মুদ্রার চেয়ে লক্ষগুণ গুরুত্বপূর্ণ 'আসহাবে সুফফার' সাহাবী ব্যক্তিবৃন্দ। তাদের কাজ ছিল ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং মানবতার খিদমত। তারা তাদের জীবন মানবতার খিদমতের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। সুফফা শব্দের অর্থ ভবনের বর্ধিত অংশ বা বারান্দা। ইসলামের জন্যে সর্বত্যাগী শতাধিক সাহাবী বিভিন্ন সময়ে মাদীনার মাসজিদের সুফফাহ বা বারান্দায় পড়ে থাকতেন। তাই তাদেরকে বলা হত আসহাবুস সুফফা (বারান্দার অধিবাসী)।

দশটি মালা/আশারা মুবাশ্বারা/দশজন সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবী

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর সাহাবীদের মধ্যে হতে ১০ জন ছিলেন স্বর্ণ মাল্যের মতো আকর্ষণীয়। তারা মুসলিম ইতিহাসে "আশারা মুবাশ্বারা" অর্থাৎ জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবী হিসেবে খ্যাত। এই দশজনকে হযরত মুহাম্মাদ সা. জীবদ্দশায় জান্নাত বা স্বর্গের সুসংবাদ দিয়েছেন এক হাদীসে বা বাক্যে।

অথর্ববেদের তৃতীয় কুন্তাপ মন্ত্রে দশটি গলার মালার উল্লেখ করা হয়েছে। মালাগুলো নবী মুহাম্মাদ সা. কে দেয়া হবে উল্লেখ করা হয়েছে– তা প্রকৃতপক্ষে কি মালা অথবা অন্য কিছু ? বিজয়ী বীরদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে মালা অর্পন করা হয়। রাসূলুল্লাহ্‌র হাজার হাজার সাহাবীদের মধ্যে দশজন বিশিষ্ট সাহাবী এই পৃথিবীতে জীবিত থাকাকালে জান্নাতের সু-সংবাদ পেয়েছিলেন।

হাজার হাজার বছর পূর্বে অথর্ব বেদে নরাশংসের দশটি গলার মালা বীরত্বের প্রতীক হিসেবে উপহার পাওয়া ছিল আনন্দের বিষয়। এই দশজন জান্নাতের সূ-সংবাদপ্রাপ্ত মুবাশ্বারা আশারা সাহাবী ছিলেন– (১) খলিফা আবূ বাক্‌র্ ইবনে কাহাফ (রা.), (২) খলিফা উমার ইবনে খাত্তাব (রা.), (৩) খলিফা উসমান ইবনে আফফান (রা.), (৪) খলিফা আলী ইবনে আবু তালিব (রা.), (৫) তালহা ইবনে আবদুল্লাহ (রা.), (৬) যুবায়ের ইবনে আউয়াম (রা.), (৭) সা'দ ইবনে আবি

www.nagorikpathagar.org

ওয়াক্কাস (রা.), (৮) সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.), (৯) আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.), (১০) আবূ ওবায়দা ইবনে জাররা (রা.)।

৩০০ অর্বণপ্রাপ্ত নরাশংস ঃ ৩১৩ জন বদর সাহাবী

অথর্ব বেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মামাহ্ ঋষি নরাশংস তিনশত অর্বণ লাভ করবেন। সংস্কৃত অর্বণ শব্দের অর্থ হল– অশ্ব বা ঘোড়া। অশ্ব অতি দ্রুতগামী ও সম্মুখ যুদ্ধক্ষেত্রে অতীতকালে ছিল সবচেয়ে উপযোগী। বদরের যুদ্ধের তিনশত তের জন সাহাবীকে অথর্ব বেদে তিনশত অর্বণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বেদ সমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঋষি নরাশংস বা প্রশংসিত নর ঈশ্বর কর্তৃক ৩০০ অর্বণ বা দ্রুতগামী অশ্ব প্রাপ্ত হবেন। এখানে ৩০০ অর্বণ শব্দটি অলংকারিক অর্থে বুঝানো হয়েছে। অর্বণ হলো– ৩০০ সঙ্গী সাথী। তারা অশ্বের ন্যায় প্রভু ভক্ত বীর পুঙ্গব।

মক্কাত্যাগী মুসলিমদের মদীনা জীবনের প্রাক্কালে মক্কাবাসীগণ ৭০০ বীর যোদ্ধা নিয়ে মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। বদর নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ৩১৩ জন সঙ্গী-সাথী নিয়ে কুরাইশদের মোকাবিলা করেন এবং মক্কার কুরাইশদেরকে পরাজিত করেন। কুরাইশ বাহিনীর ৭০ জন নিহত হয় এবং ৭০ জন বন্দী হয়। (H.G. Wells, The Outline of History, p-605, Garden City, New York, 1949).

মামাহ ঋষির ৩০০ স্বর্ণমুদ্রাসম অনুসারী কারা ? মক্কায় কুরাইশ শত্রুদের নির্যাতন, নিষ্পেষণে অতিষ্ট হয়ে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নিশীথ রজনীর অন্ধকারে অতি সঙ্গোপনে সকল সতর্কতা অবলম্বন করে মক্কা ত্যাগ করে মদীনা নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর মক্কাবাসী শত্রুগণ মক্কা হতে ৩০০ মাইল দূরে মদীনায়ও তাদের নিরাপদ অবস্থানে সন্তুষ্ট ছিল না।

এ ৩০০ জন সাহাবী বা সঙ্গী "বদর সাহাবী" হিসাবে খ্যাত। তাদের বীরত্বের জন্য কুম্ভাপ মন্ত্রে তাদেরকে ৩০০ অশ্বের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাদের নর পুঙ্গম আখ্যা দেয়া হয়েছে। নরপুঙ্গম শব্দটির অর্থ নরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা পূর্ণমান ব্যক্তি। পুঙ্গম শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ হল– পুৎক্ষু গৌঃ। এর অর্থ মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা পূণ্যমান ব্যক্তি।

দশ হাজার গাভী

অথর্ববেদে নরাশংসকে ঈশ্বর কর্তৃক দশ হাজার গাভী প্রদানের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। গাভী দ্বারা এখানে গরু বুঝানো হয় নি। অনুসারী বুঝানো হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) যখন মদীনা থেকে মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্য বহির্ভূত হন, তখন তাঁর সাথে সাহাবী বা সহযোগী বা অনুসারীর সংখ্যা ছিল দশ হাজার। তারা বিনা যুদ্ধে এবং হত্যাকান্ড ব্যতীত মুসলিমদের চরম নির্যাতনকারী মক্কাবাসীদেরকে পরাস্ত করেন। অষ্টম হিজরীতে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর দশ হাজার অনুসারী সঙ্গীসহ মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। মামাহ ঋষির দশ সহস্র গাভীর প্রতীকে কুম্ভাপ মন্ত্রে কি বলা হয়েছে ?

মামাহ ঋষির দশ সহস্র সঙ্গী

অথর্ববেদ অনুসারে প্রশংসিত ঋষি মামাহ একশত স্বর্ণমুদ্রা, ১০টি হার, ৩০০ অশ্ব ও ১০ সহস্র গাভী ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত হবেন। অথর্ববেদে বলা হয়েছে "এষ ঋষয়ে মামহে (মামাহ) শতং নিসকান (একশত স্বর্ণমুদ্রা), দশস্রজং (দশটি হার)। তৃীনি শতান্যবর্তাং (তিন শত অশ্ব), সহস্রা দশ গোনাম (দশ সহস্র গাভী) দেয়া হবে। (অথর্ববেদ, ২০ কান্ড, ৯ অধ্যায়, ৩১ সুক্ত, ৩ শ্লোক)।

ঈশ্বরের নির্ধারিত ঋষিগণ গাভী প্রতিপালন সাধারণত করেন না। ৩০০ অশ্বও তাঁদের দরকার হয় না। ১০টি হার এবং ১০০ স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে তিনি কি করবেন? এগুলো বাস্তব গাভী, অশ্ব, কণ্ঠহার বা স্বর্ণমুদ্রা নয়। রূপকে অন্য বিষয় বুঝানো হয়েছে।

৬৩০ খ্রী. মক্কা এবং মদীনাবাসীদের মধ্যে সন্ধি চুক্তি কোরাইশগণ কর্তৃক ভঙ্গ করার কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা.), ১০ হাজার পবিত্র অনুসঙ্গী নিয়ে বিনা যুদ্ধে মক্কা বিজয় করেন। (Stanley Lane Poole : Speeches and Table Talks of H M Prophet Muhammad, Macmillan & Co. London, 1882).

নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর মক্কা বিজয়কালে তাঁর সহকারীদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। তাঁর মক্কা জয়ের সময় উল্লেখযোগ্য হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়নি। মক্কাবাসীদের উপর নির্যাতন ও নিপীড়ন হয়নি। আবূ জাহিলের পুত্র ইকরামার নেতৃত্বে কিছু লোক কর্তৃক বাধা দেওয়া এবং হত্যাকান্ড ঘটাতে চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তারা সফল হয়নি।

যেহেতু ইতিহাসের একটি মহা বিজয় ঘটা সত্ত্বেও নিতান্ত শান্তিপূর্ণ উপায়ে মক্কা বিজয় সংঘটিত হয়েছিল, তাই হয়তো অথর্ববেদে বিজয়ীদেরকে গাভী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে (কুরআন-৪২ ঃ ৩৬)।

www.nagorikpathagar.org

১০ সহস্রাধিক গাভী দ্বারা অথর্ববেদের কুন্তাপ মন্ত্রে মামাহ ঋষির ১০ হাজার অনুসারীর বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে– যারা ছিলেন সততা, মহত্ব, ইত্যাদি ক্ষেত্রে গাভীর ন্যায় কল্যাণের প্রতীকসম।

মক্কাবাসীগণ ৮ম হিজরী সনে সামান্য প্রতিরোধ করে নিঃশর্তে কৌরম (দেশত্যাগী) ঋষির কাছে আত্মসমর্পন করেন। বিরাট বাহিনী এবং বিনা যুদ্ধে জয়লাভ করার পরও মামাহ ঋষির অনুসারীগণ মক্কাবাসীদের সাথে কল্যাণের প্রতীকরূপে গাভীর ন্যায় ব্যবহার করেন। তাই মামাহ ঋষির ১০ হাজার অনুসারীকে কুন্তাপ মন্ত্রে গাভীর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

অথর্ববেদে উল্লেখ রয়েছে যে, ঈশ্বর নরাশংসকে দশ হাজার গাভী প্রদান করে সম্মানিত করেছেন। গাভী শব্দটি এখানে অলংকারিক শব্দরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। গাভী দেবী সুলভ উপকারী প্রাণী। কোন কোন ধর্মে গাভী পূজা করা হয়। গোযুত্র পানে পাপ নাশ হয়। তাই দেবসুলভ সদাচারী মানব এবং উপকারী ব্যক্তিদেরকে গাভীর সাথে তুলনা করা হয়েছে অথর্ববেদে।

www.nagorikpathagar.org

৫ম অধ্যায়

১৮

সামবেদে হযরত মুহাম্মাদ

সামবেদে উল্লেখ আছে যে, আহমদ (নবী মুহাম্মাদ এর বিকল্প নাম) থেকে ধর্মীয় আইন (শরীয়াহ্) জারী হয়। এ ধর্মীয় আইন জ্ঞানে পরিপূর্ণ। তিনি ঈশ্বর থেকে দিক নির্দেশনা পেয়ে থাকেন। যেমন– তিনি সূর্য থেকে আলো পেয়ে থাকেন (সামবেদ, ২ ঃ ৬ ঃ ৮)।

সামবেদ হিন্দু চর্তুবেদ গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় গ্রন্থ। সামবেদে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এতে বলা হয়েছে বৃষ ভক্ষণকারী জনৈক দেবতার আবির্ভাব হবে যার নামের প্রথম অক্ষর হবে 'ম' শেষ অক্ষর হবে 'দ'।-(মহাভারত বনপর্ব, সুবোধচন্দ্র দেব সম্পাদিত, পৃষ্ঠা-৪৩৬ ঃ দেব সাহিত্য কুঠি, ২১ ঝর্মাপুকুর লেন, কলকাতা)। হিন্দুধর্মীয় দেবতাগণ গোমাংস অথবা বৃষমাংস ভক্ষণ করেন না।

প্রশংসিত মানব নরাশংস মুহামাদ সম্পর্কে সামবেদে বলা হয়েছেঃ "মধুর জিহবা সম্পন্ন, মিষ্টভাষী, যজ্ঞকারী এবং প্রিয় নরাশংসকে এখানে এই যজ্ঞে আমরা আহবান করি। এই মন্ত্রের সংস্কৃত রূপটি হল– নরাশংস মিহ পিয় মস্মিন্ যজ্ঞ উপহবায়ে। মধু জিহবং হবিস্কৃহম।-(সামবেদ ঃ উত্তরার্চিক মন্ত্র-১৩৩৯)।

হিন্দু ধর্মশাস্ত্র চতুর্বেদের অন্যতম সামবেদে এমন এক ঋষির কথা বলা হয়েছে যিনি শিশুকালে মাতৃদুগ্ধ পান করেননি। সামবেদের ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ শিশু, তরুণ, বড়ই বিচিত্র। সে মায়ের স্তন্য পানের জন্য মায়ের কাছে যায় না। এর মাতার পায়োধর নেই। এ শিশু জন্ম মাত্রই মহান দেবদূত তাঁর প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন। এই মন্ত্রের সংস্কৃত ভাষ্য হচ্ছে– "চিত্র ইচ্ছি শোস্তরুণস্য বক্ষথোন যো মাত রাবম্বোত ধাতবে। অনুধা যদজীনদধা চিন্দা ববক্ষৎ সদ্যো মহি দুত্যাংত চরণ্।-(সামবেদ, আগ্নেয় কান্ড, মন্ত্র-৩৪)।

সামবেদে এমন ঋষির সম্পর্কে বলা হয়েছে যিনি তেজশালী অসুরদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগকারী হবেন। তিনি দেবতা নন বরং তিনি মানুষ হবেন। তিনি মাতৃদুগ্ধ পান করবেন না। অন্যের দুগ্ধ পান করে প্রতিপালিত হবেন (সামবেদ, আগ্নেয় কান্ড, মন্ত্র ৩৪)।

সামবেদের আগ্নেয় কান্ডের ৩৪ নং মন্ত্রে যা বলা হয়েছিল তা শিশু মুহাম্মাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শ্রী শিশির দাশ মহাশয় তাঁর "প্রিয়তম নবী" গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৬৮-৬৯) এই মন্ত্রের বিষয়টি ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে, এ ঋষি শিশু বর্ণনা

www.nagorikpathagar.org

মুহাম্মাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ তাঁকে তৎকালীন সম্ভ্রান্ত আরব শিশুদের ন্যায় লালন পালনের জন্য ধাত্রী মাতা হালিমার কাছে প্রদান করা হয়েছিল।

শিশু মুহাম্মাদ মাতৃ দুগ্ধের পরিবর্তে ধাত্রী দুগ্ধ পান করেন। তবে, মন্ত্রে যেভাবে বলা হয়েছে শিশুটি বিচিত্র। তাঁর মাতার পয়োধর বা স্তন নেই এবং শিশু মায়ের কাছে যায় না। এ বাক্যগুলো সঠিক নয়।

এ মরু শিশুকে দেবদূত দুগ্ধপান করান নি। দুগ্ধ পান করিয়েছেন তাঁর ধাত্রী মাতা হালিমা। এখানেও প্রশ্ন থেকে যায়। শিশু মুহাম্মাদের জন্মের শত শত এবং হাজার হাজার বছর পূর্বে প্রণীত সামবেদ মন্ত্রে মাতৃদুগ্ধ পান মুক্ত শিশুর বর্ণনা এলো কি করে ?

সামবেদের উপরোক্ত মন্ত্রের মাধ্যমে এমন এক ঋষির পরিচয় পাওয়া যায় যে শিশু স্বীয় মাতার জীবন কালেই ধাত্রী মাতার দুগ্ধে প্রতিপালিত হন। এ প্রথাটি বিশ্বের মধ্যে শুধু আরব দেশের প্রথা হিসেবে অবলম্বিত। অন্যান্য ক্ষেত্রে জন্মের পর মাতার মৃত্যু হলে অথবা মাতা অসুস্থ হলে শিশু অন্যের দুগ্ধে প্রতিপালিত হয়। অন্য কোন বিশ্ব বিখ্যাত সাধু, ঋষি, বা নবী, পয়গম্বরের বর্ণনা পাওয়া যায় না– যিনি মায়ের জীবদ্দশায় অন্যের দুগ্ধে প্রতিপালিত হয়েছেন।

নরাশংসের প্রতি স্মৃতিমূলক মন্ত্রে বলা হয়েছে– হে অতি বলশালী ঈন্দ্র ! তুমি দীপ্যমান, তুমি তোমার স্তুতি ও প্রশংসারত দেবকে অবিলম্বে প্রশংসিত কর। এ মন্ত্রের সংস্কৃতরূপ হল– ত্বমঙ্গ প্রশংসিষো দেবঃ শোবিষ্ঠ মর্ত্যম।-(ঐন্দ্রকান্ড, তৃতীয় অধ্যায়, মন্ত্র নং- ২৪৭)। এ মন্ত্রের মধ্যে স্তুতি বা স্তবকৃত একজন দেবতা অথবা ঋষি সম্পর্কে বলা হয়েছে। তিনি নরাশংস। তিনি ঈন্দ্র কর্তৃক প্রশংসিত।

Prof.P. Hitti তাঁর রচিত *History of the Arab's* গ্রন্থে লিখেছেন যে, কুরআনে মুসলিমদের নবী মুহাম্মাদ (সা.)-দের দুটি নাম উল্লেখ করা হয়েছে– একটি হল মুহাম্মাদ (প্রশংসিত) (সা.) আর একটি হল আহমদ (সা.) যার অর্থ প্রশংসাকারী বা স্তুতিকারী বা স্তুতিরত।

হেরা গুহায় দৈববাণী

একদিন দেবতা "ধর্ম" রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেছিলেন– প্রকৃত বেদ কি? রাজা যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন– বেদ বিভিন্ন প্রকার। শ্রুতি শাস্ত্রগুলো বিভিন্ন। মুণি ঋষিগণের মত বিভিন্ন। ধর্মের নিগুঢ় রহস্য গুহায় নিহিত। ঐ ধর্ম পথ অবলম্বনকারীগণ মহাজন বা শ্রেষ্ঠ মানুষ। এর সংস্কৃত ভাষ্য অর্থ হল- "বেদা বিভিন্না, শ্রুরুতুয়ে বিভিন্না, নামো মুনি যাশ্যং মতং বিভিন্না ধর্মশং তত্ত্বং নিহিতং

www.nagorikpathagar.org

গুহায়ং মহাজেন যেন গত পন্থা"– (মহাভারত বনপর্ব ঃ সুবোধচন্দ্র দেব সম্পাদিত)।

গুহায় ধর্মের রহস্য

ধর্মের নিগুঢ় রহস্য গুহায় নিহিত (ধর্মশং, তত্ত্বং, নিহিতং গুহায়ং) এর তাৎপর্য কি ? হযরত মুহাম্মাদ সা. নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে জাবালে নূর পর্বতের হেরা গুহায় ধ্যান মগ্ন থাকতেন। এ পর্বত গুহায় তিনি মহান স্রষ্টা রাব্বুল আলামীন থেকে ওয়াহী বা প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন। এ প্রত্যাদেশ পাওয়ার পর তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেন।

মুহাম্মাদ (সা.) এর জন্মের হাজার হাজার বছর পূর্বে হস্তিনাপুর রাজ্যের পান্ডব রাজা যুধিষ্ঠির "ধর্মের নিগুঢ় রহস্য গুহাতে অবস্থিত বলেছেন। গুহায় প্রত্যাদেশ লাভ করেছেন এমন ধর্মনেতা হযরত মুহাম্মাদ অপেক্ষা অধিক পরিচিত কেউ নাই।

রাজা যুধিষ্ঠিরের বর্ণনায় বুঝা যায়, কোন এক ধর্ম প্রচারক গুহায় ধর্মাদৃষ্ট হবেন এবং সেকালের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাই তাঁর ধর্ম অবলম্বন করবেন। হিন্দুধর্ম শাস্ত্র প্রণেতা মুনি, ঋষিগণ রাসূলুল্লাহ্ মুহাম্মদ সা. এর আবির্ভাব সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবহিত ছিলেন।

নাযাতপ্রাপ্তি বা পাপমোচন

উত্তরায়ণ বেদের একটি মন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এ মন্ত্রের সংস্কৃত বর্ণনা "লা ইলাহা হরতি পাপম। ইল্লা, ইলাহা পরম পাদম। জন্ম বৈকুন্ঠ অপই নুতি। জপি নাম মুহামদং। উপরোক্ত শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে যে, লা-ইলাহা মন্ত্রের মাধ্যমে পাপ হরণ হয়। ইল্লা, ইলাহ মন্ত্র পরম পদে সমর্পনের মাধ্যমে পাপ মুক্তি হয়। বৈকুন্ঠ অর্থাৎ স্বর্গে জন্ম লাভের আশা করলে (অপই নুতি) মহাম্মদ নাম জপ করতে হবে।"

উত্তরায়ণ বেদের মধ্যে "লা-ইলাহা মন্ত্রে পাপ হরণ হবে। পরম পদে ইল্লা, ইলাহা মন্ত্র নিবেদন করতে হবে। এর পরিণামে বৈকুন্ঠ বা স্বর্গে জন্ম লাভ হবে। এ কথাগুলো বেদ গ্রন্থে মুসলিমগণ সংযোগ করে দেয়নি।

উত্তরায়ণবেদে উল্লেখ কৃত "লা-ইলাহা" "ইল্লা ইলাহা" এগুলো তো আল-কুরআনেরই শব্দ। লা-ইলাহা, ইল্লাল্লাহু, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ বাক্যের মৌলিক শব্দগুলো লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে রচিত বেদ গ্রন্থ সমূহে স্থান পেল কিভাবে ?

সর্বশেষ অবতারের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মীয় শিক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করে। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর পূর্বে বহু নবীর আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু কেউ নিজেকে সর্বশেষ নবী বলে বর্ণনা করেন নি। সকল মুসলিমের এটা বিশ্বাস যে,

www.nagorikpathagar.org

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন সর্বশেষ নবী এবং তাঁর পরে আর কোন নবীর আবির্ভাব ঘটবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা আল্-কুরআনে যা ঘোষণা করেছেন– তাতেও বুঝা যায় যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল। আল্-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন– আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন বা ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ করলাম। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম (আল্-কুরআন, সূরা মায়িদাহ্ ৫ঃ৩)। এ আয়াতটি নাযিল হয় দশম হিজরির ৯ই জ্বিলহাজ্ব, আরাফাত প্রান্তরে বিদায় হজ্ব দিবসে।

হিন্দুধর্ম এবং ইসলাম ধর্মের মূল উৎস আল্লাহ্ তা'য়ালা। তিনি ছাড়া ইলাহ্, আল্লাহ্ বা ইল্লাল্লাহ্– নাই কোন ঈশ্বর– শব্দ রাজি প্রচলিত। ৬১০ খৃষ্টাব্দের পরে রাসূলের কাছে অবতীর্ণ আল-কুরআনের বাক্যের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে রচিত বেদের বাক্যের সাদৃশ্য থেকে ইসলামের ও হিন্দু ধর্মের উৎস সম্পর্কে কোন প্রশ্নের উদয় কি বেদ এবং কুরআন পাঠকদের হৃদয়ে উদয় হওয়া যথাযথ নয় ?

বেদ এবং আল-কুরআনের সাদৃশ্য সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা হয়নি। আমার মত লেখকগণ এখান থেকে ওখান থেকে কিছু কিছু টেনে টুনে এনে সাদৃশ্য দেখিয়ে তৃপ্ত হয়েছেন। এ সাদৃশ্য আবিষ্কারের দায়িত্ব কার ? হিন্দুদের কি গরজ রয়েছে যে, তারা বলবেন তাদের ধর্মে যা এসেছে তাই তো বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ্ মুহাম্মদ প্রচারিত ইসলাম ধর্মে।

মানব জাতির প্রবণতা হল সর্বশেষ মডেল অবলম্বন করা। পরম স্রষ্টা কর্তৃক নাযিলকৃত সর্বশেষ ধর্ম হল ইসলাম। এটা মুসলিমদেরই কর্তব্য যে, তারা আবিষ্কার করবে প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থগুলোর সাথে ইসলাম ধর্ম গ্রন্থের কি কি সাদৃশ্য আছে?

প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থের অনুসারীগণ বিশেষ করে ইহুদী/ খ্রীস্টানগণ শতাব্দী পরিবর্তনের সাথে সাথে তাঁদের ধর্মগ্রন্থগুলো শতাব্দীর উপযোগী করে নিয়েছে। সর্বশেষ ধর্ম হিসেবে আল্-কুরআনই হওয়া উচিত সকলের গ্রহণযোগ্য। তাই মুসলিমদের কর্তব্য হল প্রাচীনকাল থেকে প্রচারিত ধর্মগুলোর সাথে সর্বশেষ নাযিলকৃত ধর্মগ্রন্থের কি কি সাদৃশ্য আছে তা আবিষ্কার, বিশ্লেষণ করা এবং অমুসলিমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

বেদগ্রন্থসমূহ বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দুগণ হল আল্লাহ্ তা'য়ালার নাযিলকৃত কিতাব এবং শরীয়তপ্রাপ্ত সর্ব প্রথম একেশ্বরবাদী জাতি এবং মুসলিমগণ হল সর্বশেষ নাযিলকৃত ও শরীয়তপ্রাপ্ত তাওহিদী জাতি। মনবতার সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ শরীয়তপ্রাপ্ত জাতির সমাবেশ ঘটেছে ভারতীয়

www.nagorikpathagar.org

উপমহাদেশে। (মাওলানা শামস নাভেদ উসমানী ঃ আগার আব বী না জাগে তু, রোশনী পাবলিশিং হাউজ, বাজার নাসরুল্লাহ খান, রামপুর, ইন্ডিয়া, ২৪৪৯০১)।

অহেতুক স্বার্থ এবং ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণে পারস্পরিক ধর্ম বিরোধী সাম্প্রদায়িতকতা সৃষ্টি হয় এবং ধর্মান্ধানুসারীগণ অন্য ধর্ম বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত হন। সকল ধর্মান্ধানুসারী একই স্রষ্টা এবং পরমেশ্বরের সৃষ্টি। তাই সকল ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য এবং মিল থাকা স্বাভাবিক।

১৯

বেদ গ্রন্থে আহমাদ

মহানবী মুহাম্মাদ (সা.) এর একটি বিকল্প নাম আহমাদ। মুহাম্মাদ শব্দের বাংলা অর্থ প্রশংসিত। আরবী আহমাদ শব্দের বাংলা অর্থ প্রশংসাকারী। মহান আল্লাহ্ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রশংসা করেছেন। তাঁকে রাহমাতুল লিল আলামীন অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার "রহমাত' অর্থাৎ করুণা, দয়া বলেছেন।

বিশ্বনবী সর্বদাই আল্লাহ্ তায়ালার হামদ বা প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই মানব জাতিকে আল কুরআনের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন আল-হামদুলিল্লাহি রব্বুল আলামীন অর্থাৎ সকল প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ তায়ালার জন্যে। শুধু রাসূলুল্লাহ (সা.) ই ছিলেন আল্লাহ্ তায়ালার হামদকারী বা প্রশংসাকারী তা নয়। সমগ্র মুসলিম উম্মাহ প্রতিদিন শত শত বার পাঠ করে বলে থাকে আল-কুরআনের ঐ মহান পবিত্র বাক্য- আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্যে। রাসূলুল্লাহ্ যে আহমাদ অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসাকারী ছিলেন তা অবশ্যই সত্য এবং সার্থক।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থ সমূহেও মহানবীকে আহমাদ বা প্রশংসাকারী নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে হুবহু আহমাদ শব্দে নয় বরং আহমিদ্ধি শব্দে। আরবী আহমদ এবং সংস্কৃত আহমিদ্ধি সমার্থক শব্দ। উভয় শব্দের অর্থ প্রশংসাকারী।

নাম বিকৃত প্রায় সকল মানুষের দ্বিতীয় স্বভাব বলা যেতে পারে। বাংলা ভাষা কি আমরা বাঙ্গালী মুসলিমগণ শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করি! বাংলায় আহমাদ শব্দটি আমরা উচ্চারণ করি, আহমাদ ছাড়াও আহমেদ, আহাম্মদ, আহমদ ইত্যাদি। আমরা প্রতিদিন সালাত কায়েম এবং কুরআন তিলাওয়াত করা সত্বেও যদি রাসূলুল্লাহর (সা.) নাম বিকৃত করি তবে কুরআন নাযিলের হাজার হাজার বছর পূর্বে বেদ পাঠক বা লেখকগণ আহমাদ, শব্দটিকে আহমিদ্ধি উচ্চারণ করলে বা বানানে লিখলে কি আমরা তাদের দোষ দিতে পারি ?

www.nagorikpathagar.org

শুধু মুহাম্মাদ এবং আহমাদ শব্দ নয় আল্লাহ্ তায়ালার মূল কিতাব কুরআনুল কারীমের মূল শব্দ কুরআন শব্দটিও আমরা বাঙ্গালী মুসলমানগণ বিকৃত করে ফেলেছি। এ ব্যাপারে আমরা সচেতন তো নই– বিকৃত যে করে ফেলেছি তা অনুধাবন পর্যন্ত করিনা। কুরআন শব্দটি আমরা লিখি এবং উচ্চারণ করি কুরান, কোরান বানানে। উভয় বানানই ভুল। সঠিক বানান হচ্ছে কুরআন। আবূ বাকর শব্দদ্বয় আমরা ভুল উচ্চারণ করি আবু বকর, বাকর, বক্কর, ইত্যাদি ভুল বানান। উমার, উসমান, এবং আলী (রা.) উচ্চারণ করি এবং লিখি ওমর, ওসমান, আলি ইত্যাদি ভুল বানানে। 'আলী শব্দটি ভুল উচ্চারণ করি, আলি ভুল বানানে।

বেদ গ্রন্থে আহমদ বা আহমাদ নামের উল্লেখ

বেদ গ্রন্থাবলীতে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর মূল নাম মুহাম্মাদ শব্দটি ছাড়াও 'আহমাদ' নামটি চার বারের বেশী উল্লেখিত হয়েছে। সামবেদে বলা হয়েছে– 'আহমদ' পিতা হতে (তথা প্রভু হতে) মেধামৃত লাভ করেছেন। আমি তাঁর নিকট হতে (সূর্যের নিকট হতে) জ্যোতি লাভ করেছি। 'আহমদ' মেধামৃত লাভ করেছেন অর্থ হল– জ্ঞানগর্ভ ঐশী গ্রন্থ লাভ করেছেন।-(সামবেদ, ১৫২ মন্ডল, উত্তরার্চিক মন্ত্র-১৫০০ ঃ সামবেদ ঐক্যকান্ড, মন্ত্র নং-১৫২)।

বেদে আহমদ শব্দটি একটি বিকল্প শব্দ। মূল 'অহমিদ্ধি' শব্দটি চারবার উল্লেখিত হয়েছে যেমন– "অহমিদ্ধি পৃতসপরী মেধামৃতস্য জগ্রভ। অহং সূর্য্য ইবাজনি।"

ঋগবেদের অষ্টম মন্ডল, ৬ সুক্তঃ ১০ মন্ত্রে অহমিদ্ধি বা আহমদ শব্দ উল্লেখিত আছে। অথর্ববেদে ২০ কান্ড, ৯ অনুবাক, ১৯ সুক্তে ১ম মন্ত্রে এবং ১১৫ সুক্ত, ১ মন্ত্রে অহমিদ্ধি বা আহমদ শব্দটি সম্পর্কে বর্ণনা আছে।

নরাশংস

ঋগবেদে নরাশংস সম্পর্কে কন্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি বলেন, "বিক্রমশালী, সুবিখ্যাত ও আকাশের ন্যায় প্রাপ্ত তেজা নরাশংসকে আমি দেখেছি"।-(ঋগবেদ ১ম মন্ডল, ১৮নং সুক্ত, নম মন্ত্র)।

শুক্ল যজুর্বেদে বলা হয়েছে, "নরাশংস ন্বেদ বিরাট ছন্দে ঈন্দ্রের রূপ ঈন্দ্রীয় ও আয়ুধারণ করেছিল"।-(শুক্ল যজুর্বেদ, অধ্যায়-২৮, মন্ত্র-৪২)। সামবেদে বলা হয়েছে ঈন্দ্র দ্বারা প্রশংসিত ঋষি হলেন নরাশংস।-(সামবেদ, ঈন্দ্র কান্ড, মন্ত্র-২৪৭)।

অহমিদ্ধি

হমিদ্ধি শব্দটির অর্থ আমিই। এ শব্দটির গঠন হল– অহং+ইত+হি। অহমিদ্ধি শব্দটি একটি নামবাচক শব্দ। এটা কারো নাম। এ শব্দটি সংস্কৃত ভাষাজাত শব্দ

www.nagorikpathagar.org

নয়। এটা সেমিটিক ভাষাজাত হতে পারে। অহমিদ্ধি পৃতষপরী মেধামৃত সৎ জগ্রব, এর অর্থ হল– "অহমদ পিতা থেকে তথা প্রভু থেকে মেধামৃত লাভ করেছেন"। অহং সূর্য্য ইবাজনি, এর অর্থ হল– "আমি সূর্য্যের নিকট থেকে (তার নিকট থেকে) জ্যোতি লাভ করেছি"।-(সামবেদ, উত্তরার্চিক, মন্ত্র- ১৪৯৭, ১৫০০)।

কৃষ্ণ যজুর্বেদে নরাশংসকে দেবতা কল্পনা করা হয়েছে। তাঁর পূজা বা ত্যাগের দ্বারা পশু লাভ হয়। দেবতাদের অশ্ব দ্বারা যজমান নরাশংসকে স্বর্গলোকে পাঠানো হয়। প্রজাপতি নরাশংস একজন দেবতা। দেবতাদের অশ্ব দ্বারা নারশংসকে স্বর্গলোকে প্রেরণ করা হয়।-(কৃষ্ণ যজুর্বেদ, ১ম কান্ড, সপ্তম প্রাপাঠক, মন্ত্র-৪)।

মক্কাবাসীদের প্রতি মহাজিরদের আশ্বাস

থর্ববেদের ৭ম কান্ড (অংশ), ৬ অনুবাকে (অধ্যায়) হিযরতকারী মহাজিরগণ মক্কাবাসীদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন তাঁর কিছু বর্ণনা আছে। বর্ণনাগুলো নিম্নরূপ ঃ

হে (মক্কার) গৃহবাসীগণ! তোমরা পার্থিব বিষয়ে ধনবান হও। আমাদের মিত্র হও। ধন-সম্পদ দ্বারা হৃষ্ট হও। তোমাদের মধ্যে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যেন কেউ না থাকে।

হে মক্কার অধিবাসীগণ ! আমরা দেশ ত্যাগ করে ফিরে এসেছি। আমাদেরকে ভয় কোরো না।-(সুক্ত-১ থেকে ৩)।

হে মক্কার গৃহবাসীগণ ! তোমরা প্রিয় ও সত্য ভাষী হও। তোমাদের ভাগ্য শোভন হোক। তোমাদের অন্ন কষ্ট দূর হোক। তোমরা হাসি, আনন্দে থাক। তোমাদের গৃহে কেউ যেন ক্ষুধার্ত না থাকে।-(সুক্ত-৪)।

হে মক্কাবাসীগণ ! আমরা বিদেশ থেকে ফিরে এসেছি। আমাদের ভয়ে ভীত হইও না।-(৬ষ্ঠ অধ্যায়, সুক্ত-৫)।

হে মক্কার গুহাবাসীগণ এই নগরীতে ও অঞ্চলে সুখে অবস্থান কর। পুত্র-কন্যা প্রতিপালন কর। ধন, ঐশ্বর্য্য লাভে আমাদের সঙ্গী হও। বিদেশ থেকে অর্জিত ধনের দ্বারা তোমরা স্বচ্ছল হও।-(৬ষ্ঠ অধ্যায়, সুক্ত-৬)।

হে অগ্নি ! দৈহিক সংযম অবলম্বন কর। এটাকে সাধনা হিসাবে গ্রহণ কর।-(সুক্ত-৭)।

তপস্যা ও বেদ শাস্ত্র পাঠ ও শ্রবণ করে আমরা মেধাযুক্ত হবো এবং দীর্ঘজীবি হব।-(সুক্ত-৮)।

হে (মক্কার) অধিবাসীগণ। ঈশ্বর সত্যের পালক, সমৃদ্ধিদায়ক, গৃহ পরিজনের কল্যাণকামী। এই অগ্নি (আদর্শ) অনুসারীদের কল্যাণ সাধন করে।-(সুক্ত-৯)।

www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীর নাভি স্থানীয় উত্তর নগরীতে স্থাপিত এই আলো দ্বীপ্যমান হবে। যারা শত্রু হিসাবে আক্রমণ করবে তারা পদতলে পৃষ্ঠ হবে।-(সুক্ত-৯)।

ধর্মাচার্য অধ্যাপক ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়, তাঁর রচিত বেদ পূরাণে আল্লাহু ও হযরত মুহাম্মাদ গ্রন্থে লিখেছেন–

প্রবাস-প্রত্যাগত ব্যক্তি যখন স্বগৃহে ফিরিয়া আসে, তখন গৃহ তথা গৃহবাসী, স্বজন, প্রতিবেশী সকলে আনন্দিত হয়, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু এইখানে অপ্রত্যাশিত ঘটনা দৃষ্ট হয়, "প্রবাস-প্রত্যাগত হতে গৃহবাসী তথা দেশবাসী ভীত সন্ত্রস্ত, যাহার কারণে তাঁহারা গৃহবাসীগণকে অভয় দিয়াছেন। আসলে প্রত্যাগত ব্যক্তিদের প্রবাস গমণের "পেছনে কোন অস্বাভাবিক ঘটনার মধ্যেই এ ভীতির কারণ নিহিত আছে। প্রবাস যাত্রার পেছনে কোন স্বাভাবিক ও সাধারণ কারণ থাকিলে এইরূপ ভীতির কোন হেতু থাকিত না"।

মক্কাবাসীগণ যুলুম নির্যাতন করে মক্কার মুসলিমদেরকে দেশ ত্যাগ করে হিজরত করতে বাধ্য করেছিল। মুসলিমগণ বিজয়ী হয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। মক্কাবাসীগণ মুসলিমগণ কর্তৃক আরোপিত প্রতিশোধের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ছিলেন। তাই মক্কা ত্যাগী মহাজিরগণ মক্কাবাসীদেরকে অভয় ও নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছেন।-(অথর্ববেদ, ৭ম কান্ড (অংশ), ৬ষ্ঠ অনুবাক (অধ্যায়), ৪ঃ৬ সুক্ত)।

মক্কাবাসীগণও তাদের মদীনায় হিযরতকারী মুসলিমদের কাছে আনুগত্য ঘোষণা করছে এবং সৎ ব্যবহারের আশ্বাস দিচ্ছে। হিযরতকারী মক্কাবাসীদের অগ্নি দেবতা হিসাবে সম্বোধন করে তাদের হীনতা এবং পরাজয় স্বীকার করতেছে।-(অথর্ব বেদ, ৭ম-কান্ড, ৬ষ্ঠ-অনুবাক (অধ্যায়), ৯ম-মন্ত্র)।

হিযরতকারী মুসলিমগণ মক্কাবাসীর দিকে তাদের পুত্র পরিজন নিয়ে নিজেদের এবং হিযরতকারীদের গৃহে সুখে অবস্থানের জন্য আশ্বাস দিতেছেন। আরো আশ্বাস দিতেছেন যে, অধিকতর ধন-সম্পদ নিয়ে তারা ফিরে আসবেন এবং ঐ সম্পদ দ্বারা মক্কাবাসীগণ উপকৃত হবেন।-(অথর্ববেদ, ৭ম-কান্ড, ৬ষ্ঠ-অনুবাক, ৭ম-সুক্ত)।

অথর্ববেদে মক্কাকে পৃথিবীর নাভীস্থানীয় নাভা পৃথিবাং বা পৃথিবীর নাভীস্থানে উল্লেখ করেছে।-(মন্ত্র নং-১০, ৬-অনুবাক)।

মহাজিরদের অবস্থান যে মক্কা থেকে উত্তরে তাও উল্লেখ করেছেন। এ তথ্য অথর্ববেদের সপ্তম কান্ডের, ৬ষ্ঠ অনুবাকে, ১০ম মন্ত্রে উল্লেখ থাকা বিস্ময়কর। (অথর্ববেদ মুসলিমদের মক্কা বিজয়ের পর লেখা হয়নি)।

অল্লোপনিষদ গ্রন্থে উল্লেখ আছে মক্কা বিজয়ী ঋষি অবস্থান করেন ব্রহ্মলোকের (মক্কার) উত্তরে (মদীনায়)।-(অনুবাদ শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দোপাধ্যায়, অল্লোপনিষদ, ৭ঃ ৬ঃ সুক্ত-১০, পৃষ্ঠা-১৯)।

www.nagorikpathagar.org

কল্কি অবতারের বাহন

কল্কি অবতারের বাহন হবে বায়ুর ন্যায় গতিশীল সাদা অশ্ব।-(কল্কি পূরাণ, শেষ অধ্যায়, ১ম-সুক্ত)।

ভাগবত পূরাণে বলা হয়েছে জগতপতি দেবদত্ত অশ্বে আরোহন করবেন (অশ্বমাশুগারুহ্য দেবদত্তং জগৎপতিঃ)।-(ভাগবত পূরাণ, ১২ স্কন্দ, ২ অধ্যায়, ১৯ শ্লোক)।

মুসলিম ভাষ্য মতে, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বোরাক নামক অশ্বে আরোহণ করে স্বর্গমন্ডল ভ্রমণ করেন। বোরাক শব্দের উৎস আরবী শব্দ বার্‌ক। বার্‌ক অর্থ বিদ্যুৎ। নরাশংসের স্তুতির ভাষা কল্কি পূরাণে বর্ণিত হয়েছে। তাঁকে দেবতা হিসাবে স্তুতি করা হয়েছে।-(শুক্ল যজুর্বেদ, ৩ অধ্যায়, ৫৩ মন্ত্র)।

ঋগবেদে বলা হয়েছে চক্র বিশিষ্ট যানের অধিকারী (অর্থাৎ উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন) সত্যবাদী, সত্যপ্রিয়, চরম জ্ঞানী, শক্তিশালী ও মুক্ত হস্ত মামাহ আমাকে তাঁর বাণী দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন। সর্ব শক্তিমানের পুত্রসকল সর্বগুণের অধিকারী নিখিল বিশ্বের হিতকারী দশ সহস্র অনুচরসহ বিখ্যাত হবেন। ঋগবেদের সংস্কৃত শ্লোকটি অনন্ত সৎপতি মামহে মে গাবা চেতিষ্ট অসুরো মঘোনঃ। ত্রৈবৃষ্ণো অগ্নে দশভিঃ সহস্রৈর্বৈশ্বানর এ্যরুণ শ্চিকেত।-(ঋগবেদ, ৫ম মন্ডল, ২৭ সুক্ত, ১ শ্লোক, ধর্মাচার্য অধ্যাপক ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-১১০)।

হযরত মূসা (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন মহা প্রভু সিনাই পর্বত থেকে আবির্ভূত হলেন এবং সে উপত্যাকায় তাদের কাছে আসলেন এবং পারান পর্বত থেকে আপন তেজ প্রকাশ করলেন। তিনি দশ সহস্র সাধু সন্ন্যাসী সঙ্গে নিয়ে এলেন। তাদের জন্য তাঁর দক্ষিণ হস্ত থেকে অগ্নিময় বিধি ব্যবস্থা প্রকাশ পেল।-(Deuteronomy, 33 ঃ 2, ২য় বিবরণ ৩৩ ঃ ২)।

বাইবেলের পারান শব্দটি হল আরব দেশের ল্যাটিন নাম। আদি পুস্তকের সোলায়মানের গীত সঙ্গীতে (Psalm) বলা হয়েছে-My Beloved is white and reddy, The chief among 10 thousand (আদি পুস্তক সুলাইমানের সঙ্গীত-৫)। এর অর্থ আমার প্রিয় হবে শুভ্র এবং লোহিত বর্ণীয় ব্যক্তি। তিনি দশ সহস্রের মধ্যে প্রধান নেতা। এ দশ সহস্র কথাটির পুরাতন বিবরণ বা ইয়াহুদ বাইবেলে উল্লেখিত হওয়ার তাৎপর্য কি ? নতুন বাইবেলে একই বিষয় উল্লেখিত হয়েছে- দেখ, সদাপ্রভু দশ সহস্র দরবেশদেরকে সঙ্গে নিয়ে আগমন করেছেন।-(Behold, The Lord cometh with ten thousand of his saints (New Testament) Jude-1ঃ 14, জিহুদা-১ ঃ ১৪)।

www.nagorikpathagar.org

৬ষ্ঠ অধ্যায়

২০

ভবিষ্য পুরাণে মুহাম্মাদ (সা.)

মহর্ষী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসজী দেব ছিলেন মহাভারত, গীতা এবং ১৮ খণ্ড বিশিষ্ট পুরাণ রচয়িতা। মহর্ষী বেদব্যাসজী দেব ভবিষ্যপুরাণ গ্রন্থে ভবিষ্যতে ঘটনীয় অনেক ঘটনার পূর্বাভাস দিয়েছেন। যেহেতু এ পুরাণ খণ্ডটিতে বহু ঘটনার পূর্বাভাস রয়েছে, তাই এ গ্রন্থটির নাম হয়েছে ভবিষ্য পূরাণ।

হিন্দুধর্ম মতে, বেদকে ঈশ্বরের বাণী মনে করা হয়। মহর্ষী বেদব্যাস দেব এই বাণীগুলো সংকলন এবং সংযোজন করেছেন মাত্র। কিন্তু এগুলোর রচয়িতা হলেন ঈশ্বর স্বয়ং। পূরাণ গ্রন্থসমূহে শ্লোকের যে নাম্বারগুলো দেয়া হয়েছে, তা সকল সংকলনে বা বিভিন্ন প্রেস থেকে মুদ্রিত সংকলনে এক নয়। পূরাণ গ্রন্থগুলোর একটি বিখ্যাত মুদ্রাকর হল মুম্বাই নগরীর ভেংকটেশ্বর প্রেস। ভবিষ্য পুরাণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে বহু ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

ভবিষ্যপুরাণে নবী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

ভবিষ্যপুরাণের ১০ থেকে ২৭ নং শ্লোকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে আছে– "ম্লেচ্ছরা আরবে পরিচিত এলাকা ধ্বংস করেছে। সে দেশে আর আর্য ধর্ম খুঁজে পাওয়া যায় না। পূর্ব একজন শয়তান সেখানে এসেছিল। আমি তাঁকে ধ্বংস করেছি। শয়তান এবার আরো শক্তিশালী হয়ে ফিরে এসেছে। তবে এ পিশাচদের সঠিক পথ দেখাবে "মহমদ"। তাঁকে আমি ব্রহ্মা বলে বিশেষিত করেছি। হে রাজা ভোজ! এই বোকা পিশাচদের জায়গায় তোমার যাওয়ার দরকার নেই। তুমি যেখানেই থাকো আমার দয়াতেই তুমি বিশুদ্ধ হয়ে উঠবে"।

রাত্রে পিশাচ দেবতার ছদ্মবেশে রাজা ভোজের কাছে উপস্থিত হয়ে এক স্বর্গীয় পুরুষ তাঁকে বলেছিলেন– "হে রাজা! তোমার আর্য ধর্ম সব ধর্মের উপরে। পরমাত্মা ঈশ্বরের নির্দেশ অনুযায়ী আমি আমিষ (মাংস) ভোজীদের একটি নতুন ধর্ম প্রচলন করব। আমার অনুসারীদের লিঙ্গাগ্র চ্ছেদীত হবে। তাদের মস্তকে টিকি থাকবে না। তারা দাড়ি রাখবে। বিপ্লব ঘটাবে। আযান দিবে। শুকরের মাংস ছাড়া বৈধ সব কিছুই খাবে। তারা যুদ্ধের (যিহাদ) মাধ্যমে নিজেদেরকে শুদ্ধ করবে। অধার্মিক দেশগুলোর সাথে যুদ্ধ করার জন্য তারা মুসলিম নামে পরিচিত হবে। আমি সেই আমিষ ভোজী নতুন ধর্মের প্রবক্তা হব।

www.nagorikpathagar.org

বেদব্যাস রচিত ভবিষ্যপুরাণে উপরে উল্লেখিত ১০-২৭ নম্বর শ্লোকে এমন অনেক কিছু বলা হয়েছে যেগুলো নবী মুহাম্মাদ প্রচারিত ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসজী মহানবী মুহাম্মাদের আবির্ভাব সংক্রান্ত যে সমস্ত তথ্যগুলো হাজার বছর পূর্বে পেশ করেছেন তা বিশ্লেষণ করলে হযরত মুহাম্মদের আবির্ভাব, তাঁর ধর্ম এবং ঐ ধর্মের পূর্ববর্তী অবস্থা, পরবর্তী অবস্থা এবং ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়।

এ বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে– (১) আরব ভূমি শয়তানদের দ্বারা দূষিত হয়েছে। (২) হযরত ইব্রাহীম নির্মিত কাবায় তাঁর বংশধরগণ মূর্তিপূজা প্রবর্তন করে আরব ভূমি এবং মক্কা দূষিত করেছে। সেই আরবে ইব্রাহীম প্রচারিত ধর্ম অথবা আর্যধর্ম বিদূরিত হয়েছে।

(৩) আব্রাহার মত ইয়ামেন দেশীয় একজন শয়তান মক্কা আক্রমণ করেছিল। ঈশ্বর তাকে ধ্বংস করেছেন। (৪) হযরত মুহাম্মাদ ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন এবং ইসলাম ধর্ম বিরোধীদেরকে সঠিক পথে এনেছিলেন। তিনি হলেন একজন ব্রহ্ম।

(৫) ভারতের রাজা আরব দেশে ধর্ম প্রচার করতে যায়নি। বরং ভারতীয়দের শুদ্ধিকরণ করা হয়েছে মুসলিমদের ভারতে আগমনের মাধ্যমে। (৬) দেবদূত মুহাম্মাদ আর্য ধর্মই পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছেন। (৭) তাঁর অনুসারীরা লিঙ্গতক ছেদীত করে। (৮) তারা মাথায় টিকি রাখে না। (৯) তারা দাড়ি রাখত। (১০) তারা বিপ্লব ঘটাবে।

(১১) তারা তাদের ধর্ম বিষয় গোপন রাখবে না বরং আযান দিয়ে প্রার্থনার অনুষ্ঠান ঘোষণা করবে। (১২) শুকরের মাংস ছাড়া তারা বৈধ সব কিছুই খাবে।

(১৩) তারা জিহাদের মাধ্যমে নিজেদেরকে বিশুদ্ধ করবে। (১৪) অধার্মিক এবং ভিন্ন ধর্মীয় দেশগুলোর লোকদের সঙ্গে তরবারী নিয়ে যুদ্ধ করবে। (১৫) মাংস খাওয়া তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস বলে পরিগণিত হবে।

ভবিষ্যপুরাণের ভবিষ্যদ্বাণীতে যা কিছু বলা হয়েছে তার অধিকাংশই ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইসলাম ধর্ম মতে, মানব জাতির পূর্ব পুরুষ ছিলেন হযরত আদম (আ.)। তিনি ছিলেন মানব জাতির সর্ব প্রথম ধর্মীয় শিক্ষক বা নবী। তাঁর ধর্মই ছিল সর্বশ্রেষ্ট ধর্ম।

অন্যান্য ধর্মগুলো হযরত আদম (আ.) এর ধর্মের বিকৃতরূপ। এ বিকৃতি ঘটে হযরত আদম (আ.) এর তিরোধানের পর মহাকালের প্রভাবে। ধর্মের বিকৃতির কারণেই শুধু দশজন নয়, অতীতে এক লক্ষ চব্বিশ হাজারের মত নবীর আবির্ভাব হয়েছিল। সব নবীরই সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান বাণী ছিল ঈশ্বরের একত্ব।

www.nagorikpathagar.org

ম্লেচ্ছ শব্দের অর্থ

ম্লেচ্ছ শব্দটি বর্তমানে হিন্দুদের সমাজে অত্যন্ত ঘৃণীত শব্দ। এ শব্দটি হিন্দু ধর্ম ত্যাগী মুসলিম এবং তাদের বংশধরদের ক্ষেত্রে হিন্দুগণ কর্তৃক তুচ্ছার্থে বা ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু, মহর্ষী বেদ ব্যাসদেব কি অর্থে এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন ?

মহর্ষী বেদব্যাসজি স্বয়ং ম্লেচ্ছ শব্দটির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা হচ্ছে– "যে ব্যক্তি সৎ কর্ম করে, যার প্রখর বুদ্ধি আছে, যে ধর্মপ্রাণ এবং ভগবানকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, ঐ ব্যক্তিই জ্ঞানী "ম্লেচ্ছ" (ভবিষ্য পুরাণ, পর্ব-২৫৬-৫৭)।

ম্লেচ্ছ ও আচার্য্য

ভবিষ্যপুরাণে মুসলিমদেরকে ম্লেচ্ছ এবং মহানবীকে আচার্য বলা হয়েছে। সংস্কৃত বাক্যটি "এতশিমন্যন্ন তীরে ম্লেচ্ছ আচার্য"। এ বাক্যে "ম্লেচ্ছ" শব্দ দ্বারা মুসলিমদেরকে বুঝানো হয়েছে। পান্ডিত্যাভিমানী হিন্দু মহাপন্ডিতগণ অন্যান্য দেশবাসী, বিশেষ করে আরব দেশবাসীকে বা আদিম অধিবাসীদেরকে ম্লেচ্ছ বলতেন। কিন্তু আরবের ধর্মগুরু মুহাম্মাদকে আচার্য বা ঋষি পুরুষ গণ্য করতেন। মহানবীর পিতৃবংশ কুরাইশদেরকে তাঁরা আচার্য বংশ মনে করতেন। ভারতে আচার্যগণ ব্রাহ্মণদের অন্তর্ভূক্ত।

মরুস্থলের মহাপুরুষ

মরুস্থলে বা মরুভূমিতে মহাম্মাদ (সা.) নামক যে একজন মহা পুরুষের আবির্ভাব হবে–একথাও যজুর্বেদে এবং ভবিষ্য পূরাণের। সংস্কৃত বাক্যটি হচ্ছেঃ স্ত রে ম্লেচ্ছ আচার্যে সবম্বিতঃ "মহামদ ইতিখ্যাত ঃ শীষ্যসাখা সমম্বিতঃ। নৃপশ্চৈম মহাদেবং মরুস্থল নিবাসিনম।" সংস্কৃত বাক্যের বাংলা অর্থ হলো- যথাসময়ে "মহামদ" নামে খ্যাত একজন মহা পুরুষ স্বীয় শিষ্য মন্ডলীসহ আবির্ভূত হবেন। যার নিবাস হবে মরুস্থলে। তিনি হবেন নৃপতির সাথে তুলনীয় মহাদেব। (আবুল হোসেন ভট্টাচার্য, আমি কেন খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিলাম না, পৃঃ ১৮৬)।

ভবিষ্যপুরাণে আরো আছে- "নমস্তে গিরিজানাথ মরুস্থলে নিবাসিনে"। এর অর্থ মরুস্থলে বসবাসকারী হে গিরি পর্বতের অধিপতি ! আপনাকে নমষ্কার বা প্রণতি জানাই।

আর্যধর্মের বাস্তব চিত্র

মহর্ষী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসজী আর্যধর্মের যে, বাস্তব চিত্র বর্ণনা করেছেন এর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ কাশীর মত ৭টি পবিত্র শহরের একমাত্র বিষয় ছিল দুর্নীতি ও হত্যা। ভারত তখন রাক্ষস, শবর, ভীল এবং অন্যান্য নির্বোধ অধ্যুষিত।

www.nagorikpathagar.org

ম্লেচ্ছদের দেশে ম্লেচ্ছ ধর্মের (ইসলাম) অনুসারীগণ জ্ঞানী ও সিংহ হৃদয় ব্যক্তি। সব উত্তম গুণ ম্লেচ্ছদের (মুসলিমদের) মধ্যে দেখা যায়। ম্লেচ্ছ (ইসলাম) ধর্ম ভারত ও তার দ্বীপ মালায় প্রভূত্ব করবে। হে মুণী ! এই সকল তথ্য জানার পর ঈশ্বরের গুণকীর্তন কর।-(ভবিষ্যপুরাণ, পর্ব-৩ ঃ ১,৪,২১-২৩; ধর্মাচার্য অধ্যাপক ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় প্রণীত, বেদ-পুরাণে আল্লাহু ও হযরত মুহাম্মাদ, মূল হিন্দী সারস্বত বেদান্ত প্রকাশসংঘ, প্রয়াগ ভারত; ইসলামী সাহিত্য প্রকাশনালয়, ৪৫ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, জুলাই ২০০৭ ইং, পৃষ্ঠা-৯-১০)।

তুফান এবং প্লাবন শেষ হওয়ার পর হযরত নূহ (সা.) স্বীয় পরিবার নিয়ে আল্লাহুর নির্ধারিত স্থানে বসবাস করতে থাকেন। হযরত নূহ (আ.) এর ৩ (তিন) সন্তান প্রসিদ্ধ হন। তারা হলেন– (১) শাম, (২) হাম, (৩) ইয়াকুত।

সংস্কৃততে রচিত হিন্দু শাস্ত্রে নূহ (আ.) এর নাম লেখা হয়েছে "মহা নুভু" এবং "ইয়া নূহ"। শামের নাম লেখা হয়েছে সীম। হাম ও ইয়াকুতের নামে পরিবর্তন নেই। আরও বলা হয়েছে ইয়ানূহ সন্তানগণ হবেন ম্লেচ্ছ (মুসলিম) বংশের নেতা। এর ৩ (তিন) সন্তানের নাম হবে, ইব্রাহীম, নাহুর এবং হারুন। ইব্রাহীমের পরিবর্তে সংস্কৃতে "ইবরানী" শব্দ ব্যবহার হয়।

তাওরাতে দেখা যায়, হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর নাম প্রথমে ছিল আবরাম। ইংরেজীতে হয়েছে আবরাহাম। আল-কুরআনে আল্লাহু তায়ালা তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন ইব্রাহীম। তিনি হবেন মানব প্রজন্মের নেতা। এ তথ্যগুলো তাওরাতে যেমন ছিল, তেমনি আছে ভূষিয়া পুরানের সার্প পর্বে! (ভূষিয়া পুরাণ, ১ম খন্ড, ৪র্থ অধ্যায়)।

হযরত ঈসা (আ.)

হিন্দুধর্ম গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–শিকাদেশ নামক মুনি হিমতুঙ্গ পর্বত (হিমালয়) অতিক্রম করে হোড় দেশে আগমন করেন। হোড় দেশের পার্বত্যাঞ্চলে তিনি সাদা পোশাকধারী শেতাঙ্গ একজন সম্মানিত ব্যক্তির দর্শন লাভ করেন। শেতাঙ্গ ব্যক্তি বললেন, আমি ঈসা। কুমারী মাতার গর্ভে আমার জন্ম। আমি ম্লেচ্ছ ধর্মের সত্য শিক্ষা দান করি।

ঋষি শিকাদেশ ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ধর্ম সম্পর্কে আপনার কী ধারণা? ঈসা মাসি (মাসিহ) বললেন, সত্য ধ্বংস প্রায়। ম্লেচ্ছ দেশ হক্কানিয়্যাত (মহাসত্য) এর দূরবর্তী। তাই আমি এখানে এসেছি।

হে রাজা শিকাদেশ! আমার থেকে ম্লেচ্ছদের ধর্মের কথা শোনো। স্নান কর অথবা না কর অন্তরকে মোমের মত নরম করো। আল্লাহু তায়ালার উপাসনা কর।

www.nagorikpathagar.org

ইনসাফ ও সততার সাথে অন্তরকে একমুখী কর। মানুষ যেন আসমানী খোদার ধ্যানে ইবাদৎ করে। তিনি অনন্ত প্রভু। ঈশ্বরের পবিত্র ও পরোপকারী প্রকৃত মূর্তি প্রতিদিন অন্তরে অর্জিত হয়।

ঈসা মাসি (মাসিহ) আমার নাম। ঈসা মাসিহের কথা শুনে রাজ শিকাদেশ ঈসা মাসিহের ভক্ত হয়ে যান (ভবিষ্য পুরাণ)। উপরোক্ত তথ্য ভবিষ্যপুরাণ এর শ্লোক ভিত্তিক। (পন্ডিত বেদপ্রকাশ উপাধ্যায় রচিত গ্রন্থের প্রথম পর্ব, ৩য় খন্ড এবং ২য় অধ্যায়ের ৩১-৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

২১
ভবিষ্যপুরাণে বিশ্বনবী

ভবিষ্যপুরাণে একাধারে ১৮ (আঠারো) টি শ্লোকে রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এ শ্লোকগুলো আছে ভবিষ্য পুরাণে ৩য় পর্ব, ৩য় খন্ড, ৩য় অধ্যায়ের ১০ নং শ্লোক থেকে ২৭ নং শ্লোক পর্যন্ত।

একটি শ্লোকে বলা হয়েছেঃ "সর্ব শক্তিমান ঈশ্বর বলেছেন পুর্ব শত্রুকে হত্যা করা হয়েছে। এবার আরো শক্তিশালী শত্রু আসছে। আমি একজন শক্তিশালী শত্রুকে পাঠাব। যাঁর নাম হবে "মহামদ"। তাঁর মাধ্যমে মানব জাতি সঠিক পথ পাবে।

অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন এক মহান ব্যক্তি এসে বলবেন, ঈশ্বর একজন অবতার পাঠিয়েছেন। তাঁর লক্ষ্য হবে আর্যধর্ম ও সত্যধর্ম রক্ষা করা। তিনি বলবেন, আমি সত্যধর্ম প্রতিষ্ঠা করে যাবো। আমার অনুসারীদের লিঙ্গচ্ছেদ করা হবে। তাঁদের মাথার পেছনে কোন টিকি থাকবে না।

তাঁর অনুসারীদের মুখে দাঁড়ি থাকবে। তাঁরা একটি বিপ্লব সৃষ্টি করবেন। তারা বৈধ মাংস ভক্ষন করবেন। তাঁরা নিরামিষভোজী হবে না। তাঁরা আমিষ ভোজি হবে, তাদের বলা হবে মুসলিম। (ভবিষ্য পুরাণের ৩য় পর্ব, ২য় খন্ড, ৩য় অধ্যায় ২১ থেকে ২৩ শ্লোকে ঋষি মুহাম্মদের বর্ণনা আছে)।

কল্কি অবতার

বেদে বর্ণিত হয়েছে– সর্ব শক্তিমান ঈশ্বর অনেক জ্ঞানী লোক, অনেক ঋষি পাঠিয়েছেন। কল্কি হলেন ঈশ্বরের একজন অবতার। (কল্কি অবতারের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে ভগবত পুরাণে ১২ নং খন্ডে, ২য় অধ্যায়ে, ১৮-২০ অনুচ্ছেদে)। কল্কি অবতারের জন্ম হবে বিষ্ণুযশের পরিবারে (কল্কি পুরাণ, ২য় অধ্যায়, ৪ নং অনুচ্ছেদ)।

www.nagorikpathagar.org

কল্কি অবতারের জন্ম স্থান

কল্কি অবতার জন্ম গ্রহণ করবেন সামভালা নগরীতে। (ভগবত পুরাণ ১২ নং খন্ড, ২য় অধ্যায় ১৮-২০, অনুচ্ছেদ)। সাম্ভলা শব্দের অর্থ শান্তিপুর্ণ অঞ্চল। রাসুল(সাঃ) জন্ম গ্রহণ করেন মক্কা নগরীতে। মক্কাকে বলা হয় দারুল আমান বা শান্তিপূর্ণ অঞ্চল।

কল্কি অবতারের জন্ম তারিখ

কল্কি পুরাণে বলা হয়েছে, কল্কি অবতার জন্ম গ্রহণ করবেন বছরের ৩য় মাসের দ্বাদশ দিনে। (কল্কি পুরাণ, ২য় অধ্যায়, ১৫ নং অনুচ্ছেদ)। রাসূল (সঃ) জন্ম গ্রহণ করেন রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ। রবিউল আউয়াল মাস আরবী সনের ৩য় মাস।

জন্ম ঃ পিতা-মাতা

কল্কি অবতারের জন্ম হবে বিষ্ণুয়াশ/বিষ্ণুযশ এর পরিবারে এবং সাম্ভালা নগরীতে। কল্কি অবতারের পিতা বিষ্ণুযশ এবং তাঁর মাতা সুমতি।

কল্কি অবতারের জন্ম হবে পিতা বিষ্ণুযশের গৃহে এবং সুমতির গর্ভে, (কল্কি পুরাণ ২য় অধ্যায়, ১৫ নং অনুচ্ছেদ)। সুমতি শব্দের অর্থ শান্তিপূর্ণ। রাসূল (আঃ) মাতা আমেনা শব্দের অর্থ নিরাপদ, শান্তিময়। বিষ্ণু যশ-অর্থ বিষ্ণুর দাস। বিষ্ণু শব্দের আরবী হতে পারে আবদুল্লাহ। আবদুল্লাহ অর্থ আল্লাহ্‌র দাস।

মাতৃদুগ্ধ পানহীন ঋষি

অন্তিম ঋর্ষি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি মায়ের দুধ পান করবেন না। (সামবেদ, অগ্নি মন্ত্র নং-৬৯, পরিচ্ছেদ ৯, অনুচ্ছেদ ৫৩)। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) লালিত পালিত হন মরুভূমির মরু উদ্যানে বাসকারী হালিমা নামক একজন ধাত্রী মাতার কাছে। তিনি মায়ের দুগ্ধ পান করার সুযোগ পাননি।

সতর্ককারী নবী

আল কুরআনে বলা হয়েছে এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্কবাণী যায়নি। (আল কুরআন, সূরা ফাতির, আয়াত নং-২৪)। আল কুরআনে আল্লাহ্‌ বলেছেন, প্রত্যক যুগে আমি দুত পাঠিয়েছি, (সূরা রাদ, আয়াত-৭)। আল কুরআনে ছাব্বিশ জন নবী রাসুলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসের গ্রন্থ সমুহে বলা হয়েছে যে, এক লক্ষ চার হাজার নবী প্রেরিত হয়েছে।

আল কুরআনে উল্লেখিত নবীদের নাম হচ্ছেন (১) আদম, (২) সালিহ, (৩) ইদ্রিস, (৪) নুহ, (৫) হুদ, (৬) লুত, (৭) ইব্রাহিম, (৮) ইসমাইল, (৯) ইসহাক, (১০) ইয়াকুব, (১১) ইউসুফ, (১২) শুয়াইব, (১৩) দাউদ, (১৪) সুলাইমান, (১৫) ইলইয়াস, (১৬) আলইয়াসা, (১৭) মূসা, (১৮) আজিজ উজাইর, (১৯)

www.nagorikpathagar.org

আইউব, (২০) জুলকিফল, (২১) শীস (২২) ইউনুস, (২৩) জাকারিয়া, (২৪) ইয়াহইয়া, (২৫) ঈসা, (২৬) মুহম্মাদ (সাঃ) ।

হাদী ও নাজীর

আল কুরআনে বলা হয়েছে প্রত্যেক (কাওম) উম্মতের জন্য একজন পথপ্রদর্শক হাদী (নবী) ছিলেন। (১৩ তম সূরা রাদ, আয়াত-৭)। সূরা ফাতির এ বলা হয়েছে, এমন কোন উম্মাত ছিল না যাদের জন্য একজন নাজীর সতর্ককারী (নবী) প্রেরিত হয়নি। (৩৫ নং সূরা ফাতির, আয়াত-২৪)।

রাসূল ও নবী

সূরা নাহলে বলা হয়েছে, প্রত্যেক উম্মতর জন্য একজন রাসূল আমি প্রেরণ করেছি (১৬ তম সূরা নাহল, আয়াত নং-৩৬)। সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে, প্রতিটি উম্মতের জন্য রাসূল প্রেরিত হয়েছিল। (১০ তম সূরা ইউনুস, আয়াত ৪৭)।

সূরা নিসায় বলা হয়েছে, কতিপয় রাসূলের কাহিনী আমি ইতোপূর্বে আপনার কাছে বর্ণনা করেছি এবং কতিপয় নবীর কাহিনী আপনার কাছে বর্ণনা করিনি (৪ নং সূরা নিসা, আয়াত ১৬৪)। সূরা মুমিনেও বলা হয়েছে, আপনার পূর্বে আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি। অনেকের কাহিনী আপনার কাছে বর্ণনা করেছি, অনেকের কাহিনী বর্ণনা করিনি (২৪ নং সূরা মুমিন, আয়াত-৭৮)।

মুহাম্মদ (সঃ) তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন বরং তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং শেষনবী (আল কুরআন, সূরা হাজার, আয়াত-৪০)।

মানব জাতির জন্য হিদায়েত

আল কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদ দানকারী এবং সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না (২৪ নং সূরা সাবা, আয়াত নং-২৯)।

সূরা আম্বিয়ায় বলা হয়েছে নিশ্চয় আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি (২১ তম সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং-১০৭)।

সাহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা.) বলেছেন, সমগ্র নবীকে তাঁর স্বগোত্রীয় লোকদের হিদায়তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু আমি মুহাম্মাদ সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছি। (সাহিহ বুখারী ১ম খন্ড, কিতাবুস সালাত, ৫৬ তম অধ্যায়, ৪২৯ নং হাদীস)।

হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তায়ালা ১ (এক) লক্ষ ২৪ (চব্বিশ) হাজার নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। (মীসকাতুল মাসাবিহ ৩য় খন্ড, হাদীস নং-৫৭৩৭ঃ মাসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৬৬)।

www.nagorikpathagar.org

চার জন সহচর

কল্কি অবতারকে সহযোগিতা করবেন ৪ (চার) জন সহযোগী সহচর। (কল্কি পুরাণ, ২য় অধ্যায়, ৪ নং অনুচ্ছেদ)। কল্কি অবতারের থাকবে ৪ (চার) জন সহচর বা সাহাবী। রাসূল (সঃ) এর উত্তরসুরি ৪ (চার) জন ইসলামী রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন বিশ্ব বিখ্যাত। তারা হলেন আবূ বাকর (রা.), উমার (রা.) উসমান (রা.), এবং আলী (রা.)। তাঁরা মুসলিম ইতিহাসে চার জন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি এবং মহানবীর খলিফা, রাষ্ট্র প্রধান।

কল্কি অবতারের অষ্টগুণ

কল্কি অবতারের ৮ (আট) টি অসাধারণ গুণ হচ্ছে (১) জ্ঞান, প্রজ্ঞা, (২) আত্মসংযম, (৩) জ্ঞান বিতরণ করণ, (৪) সম্ভ্রান্ত বংশ, (৫) সাহস, (৬) শক্তি, (৭) পরোপকার, (৮) মহানুভবতা। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও এই ৮ (আট) টি গুণে অসাধারণ ভাবে গুণান্বিত ছিলেন।

দেবদূতের সাহায্য

কল্কি অবতার দেবদূতের সাহায্য পেয়েছিলেন। মুসলিম ইতিহাসে বদরের যুদ্ধে ফিরিস্তাগণ রাসুল (সাঃ) কে সাহায্য করেছিলেন। আল কুরআনে বলা হয়েছে, বদরের যুদ্ধে তোমরা হীনবল ছিলে। আল্লাহু তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। আল্লাহুকে ভয় কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (আল কুরআন, ৩য় সূরা আল-ইমরান, আয়াত-১২৩, ১২৫)।

ভগবত পুরাণে বলা হয়েছে, কলিযুগের রাজন্যগণ ডাকাতের মত আচরণ করবেন। (ভাগবত পুরাণ খন্ড-১, অধ্যায়-৩, অনুচ্ছেদ-২৫)।

সাদা ঘোড়া

হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রে বলা হয়েছে, অন্তিম ঋষির থাকবে ১ টি সাদা ঘোড়া। অন্তিম ঋষির ডান হাতে থাকবে ১ (এক) টি তরবারী। মহানবী মুহম্মদ (সাঃ) বোরাক নামক এক পঙ্খীরাজ অশ্বে আরোহণ করে মিরাজে গমন করেছিলেন। বুরাকটির রং ছিল সাদা।

মহানবী (সঃ) বহু যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি ডান হাতে তরবারী ধারন করতেন। কল্কি অবতার যুদ্ধ ক্ষেত্রে দেবদুত (ফেরেস্তা) দের সাহায্য পাবেন, (কল্কি পুরাণ, ২য় অধ্যায়, ৫নং অনুচ্ছেদ)।

সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী

আল কুরআনে রাসূল (সাঃ) কে বলা হয়েছে, আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদ দাতা এবং সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি। (৩৪ নং সূরা সাবা, আয়াত নং ২৮)।

www.nagorikpathagar.org

নরাশংস

অন্তিম ঋষি নরাশংসের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্ন বেদ গ্রন্থে। অথর্ববেদ গ্রন্থ-৮, পরিচ্ছেদ-১৬; অনুচ্ছেদ-৫; অথর্ববেদ গ্রন্থ-২০, পরিচ্ছেদ-১২৬, অনুচ্ছেদ-১৪; ঋগবেদ গ্রন্থ-৮,পরিচ্ছেদ-৬,অনুচ্ছেদ-১০; ঋগবেদ গ্রন্থ-১, অনুচ্ছেদ-৯; ঋগবেদ গ্রন্থ-১, পরিচ্ছেদ-৪, অনুচ্ছেদ-১০৬;

ঋগবেদ গ্রন্থ-১, পরিচ্ছেদ-৩; অনুচ্ছেদ-১৪২, ঋগবেদ গ্রন্থ-২, পরিচ্ছেদ-২; অনুচ্ছেদ-৩, ঋগবেদ গ্রন্থ-৫, পরিচ্ছেদ-২; অনুচ্ছেদ-৫,ঋগবেদ গ্রন্থ-৭, পরিচ্ছেদ-২; অনুচ্ছেদ-২; যজুর্বেদ গ্রন্থ-২০, অধ্যায়-৫৭; গ্রন্থ যজুর্বেদ গ্রন্থ-২০, অধ্যায়-৩১; যজুর্বেদ-৩, অধ্যায়-২১, অনুচ্ছেদ-৫; যজুর্বেদ অধ্যায়-২৮, অনুচ্ছেদ-২; যজুর্বেদ অধ্যায়-২৮, অনুচ্ছেদ-১৯; যজুর্বেদ অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-২৮)।

২২

পুরাণে রাসূল (সা.)-এর বর্ণনা

হিন্দু ধর্ম, সনাতন ধর্ম, বৈদিক ধর্ম, ইত্যাদি মানব জাতির প্রাচীন ও চিরন্তন ধর্মের এক একটি নাম। সকল মানুষ যদি এক আদি মানব পিতা-মাতার সন্তান হয়, তাদের মূল বা আদি ধর্ম এক হওয়ার কথা। তাদের বংশধরদের মধ্যে মৌলিক বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও কোথাও না কোথাও ঐক্যের চেতনা ও প্রতীক সুস্পষ্টতর এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে।

বেদ রচনাকারী ছিলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বা বেদ ব্যাসজী। একজন ধর্মীয় সংস্কারকের শারীরিক কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ভবিষ্য পুরাণে ঈশ্বরের কণ্ঠে বর্ণনা করেছেন নিম্নভাবে– "লিঙ্গচ্ছেদী, শিখাহীন, শ্মশ্রুধারী দূষক"। (ভবিষ্য পুরাণ, ৪র্থ অধ্যায়, শ্লোক ২৫)। এর অর্থ ঈশ্বরের অনুসারী হবে খতনাকৃত অর্থাৎ লিঙ্গের ত্বকছেদনকৃত। তাঁর মাথায় শিখা বা টিকি থাকবে না এবং তিনি হবেন শ্মশ্রুধারী বা দাড়ি বিশিষ্ট এবং বিপ্লবী (দূষক) । (ভবিষ্য পূরাণ, ৪র্থ অধ্যায়, শ্লোক নং-২৫)।

বর্তমান হিন্দু ঋষিগণ পুরুষাঙ্গের ত্বক ছেদন করান না বা খতনা করান না। কিন্তু ঋষিগণ মাথায় টিকি রাখেন। তাদের কেউ কেউ শ্মশ্রু বা দাড়ি রাখেন। কিন্তু তারা দূষক বা অস্ত্রধারণকারী বিপ্লবী হন না। ভবিষ্য পুরানের উপরোক্ত বর্ণনা যে কোন হিন্দু ধর্মীয় নেতা অপেক্ষা মহানবী মুহাম্মাদ (সা.) এর ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বদর, উহুদ, খন্দক, ছাড়াও বহু সংখ্যক জিহাদে বা ধর্মযুদ্ধে ধর্ম বিরোধীদের মুকাবিলা করে ছিলেন (মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, পরধর্ম গ্রন্থে শেষ নবী (সা.) ১ম সংস্করণ পৃ-৮৩)।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্ম তারিখ

কল্কি অবতারের জন্ম তারিখ এবং রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ (সা.) এর জন্ম তারিখের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর জন্ম তারিখ ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার। কল্কি অবতারের জন্ম তারিখ বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষীয় দ্বাদশীতে।

কল্কি পুরাণে বলা হয়েছে, "বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষীয় দ্বাদশীতে কল্কি অবতার জন্ম গ্রহণ করবে। পুত্রের জন্মে তার পিতৃকুল হৃষ্টচিত্ত হবেন"। এর সংস্কৃত বর্ণনা "দ্বাদশ্যা শুক্ল পক্ষস্য মাধবে মাসি মাধব"। "জাতে দৃশতঃ পুত্র পিতরৌ হৃষ্ট মান সৌ।" (কল্কি পুরাণ, ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, শ্লোক ১৫)।

কল্কি অবতারের জন্মস্থান সম্ভাল

ভাগবত পুরাণ অনুসারে সর্বশেষ অবতার কল্কি জন্ম গ্রহণ করবেন এক পুরোহিতের গৃহে এবং সম্ভাল নামক স্থানে। ঐ পুরোহিতের নাম হবে বিষ্ণুযশ। ভাগবত পুরাণে উক্ত শ্লোকটি নিম্নরূপঃ-"সম্ভল গ্রাম মূখ্যস্য ব্রাহ্মলস্য মহাত্মন।। ভবনে বিষ্ণুযশ কল্কি প্রাদুর্ভ বিষ্যতি।" (ভাগবত পুরাণ, ১২ স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়, ১৮ শ্লোক)।

সম্ভাল শব্দের অর্থ শান্তির আধার বা ঘর। সম শব্দের অর্থ শান্তি। ভল প্রত্যয়ের অর্থ আধার বা ঘর। ভাগবত পুরাণের সর্বশেষ কল্কি এর জন্মস্থান সম্ভাল বা শান্তির ঘরে। আরবীতে "দারুল আমান" শব্দটি পরিচিত। এর অর্থ শান্তির নিবাস। দারুল আমান নামে খ্যাত আবদুল মুত্তালিব এর গৃহে রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ (সা.) জন্ম পরিগ্রহ করেন।

বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা.) এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিব ছিলেন পবিত্র কাবা গৃহের মুতাওয়াল্লি বা প্রধান তত্বাবধায়ক। খিদমতগার বা পুরোহিত। তিনি ছিলেন আরবদের মধ্যে, বিশেষ করে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে অনুষ্ঠিত ঝগড়া ফাসাদের বিচার এবং মিমাংসাকারী ও শান্তিস্থাপক। আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর এ মর্যাদাপূর্ণ পদটির উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র আবূ তালিব।

আবদুল মুত্তালিব পরিবার ছিল আবরের রাজ পরিবার এবং তাঁর গৃহ ছিল দারুল আমান বা শান্তির ঘর। আবিসিনিয়া, ইয়েমেন, ইরান, রোমান সিজারের রাজদরবারে এ আরব গোত্র প্রধানের প্রেরিত প্রতিনিধির বিশেষ মর্যাদা ছিল।

বিষ্ণু যশা ব্রাহ্মণ (আবদুল্লাহ)

মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, "সম্ভাল" গ্রামে বিষ্ণযশাঃ ব্রাহ্মণ গৃহে এক ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করবেন। এ ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশাঃ এর গৃহে জন্ম গ্রহণ করবেন মহাবীর মহানুভব কল্কি। কল্কির নামে ঘোষণা হলেই সমুদয় বাহন, কবচ, বিবিধ

www.nagorikpathagar.org

আয়ুধ এবং শত শত যোদ্ধারূপ অনুসারী উপস্থিত হবেন। তিনি হবেন ধর্ম বিজয়ী এবং সম্রাট।

কল্কি লোক সকলের প্রতি প্রসন্ন হবেন। যুগ পরিবর্তক এবং ক্ষয়কারী এ দীপ্ত মহাপুরুষ উত্থিত ও ব্রাহ্মণগণ পরিকৃত হয়ে সর্বত্র ম্লেচ্ছগণকে উৎসারিত করবেন (কালী প্রসন্ন সিংহ কর্তৃক অনুদিত মহাভারত, বন পর্ব, মার্কন্ড্রেয় সমস্যা, পর্যাধ্যায়, ১৮৯ অধ্যায়)।

'স্বচি' বা সুন্দর কান্তি

নরাশংস শব্দের অর্থ প্রশংসতি নর। নর+অশংস শব্দদ্বয় যোগে গঠিত হয়েছে নরাশংস শব্দ। অশংস শব্দের অর্থ প্রশংসিত। ঋগবেদে উল্লেখিত নরাশংস বা প্রশংসিত মানুষ অবশ্যই হবেন স্বচি অর্থাৎ সুন্দর কান্তি (দেহ) যুক্ত এবং দীপ্তিময় মহাপুরুষ। স বা সু প্রত্যয় বা অক্ষরের অর্থ সুন্দর। অচি প্রত্যয় শব্দের অর্থ দ্বীপ্তি। সংস্কৃত স এবং অচি সংযোগে পঠিত হয়েছে স্বচি শব্দ। "শোভনা অচিয়স্য স"। শ্লোকাংশের অর্থ বা মর্মার্থ সুন্দর দীপ্তি ও কান্তি দ্বারা যুক্ত।

নরাশংসের গুণাবলী

হিন্দু ধর্মের সর্বপ্রধান এবং মৌলিক ধর্মগ্রন্থ ঋগবেদ। চারটি বেদ গ্রন্থের মধ্যে ঋগবেদের স্থান প্রথম এবং প্রধান। মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ, উপনিষদ, ইত্যাদি গ্রন্থ অপেক্ষা বেদ গ্রন্থ সমূহের মর্যাদা এবং গুরুত্ব অধিকতর।

ঋগবেদে নরাশংস ঋষির বহু গুণাবলী এবং মহত্বের বর্ণনা রয়েছে। নরাশংসের গুণাবলী তাঁর কর্ম আচরণ এবং মহত্বভিত্তিক। তা ছাড়া নরাশংস ঋষির কতগুলো ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী ঋগবেদে উল্লেখিত হয়েছে।

ধর্মগ্রন্থে কোন ধর্ম প্রচারক বা ধর্মের উৎস ঈশ্বর বা দেবতার প্রশংসা গীতি গীত হয় এবং স্তবস্তুতি নিবেদন করা হয়। নরাশংস ঈশ্বর নন। তিনি শ্রেষ্ঠতম মানব এবং ঈশ্বরের সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি।

মধু জিহ্বা নরাশংস

ঋগবেদ সংহিতায় নরাশংসকে মধু জিহ্বা বিশেষণে বিভুষিত করা হয়েছে। নরাশংসের বাক্য ও কণ্ঠ মধুময়। নরাশংস যখন কথা বলেন শ্রোতৃমন্ডলী মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে তার মধুর কণ্ঠের বাক্য শ্রবণ করেন এবং মুখস্ত করে ফেলতে পারেন। ঋগবেদে "মধু জিহ্ব" নরাশংসের বর্ণনা যে ভাষায় করা হয়েছে তা হল– "নরাশংস মিহপ্রিয় মাস্মন্যও উপহ্বয়ে। মধু জিহ্ব হবিকৃতম।"

www.nagorikpathagar.org

সুন্দর কান্তি স্বচি নরাশংস সম্বন্ধে ঋগবেদে বলা হয়েছে– "নরাশংস প্রতিধামান্যঞ্জন তিস্ত্রো দিব প্রতি মহ্ন স্বচি (ঋগবেদ সংহিতা ২/৩/২)। এর অর্থ নরাশংস এমন স্বচি বা কান্তিময় হবেন যে তার মুখ মন্ডল থেকে জ্যোতি নির্গত হবে। আলো রশ্মি উদভাসিত হবে।

স্বচি শব্দের ব্যাখ্যায় ঋগবেদে বলা হয়েছে যে, নরাশংসের সৌন্দর্য আভায় সকল গৃহ আলোকিত হবে। এর অর্থ প্রতিগৃহে নরাশংসের প্রশংসাধ্বণী উচ্চারিত হবে। প্রতিগৃহে তার প্রশংসাসূচক নাত গীত হবে।

ঋগবেদে নরাশংসের নামের সাথে প্রশংসাসূচক বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত একটি সংযুক্ত শব্দ "প্রতিধামান্যঞ্জন।" এ শব্দটি দু'টি শব্দযোগে গঠিত। শব্দ দু'টি হচ্ছে প্রতিধামান এবং অঞ্জন। প্রতিধামান অর্থ প্রতি গৃহে গৃহে। অঞ্জন অর্থ আলো প্রকাশিত হওয়া। আলোকিত হওয়া। অঞ্জন শব্দের অপর অর্থ জ্ঞান। নরাশংসের প্রশংসাগীত প্রতি গৃহে গৃহে গীত হবে–এ অর্থেই প্রতিধামান্যঞ্জন শব্দটি নরাশংসের নামের সাথে ব্যবহৃত হয়েছে।

মহানবী মুহাম্মাদ (সা.) এবং প্রশংসা, স্তব, দরুদ প্রতি মুসলিম গৃহে গীত হয়ে থাকে। তাঁর পবিত্র নাম মুহাম্মাদ শব্দটি উচ্চারণ করা হলেই উচ্চারণকারী এবং শ্রোতা বা শ্রোতৃমন্ডলী তার প্রশংসাসূচক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মন্ত্র বা দুয়া পাঠ করে থাকেন। ঋগবেদে নরাশংসকে অঞ্জন বা জ্ঞান প্রসারক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

৭ম অধ্যায়

২৩

ইসলাম ও হিন্দুধর্ম

ইসলাম ধর্মের মূলনীতি এবং মর্মবাণী হচ্ছে– মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা এক, একক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। তিনি কারও উপর নির্ভরশীল নন। সমগ্র সৃষ্টি তাঁর উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ ইবাদত করবে আল্লাহ্ তায়ালার এবং সাহায্য চাইবে একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার কাছে।

হিন্দু ধর্মেও এক অদ্বিতীয় পরম ঈশ্বরের ধারণা আছে। ঈশ্বর "একম ইভা দ্বিতীয়ম" অর্থাৎ ঈশ্বর এক ও একক। অদ্বিতীয়,আর দ্বিতীয় কেউ নেই। এই মৌলিক বিষয়ে ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মে মিল আছে।

আদিতে ইসলাম এবং হিন্দুধর্ম যে এক উৎস থেকে– তার প্রমাণ ধর্মীয় সাহিত্য, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে ভরপুর। হিন্দুধর্ম মতে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, "একম ইভা দ্বিতীয়ম"। এক ভিন্ন দ্বিতীয় ন্যস্ত, নেহন, কিঞ্চন অর্থাৎ নেই, নেই, নেই। আদৌ নেই। এটাই তো ইসলামের মূলবাণী। আল্লাহ্ ভিন্ন কোন প্রভু নেই। এটাই তাওহীদ। আল্লাহ্ তা'য়ালার একত্ববাদ।

তবুও দেখা যায় ইসলাম ও হিন্দু ধর্মে বিরাট পার্থক্য এবং অকারণ বিরোধ। পারস্পরিক আদর্শিক এবং নীতিমূলক সমঝোতা বা আপোষের চেষ্টা সর্বযুগেই হচ্ছে। সাফল্য শতকরা দশভাগ হলে ব্যর্থতা হবে নব্বই ভাগ। এর ফলে কোন্ মতটি সঠিক এবং কোনটি বেঠিক, তা কোন পক্ষই অন্য পক্ষের সকলকে অনুধাবন করাতে সক্ষম হননি। ভারতীয় হিন্দুদের এক অংশ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে।

অবশ্যই বিশ্বের সকল ধর্মের বিশ্বাসী এবং অনুসারীগণ পরস্পর ভাই ভাই। তাঁরা আদি পুরুষ হযরত আদম (আ.) এবং আদি মাতা হযরত হাওয়া (রা.) এর আওলাদ এবং বংশধর। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

ঈশ্বরকে এক এবং অদ্বিতীয় (ইভা দ্বিতীয়ম) স্বীকার করে নেয়ার পরেও হিন্দুগণ একমাত্র এক ঈশ্বর বা পরমেশ্বরের পূজা নয়, তারা সাড়ে তেত্রিশ কোটি দেবতায় বিশ্বাসী। তেত্রিশ কোটি দেবতায় বিশ্বাসী হলেও হিন্দু ধর্মে এক ও অদ্বিতীয় পরম ঈশ্বর এর ধারণা হারিয়ে যায়নি।

www.nagorikpathagar.org

হিন্দু ধর্মে ত্রিত্ববাদ

ঈশ্বর এক এবং প্রথম। এটা স্বীকার করে নিয়েও হিন্দুগণ হয়ে যান তিন ঈশ্বরের অনুসারী অর্থাৎ ত্রিত্ববাদী। এ তিন ঈশ্বর হলেন সৃষ্টিকর্তা পরম ব্রহ্ম, পালনকর্তা বিষ্ণু এবং ধ্বংসকর্তা মহেশ্বর শিব। এ তিন জনের মধ্যে সকল সৃষ্টির স্রষ্টা ব্রহ্মা এবং পালনকর্তা বিষ্ণুর অবদানই হল সংহারকর্তা শিব অপেক্ষা শিব বেশী। তবুও দেখা যায় ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু পূঁজা অপেক্ষা হিন্দুগণ মহেশ্বর শিব পূঁজাই বেশী করে থাকেন। এটা হতে পারে হয়ত ভয় ব ভীতির কারণে। শিব ধ্বংসকর্তা হলেও সৃষ্টিকে মহান স্রষ্টা ব্রহ্মা এবং পালনকর্তা বিষ্ণু অপেক্ষা মহেশ্বর শিব কম ভালবাসেন না।

বৈদিক ও সনাতন ধর্ম

হিন্দুধর্মকে বৈদিকধর্ম বলা হয়। ধর্ম হিসাবে হিন্দু নামটি পরবর্তীকালের। এই হিন্দু নামটি হিন্দুগণ গ্রহণ করেননি। এ নাম তাদেরকে দিয়েছে মূলত মুসলিমগণ।

ভারতের প্রাচীন নাম ছিল বিবিধ। ইউরোপিয়ানগণ সিন্ধু নদীকে বলত ইন্ডাজ। সিন্ধু নদীর তীরবর্তী এলাকাকে বলত ইন্ডিয়া। এখনও ভারতের বিশ্ব স্বীকৃত নাম ইন্ডিয়া। হিন্দু শব্দটিও এসেছে সিন্ধু নদী থেকে।

প্রাচীন ধর্ম

হিন্দু ধর্ম প্রাচীনতম ধর্ম। এটা এক ব্যক্তি কর্তৃক প্রচারিত এবং একমনা ধর্ম নয়। পাহাড়ে, বনে, বৃক্ষলতা স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠে। প্রাকৃতিক কারণে কোন কোন স্থানে একই প্রকার বৃক্ষ জন্মে। এক বৃক্ষের ফল এবং বীজ থেকে একই রকম বৃক্ষ হয়। প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে শালবন, সেগুনবন, মেহগনিবন, আম্রবন, লিচুবন, ইত্যাদি বিভিন্ন ফলের কাঠ এবং বন হয়।

নদী-নালা, সাগর, মহাসাগর, প্রাকৃতিক কারণে হয়। বর্তমানকালে অবশ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য মিশরে আসোয়ান বাঁধ, সিন্ধু নদীর বাঁধ, কাপ্তাই বাঁধ, ফারাক্কা বাঁধ নির্মিত হয়ে জীবন ধারা প্রভাবিত হচ্ছে।

প্রাকৃতিক ধর্ম

হিন্দু ধর্ম অনেকটা প্রাকৃতিক ধর্ম। হিন্দু মণীষীগণ নিজেদের মনের আলোকে ধর্মকে রূপ দিয়েছেন। তাই এর মধ্যে রয়েছে বৈপরীত্ব এবং বৈচিত্র। বর্তমানে হিন্দু ধর্মে যা বলা হয়–তা এত বিপরীতমুখী বিশ্বাস, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও ধারণার সমন্বয়– যে এটাকে একটি সুসংহত রূপ দেয়া কঠিন।

মুসলিম, খৃষ্টান এবং ইয়াহুদদের কাছে হিন্দু ধর্ম এক মহা এবং গূঢ় রহস্য। এ তিনটি ধর্মের মধ্যে অমিল থাকলেও মিলের প্রবণতা লক্ষণীয়। বর্তমানে হিন্দু

www.nagorikpathagar.org

ইজম বলতে যা বুঝায়, তা সুস্পষ্ট করে দেয়া কঠিন। মুসলিমদের নিকট হিন্দুদের অনেক কিছুই কুয়াশায় আচ্ছন্ন।

পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ

খৃষ্টান ধর্মের ইতিহাস দু হাজার বছরের। ইয়াহুদ ধর্মের অতীত ইতিহাস পাঁচ হাজার বছরের বেশী। হিন্দু ধর্মের ইতিহাস দশ হাজার বছরের বেশী। ইসলাম ধর্মের ইতিহাস দেড় হাজার বছরের। কিন্তু অবস্থানগত কারণে বা দৈব বাণীর কারণে ইয়াহুদ, খৃষ্টান এবং মুসলিম ধর্মের মধ্যে ঐক্যের সুর ধ্বনিত হয়। ইয়াহুদ ও খৃষ্টানগণ তাদের পরবর্তীকালে প্রচারিত ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মাদের (সা.) এর বহু কাল্পনিক ও মিথ্যা সমালোচনা করে থাকেন। কিন্তু মুসলিমগণ ঐ দুই ধর্মের নবী, রাসূল এবং প্রেরিত পুরুষদের বিন্দুমাত্র সমালোচনা করেন না।

যদি কোন মুসলিম ইয়াহুদ এবং নাসারা খৃষ্ট ধর্মের নবী রাসূলদের বিন্দুমাত্র সমালোচনা করে, তাহলে সে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। কিন্তু হিন্দু ধর্ম এবং প্রচারকের প্রতি মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গী কেন সেরূপ হতে পারছে না ? এটা একটি রহস্য এবং বিস্ময়।

হিন্দু ধর্মীয় সাহিত্য

হিন্দু ধর্মের গৌরব করার মত যে বিষয়গুলো রয়েছে তা কি মুসলিমগণ অস্বীকার করেন? সাহিত্য, দর্শন, স্থাপত্য, ইত্যাদিতে হিন্দু ধর্মের যে অতুলনীয় অবদান– তা মুসলিমগণ কখনো অস্বীকার করেন না।

সাহিত্যে হিন্দু সভ্যতার অবদান অতুলনীয়। এমনকি ধর্মীয় সাহিত্যেও হিন্দু ধর্মের অবদান অকল্পনীয়। বেদ, উপনিষদ, মহাভারত, রামায়নের মত ধর্মীয় গ্রন্থ ও মহাকাব্য পাশ্চাত্যের ইউরোপীয় এবং আমেরিকানগণও রচনা করতে পারেননি।

ভাষা ও সাহিত্য

কবি এবং নাট্যকার হিসাবে কালিদাস মানব ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। ব্যাকরণ এবং ভাষাতত্ত্বে পনীনি ও পাতাঞ্জলীর মতো অবদান সমকালীন কোন ভাষাবিদ রাখতে পারেন নি। রাষ্ট্রনীতিতে কৌটিল্যের রাষ্ট্র শাস্ত্র, যৌন বিজ্ঞান চর্চায় বাসুদেবের কামসূত্র, ইত্যাদি সমকালীন মানব সভ্যতায় অতুলনীয়। বিশ্বাসযোগ্য বাস্তব মানব ইতিহাস ও ধর্ম দর্শনে হিন্দুদের অবদান অন্য দিকের মত উজ্জ্বল নয়।

স্থাপত্য

হিন্দুদের ধর্ম মন্দির, সমাধি সৌধগুলো মুসলিমদের সঙ্গে তুলনীয় নয়। মুসলিম ভবন সমূহের মধ্যে যেরূপ সুক্ষ্ম কারুকার্য, প্রশস্ততা, ব্যাপকতা, প্রাকৃতিক

www.nagorikpathagar.org

সমন্বয়তা এবং উদারতা থাকে হিন্দু মন্দিরগুলোর মধ্যে তা নেই। তানজোরে অবস্থিত হিন্দু মন্দিরটি ভারত বিখ্যাত। এ মন্দিরের স্থাপত্য হিন্দু মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। এর মধ্যে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আছে। কিন্তু আকৃতি এবং ধারণার উদারতায় রয়েছে কার্পণ্য।

মায়া

হিন্দুগণ মানব দেহবহিস্থ বিষয়ে গবেষণা করে প্রভুত সাফল্য অর্জন করেছেন এবং এগুলোকে "মায়া" বলেও প্রত্যাখান করেছেন। কিন্তু মানব মন, চিন্তাধারা, ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর গভীর গবেষণা লিপ্ত হওয়ার সময় পাননি।

হিন্দুদের মতে শুধুমাত্র জীবজগত ও প্রাণীজগত নয়, প্রাণহীন পাহাড়, পর্বত, পাথর, নদী-নালা, বায়ু, ইত্যাদির মাধ্যমেও ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন। তাই প্রাণহীন মাটি, প্রস্তর, ধাতু ইত্যাদিকে পূজা করলেও ঈশ্বরই হিন্দুদের পূজা পেয়ে থাকেন। ঈশ্বর তাঁর সমগ্র সৃষ্টির সাথে মিশে আছেন। সমস্ত সৃষ্টি তেমন কিছু নয়, শুধুমাত্র মায়া, প্রহেলিকা। প্রকৃত সত্য হলেন ঈশ্বর।

চারদিকে যা দেখা যায়, তা হল অস্থায়ী মায়া। প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংসশীল এবং ঈশ্বর একমাত্র অস্তিত্বশীল। সব কিছুই হলো ঈশ্বরের লীলাখেলা। ঈশ্বর সৃষ্টি করেন এবং ধ্বংস করেন। তাঁর ইচ্ছায় পাপ এবং পূণ্য সংঘটিত হয় এবং তা তাঁর সৃষ্টির প্রক্রিয়ার মাঝে মিশে আছে।

হিন্দুগণ একটি মহাজাতি। জীবনকে মায়া বলে উড়িয়ে না দিয়ে জীবন দর্শনে গভীরে প্রবেশ করতে পারলে পৃথিবীর অন্য তিনটি ধর্মের সাথে হিন্দু ধর্মের এমন বৈপরীত্ব দেখা যেত না।

সকল জাতির প্রতি নবী রাসূল

আল্লাহ্ তা'য়ালা আল-কুরআনে বলেছেন, তিনি সকল জাতির নিকট তাঁর প্রেরিত পুরুষ, রাসূল বা নবী প্রেরণ করেছেন। আরবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্রের জন্যও নবী প্রেরিত হয়েছে। হিন্দুদের সংখ্যা কোটি কোটি। নিজেদের বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও হিন্দুগণ নিজেদেরকে প্রাচীন বা সনাতন ধর্মীয় মনে করেন।

হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে পাঠ করা বড় দুরুহ ব্যাপার। এটা অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর ধর্ম। প্রাচীনতম ধর্ম হল হযরত আদম (আ.) এর ধর্ম। এ সম্বন্ধে প্রাচীনকাল হতে মুণী ঋষিগণ তাদের জ্ঞান অভিজ্ঞতার আলোকে লিখে গেছেন। দু'দলের ঐক্যমত অপেক্ষা অনৈক্য শুধু কয়েক গুণ নয়, কয়েক শত। এত বেশী যে গবেষণা করে কতটুকু সঠিক তা অনুধাবন করাও বড় কঠিন।

যেহেতু হিন্দুগণ একটি জাতি বা কাওম, তাই অবশ্যই হিন্দুদের কাছে নবী বা রাসূল এসেছিলেন। হিন্দুগণ নবীদের রূপে তাঁদেরকে চিনতে পারেননি। এটা

www.nagorikpathagar.org

অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয়। হযরত নূহ (আ.) এর হায়াত ছিল নয় শত পঞ্চাশ বছর। তার জাতি তাকে চিনতে পারেনি।

হযরত নূহ এর অনুসারীদের সংখ্যা ছিল ৭২ অথবা ৮৩ জন। তার কওম তাকে নয় শত বছরেও আল্লাহ্ তায়ালার নবী বলে স্বীকার করেনি এবং তাঁকে নবী বলে গ্রহণ করেননি।

হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে মহানবীর (সা.) এর উল্লেখ

হিন্দুধর্ম গ্রন্থ সমূহ মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে বা পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) হিন্দুধর্ম গ্রন্থ রচয়িতার কাছে অপরিচিত ছিলেন না। হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ বেদ সমূহে তাঁর অজস্র উল্লেখ আছে। হিন্দুদের একটি বিশেষ প্রকৃতির ধর্মগ্রন্থ হল 'পুরাণ'। 'পুরাণ' গ্রন্থগুলো মূলত ঈশ্বর, দেবতা, ঋষি এবং পবিত্র আত্মাদের কাহিনী। পুরাণে উল্লেখ সংস্কৃত শ্লোকটি হলো– "অতশ বিনানেষ তারে স্লেচ্ছ আচার্য্য সমন্বিতা"। "মহামদ" ইতি কথা শিষ্য শাখা সমন্বিতা"।

সংস্কৃত শ্লোকটির অর্থ হল– "যখন মানব সমাজ অমানবচিত ম্লেচ্ছে অবনত হবে, তখন "মহামদ" নামে এক মহাপুরুষ সঙ্গী সাথী সমন্বয়ে আবির্ভুত হবেন। হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ সমূহে রাসূল (সা.) এর সঙ্গী সাহাবীদের উল্লেখ বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ।

হযরত মহাম্মাদ (সা.) এর আবির্ভাবের সময় আরব দেশের সামাজিক, মানবিক অবস্থা যে কত করুণ এবং মর্মান্তিক ছিল–ইতিহাস এর সাক্ষী। নারীদেরকে মনুষ্য হিসেবে গণ্য করা হত না। অন্যান্য বহু প্রাণীর ন্যায় নারী ছিল ভোগের সামগ্রী মাত্র।

আর্যদের বহু পূর্বে ভারতীয়দের সঙ্গে আদি ইসলাম এর পরিচয় ও সম্পর্ক ছিল। মানব ইতিহাসে অন্য কোন ধর্ম প্রচারক অপেক্ষা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্য তাঁর সাহাবী অনুসঙ্গীদের ত্যাগ ও ভালবাসা ছিল অকল্পনীয় ও অতুলনীয়।

ধর্মগ্রন্থ পুরাণে যথার্থই উল্লেখ করা হয় যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নিবেদিতপ্রাণ সঙ্গী সাহাবীদের মাধ্যমে তাঁর ধর্ম প্রচার করেছিলেন। বিদায় হজ্বের সময় লক্ষাধিক সাহাবী অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত আদম (আ.) এর আবির্ভাব স্থান

হযরত আদম (আ.) যে ছিলেন মানব জাতির পিতা–এ বিষয়ে কোন মুসলিমের সন্দেহ নেই। যেমন সন্দেহ নেই রাসূলুল্লাহ (সা.) যে আরবের শ্রেষ্ঠ নগরী মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হযরত মুসা (আ.) যে মিশরে অথবা ফিরাউনের রাজ্যে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন– এতে কোন সন্দেহ নেই। হযরত

www.nagorikpathagar.org

ইব্রাহীম (আ.) এর সাথে সম্পর্ক যে ইরাক এবং মক্কা ও মীনার সাথে– এটাও আমরা বিশ্বাস করি।

হযরত আদম (আ.) এর আবির্ভাব যে আরবে হয়েছিল–এ দাবী কি মুসলিমগণ করে ? জান্নাত থেকে বহির্গত হযরত আদম (আ.) এর স্মৃতি এবং নামের সাথে সুদূরতম হলেও সম্পর্ক আছে– এমন স্থান পৃথিবীতে কোথায়?

চরণ দ্বীপ বা শ্রীলঙ্কা (সিলনে) যে হযরত আদম (আ.) এর চরণ বা কদম পড়েছিল এরূপ একটি লোককথা প্রচলিত আছে– এটা কি বর্তমান যুগের কোন বুদ্ধিজীবীর আবিষ্কার? এ কথাটি তো কুরআনুল কারীমের ও হাদীসের তাফসীর এবং ভাষ্যগ্রন্থ সমূহে উল্লেখ আছে (আল্লামা সৈয়দ সোলায়মান নাদভী (রহ.) রচিত "আরব আউর হিন্দ কে তায়াল্লুকাত", পৃষ্ঠা-১-২)।

অনেকেই বিশ্বাস করেন শ্রীলঙ্কার আদম হিল বা আদম পাহাড়ে (Adam Peak) হযরত আদম (আ.) প্রথম কদম রেখেছিলেন। সেখানকার এক পাহাড়ে হযরত আদম (আ.)-এর পদচিহ্ন আছে বলা হয়। সে পাহাড়টি ধর্ম নির্বিশেষে বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণ কেন্দ্র। বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ লেখক, মুফাসসির ইবন জারীর, বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ লেখক "মুসতাদর", সংকলক ইবন আবু হাতিম, বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাকিম (রহ.), প্রমুখের কিতাবে শ্রীলঙ্কার আদম পাহাড়ের কথা উল্লেখ আছে।

শ্রীলঙ্কার অধিবাসীদের মধ্যে মুসলিমদের সংখ্যা ৫% এর নীচে। কিন্তু আদম হিলের কথা শ্রীলঙ্কাবাসীদের মুখে মুখে। তাফসীর গ্রন্থ সমূহে হযরত আদমের অবস্থান স্থানটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে "দজনী"। আদিকালে ভারত ভূমি এবং আরব মূলক সংযুক্ত ছিল। আরব সাগর সৃষ্টি হয়েছে হযরত আদম (আ.) এর আবির্ভাবের পর।

শ্রীলঙ্কায় এক মহা মনীষীর পদচিহ্নের দাবী এমন বদ্ধমূল যে, এখন হিন্দু এবং বৌদ্ধগণ সে ঐতিহ্যে ভাগ বসাতে চান। হিন্দুগণ দাবী করেন শ্রীলঙ্কার হযরত আদম (আ.)-এর যে পদচিহ্নটি আছে তা শিবাজীর পদচিহ্ন। বৌদ্ধরাও এ বিষয়ে পিছিয়ে নেই। তারা দাবী করেন উত্তর ভারতে জন্মগ্রহণকারী বিন্দুসারের পুত্র গৌতম বুদ্ধের পদচিহ্ন শ্রীলঙ্কায় আছে।

আরবদের প্রাচীন ইতিহাসে আরবদের পৈতৃক ভূমি শ্রীলঙ্কায় দাবী করা হয়। প্রাচীন আরবদের ইতিহাসে বা লোককথায় হযরত আদম (আ.) এর আবির্ভাব মিশরে অথবা আরবে, ইরাকে বা সিরিয়া, বা শ্যামে হয়েছিল– এ দাবী করেন না।

www.nagorikpathagar.org

হযরত আদমের চুলা/উনুন

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) এর মতে হযরত আদম (আ.) এর চুলা ছিল হিন্দুস্থানে (আল্লামা শওকানী, তাফসীরে ফাতহুল কাদীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৭৪)। হযরত আদম (আ.)-এর চুলা যদি থাকে হিন্দুস্থানে– তিনি বসবাসও করতেন অবশ্যই হিন্দুস্থানে। অর্থাৎ হিন্দুস্থানের অধিবাসীগণ ছিলেন আদি মুসলিম।

পরবর্তীতে হযরত মূসা (আ.), ইব্রাহীম (আ.), সুলায়মান (আ.), ইসমাইল (আ.), আইউব (আ.), লুত (আ.) প্রমুখ প্রখ্যাত এবং জ্ঞাত নবীদের অধ্যুষিত অঞ্চলে এমনকি কাবা প্রাঙ্গণে যদি মূর্তি স্থাপিত এবং বড় বড় মূর্তির পূজা প্রচলিত হতে পারে, তবে হিন্দুস্তানে পাথরের নয়, মাটির তৈরী, ভঙ্গুর ছোট ছোট মূর্তির পূজা কায়েম হলে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই !

পৃথিবীর কোন দেশের অধিবাসীগণ যখন তাদের দেশে হযরত আদম (আ.) আবির্ভাব হয়েছে– এরূপ মৃদু মৃদু দাবীও করেননি–তবে একমাত্র দাবীদার শ্রীলঙ্কাবাসীদের দাবী মেনে নিতে বড় আপত্তির কারণ কি হতে পারে!

সর্বশেষ নবী ও রাসূল

ইসলামের শিক্ষা মতে মানবতার শিক্ষা এবং দিক নির্দেশনার জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী রাসূল পাঠান। হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা.) সর্বশেষ নবী এবং রাসূল। হিন্দু ধর্ম মতে ঈশ্বর নিজেই অবতার হিসেবে অবতরণ করেন। তিনি নিজেকে সাড়ে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীতে বিভক্ত করেন। মুসলিমগণ মনে করেন আল্লাহ্ এক অবিভাজ্য এবং অদ্বিতীয়। তার কোন অবতার বা অবতরণ নেই। তিনি সর্বত্রই বিরাজমান।

সুদূর অতীতে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম ধর্মের মূল উৎস ছিল একই এবং তত্ব একই। মুসলিমদের কুরআন এবং হাদীস সম্পর্কে শিয়া এবং সুন্নীদের মধ্যে বিরাট মত পার্থক্য রয়েছে। তা সত্ত্বেও মৌলিক বিশ্বাস এবং সুর একই।

আল্লাহ্ তা'য়ালার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান হলেন জন্মগত মুসলিমগণ। সবচেয়ে নিঃস্ব, হতভাগা হলেন–যারা জন্মগতভাবে অমুসলিম। চিন্তা করে দেখুন–জন্মগত মুসলিম না হলে আমাদের ক'জনের পক্ষে পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম কবুল করা সম্ভব হত ! আল্লাহ্ তা'য়ালার অত বড় নিয়ামতের শুকরিয়া প্রকাশের একটি উত্তম প্রক্রিয়া হলো যারা জন্মগতভাবে মুসলিম নন, তাঁদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া।

অমুসলিমদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছাতে হলে প্রথমে তাঁদের ধর্ম সম্বন্ধে জানতে হবে। হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছানো– ঐ

www.nagorikpathagar.org

মুসলিমদের পক্ষেই সহজ যারা হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে অন্তত কিছুটা জানেন। যারা একই বিষয়ে দু'টি ধর্মের মিল, অমিল, নৈকট্য, দূরত্ব, মত পার্থক্যের কারণ অবহিত। হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে অবহিত হতে হলে হিন্দু ধর্মের পুস্তক মুসলমানদের অবশ্যই পাঠ করতে হবে।

২৪
বিশ্ব সভ্যতায় হিন্দু ধর্মের অবদান

হিন্দু ধর্ম এক ব্যক্তি কর্তৃক প্রচারিত এবং একমনা ধর্ম নয়। পাহাড়, বন, বৃক্ষলতা স্ব-উদ্যোগে বেড়ে ওঠে। প্রাকৃতিক কারণে কোন কোন স্থানে একই প্রকার বৃক্ষ জন্মে। এক বৃক্ষের ফল এবং বীজ থেকে একই রকম বৃক্ষ জন্মে। প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে শালবন, সেগুন বন, মেহগনি বন, আম্রবন, লিচু বন, ইত্যাদি বিভিন্ন ফলের কাঠ এবং বন হয়।

নদী-নালা, সাগর, মহাসাগর, প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্টি হয়। বর্তমান কালে মানবিক পরিকল্পনার বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য মিশরে আসোয়ান বাঁধ, সিন্ধু নদীর বাঁধ, কাপ্তাই বাঁধ, ফারাক্কা বাঁধ নির্মিত হয়ে বাঁধ এলাকা বা বাঁধ প্রভাবিত এলাকায় জীবন ধারা প্রভাবিত হয়।

হিন্দু ধর্মীয় রহস্য

হিন্দুইজম বলতে কি বুঝায়? এর সংজ্ঞা, বিভাগ এবং সংক্ষিপ্তসার করে দেয়া কঠিন। যারা হিন্দু নন, তাঁদের কাছে হিন্দুদের অনেক কিছু বর্তমানেও কুয়াশায় আচ্ছন্ন।

হিন্দু ধর্ম অনেকটা প্রাকৃতিক ধর্ম। হিন্দু মনীষীগণ নিজেদের মনের আলোকে ধর্মকে রূপ দিয়েছেন। তাই এর মধ্যে আছে বৈপরীত্ব এবং বৈচিত্র। বর্তমানে হিন্দু ধর্মে যা বলা হয়–তা এত বিপরীতমূখী বিশ্বাস, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও ধারণার সমন্বয় যে–এটাকে একটি সুসংহত রূপ দেয়া কঠিন।

মুসলিম, খৃষ্টান এবং ইয়াহুদ ইত্যাদি ধর্মের অমিল থাকলেও মিলের প্রবণতা লক্ষণীয়। কিন্তু, তাদের কাছে হিন্দু ধর্ম এক মহা প্রহেলিকা এবং গূঢ় রহস্য।

মানব সভ্যতায় হিন্দু ধর্মের অবদান

হিন্দু ধর্মের গৌরব করার মতো যে বিষয়গুলি আছে তা কি মুসলিমগণ অস্বীকার করে? সাহিত্য, দর্শন, স্থাপত্য, ইত্যাদিতে হিন্দু ধর্মের অতুলনীয় অবদান রয়েছে। মুসলিমগণ স্বীকার করে–সাহিত্যে হিন্দু সভ্যতার অবদান অতুলনীয়। এমনকি ধর্মীয় সাহিত্যেও হিন্দু ধর্মের অবদান অকল্পনীয়। বেদ, উপনিষদ,

www.nagorikpathagar.org

মহাভারত, রামায়ণের মত ধর্মীয়গ্রন্থ ও মহাকাব্য পাশ্চাত্যে ইউরোপীয় এবং আমেরিকানগণ রচনা করতে পারেননি।

হিন্দু ধর্ম মানব জাতির প্রাচীনতম ধর্ম

খৃষ্টান ধর্মের ইতিহাস দু'হাজার বছরের। ইয়াহুদ ধর্মের ইতিহাস পাঁচ হাজার বছরের। মানব জাতির পিতা হযরত আদমের আবির্ভাব হয় খ্রষ্টপূর্ব ১০,০০০ বছরের পূর্বে। হিন্দু ধর্মের ইতিহাস অতি কম করে হলেও তিন হাজার বছরের। বর্তমান ইসলাম ধর্মে ইতিহাস দেড় হাজার বছরের। এর শুরু মহানবী মুহাম্মাদ (সা.) এর নুবুয়াত হতে (৬১০ খ্রী.)। অবস্থানগত প্রভাবে বা দৈববাণীর কারণে ইয়াহুদ, খৃষ্টান এবং মুসলিম ধর্মের মধ্যে বেশ কিছু ঐক্যের সুর ধ্বনিত হয়।

ইয়াহুদ এবং খৃষ্টানগণ ইসলাম ধর্মের প্রচারক হযরত মুহাম্মাদের (সাঃ) বহু কাল্পনিক ও মিথ্যা সমালোচনা করে থাকেন। কিন্তু মুসলিমগণ ঐ দুই ধর্মের নবী রাসূল প্রেরিত পুরুষদের বিন্দুমাত্র সমালোচনা করে না এবং করবেও না। কারণ এটা অসম্ভব।

যদি কোন মুসলিম, ইয়াহুদ এবং খৃষ্টধর্মের নবী রাসূলদের বিন্দুমাত্র সমালোচনা করে, তবে সে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। কিন্তু হিন্দু ধর্মের প্রতি এবং ধর্ম প্রচারকদের প্রতি মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গী ততটুকু উদার হতে পারছে না ? এটা একটি রহস্য এবং বিস্ময়।

হিন্দুধর্মীয় চিন্তাধারা এবং উৎসও অতি প্রাচীন। এগুলোর বর্তমান লিখিত তথ্য খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে উদ্ভুত। প্রাচীনতরও হতে পারে। তবে ক্রমশ ধর্মীয় বিশ্বাস চিন্তাধারার বুদ্ধিভিত্তিক সংস্কার এবং পরিচ্ছন্নকরণ হয়– বলা যেতে পারে।

প্রকৃতি/স্বত্ব, রজ, রস, তম

প্রকৃতির মধ্যে মূল সত্ত্বা, উৎস, গুণ বা মর্ম থাকতে পারে। প্রকৃতির মূল গুণ বা উৎস হল তিনটি। এগুলোর প্রথমটি হল সত্ত্ব বা গুণ বা কল্যাণ। দ্বিতীয়টি হল রজ বা রস। রজ বা রস এর থেকে পাওয়া যায় শক্তি, সামর্থ, বুদ্ধিমত্তা। তৃতীয়টি হল তম বা অন্ধকার বা অজ্ঞাত বিষয়। এর মধ্যে আলো বা নূর নেই। তবে স্বত্ত্ব বা কল্যাণের মধ্যে আলো বা নূর বা দিক-নির্দেশনার বিষয় অন্তর্ভূক্ত আছে ধরা যেতে পারে।

স্বত্ত্ব

স্বত্ত্ব ও রজ এবং তম এ তিনটি বা ত্রিত্ববাদ হিন্দু শাঙ্খ দর্শনের মূল ধারা বা চিন্তা। এ তিনটি হল প্রকৃতি। স্বত্ত্বের মধ্যে রয়েছে ২৩টি বৈশিষ্ট্য। এ গুলোর উৎস হলো প্রকৃতি। এ প্রকৃতি হল দৃশ্য জগত এবং অদৃশ্য জগতের মূল।

www.nagorikpathagar.org

প্রকৃতি সৃষ্টির মূল বা মৌলিক উৎস বা আদ্য বা আদি প্রকৃতি হল স্রষ্টা। প্রকৃতি যদি সব কিছুর উৎস হয়, তা হলে তো ঈশ্বরের প্রয়োজন হয় না। অন্য চিন্তা বা ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, প্রকৃতি মাতৃস্বরূপ। প্রকৃতি থেকে সব কিছুই উৎপন্ন হয়।

প্রকৃতি যদি সব কিছুর মাতা বা উৎস হয়, তাহলে পিতার প্রয়োজন কি? নারীরূপ প্রকৃতির স্বামী কে ? এখান থেকে সৃষ্টি হয় প্রাচীন সত্ত্ব পুরুষ বা আদি নরের ধারণা।

প্রাচীন এ শাঙ্খ মতবাদে প্রকৃতি এবং আদি নরই হল সকল সৃষ্টির উৎস। পরবর্তী শাঙ্খ দর্শনে প্রকৃতি বা নারী হলো প্রথম সৃষ্টি। পুরুষ হল দ্বিতীয় সৃষ্টি। কিন্তু সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় দেখা যায় পুরুষের ভূমিকা মৌলিক এবং পুরুষই প্রায় সমস্ত সৃষ্টির উৎস।

২৫
হিন্দুধর্মের ছয় (ষড়) দর্শন

প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে দর্শন চিন্তা আছে। হিন্দু ধর্মেও দর্শন আছে। হিন্দু ধর্ম দর্শন ছয় প্রকার। এগুলোকে ষড় দর্শন বলা হয়। হিন্দু ষড় দর্শন বা ছয় প্রকার দর্শনের নাম (১) ন্যায় দর্শন, (২) বৈশেষিকা দর্শন, (৩) শাঙ্খ দর্শন, (৪) পাতঞ্জলী দর্শন, (৫) পূর্ব মিমাংসা দর্শন ধর্ম এবং (৬) উত্তর মিমাংসা দর্শন।

হিন্দু ষড় দর্শন অর্থাৎ ছয় প্রকার দর্শনের প্রত্যেকটি এক একজন ঋষি কর্তৃক প্রণীত। এ ষড় ঋষি হলেন (১) গৌতম, (২) কনাদ, (৩) কপিল, (৪) পাতঞ্জল, (৫) জৈমিনী এবং (৬) বিখ্যাত বাদসায়ন বা বেদ ব্যাসজী।

গৌতম প্রণীত দর্শন হল– (১) ন্যায় দর্শন, (২) কনাদ প্রণীত দর্শন হলো– বৈশেষিকা দর্শন, (৩) কপিল প্রণীত হল– শাঙ্খ দর্শন, (৪) পাতঞ্জল– প্রণয়ন করেছেন পাতঞ্জলি দর্শন, (৫) জৈমিনী উন্নয়ন করেছেন পূর্ব মিমাংসা দর্শন (৬) বাদসায়ন বা ব্যাস প্রণয়ন করেছেন বেদান্ত দর্শন বা উত্তর মিমাংসা দর্শন।

বাদসায়ন বা বেদব্যাস কর্তৃক প্রণীত বেদান্ত দর্শন হলো বেদের শেষের বক্তব্য। এ জীবন দর্শনে ঈশ্বরের পূজা এবং প্রভাবের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যারা হিন্দু ধর্মের পদ্ধতিগুলো উদ্ভাবন করেছেন তাদের নিকট প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম শাস্ত্র বেদ, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা ও পুরাণ শাস্ত্রসমূহ অজ্ঞাত ছিল না।

www.nagorikpathagar.org

ষড় ধর্ম দর্শন

হিন্দু ষড় ধর্ম এবং দর্শন হল– (১) ন্যায় (২) বৈশেষিকা (৩) সাঙ্খ, (৪) যোগ, (৫) মিমাংসা, (৬) বেদান্ত। এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরণের বিশ্বাস আচার-অনুষ্ঠান পূজা অর্চনা রয়েছে। কোন কোনটির মধ্যে পারস্পরিক সঙ্গতি আছে। অন্যদিকে বৈপরীত্বও আছে। নানা মুণির নানা মতের সহাবস্থান লক্ষ্যণীয়।

মানব কল্পিত এবং মানব মস্তিষ্ক উদ্ভুত দর্শন চিন্তায় বৈপরীত্ব স্বাভাবিক। এ পদ্ধতিগুলোর কোনটিতে সব কিছুর উপরে এক মহান ঈশ্বরের ধারণা আছে। কোনোটি সম্পূর্ণ নিঃ ঈশ্বরবাদী। কোনটি বাস্তবমুখী। কোনটি ধর্মীয় ভাবাপন্ন।

গৌতম প্রণীত ন্যায় দর্শন

গৌতম মুণী প্রণীত "ন্যায় দর্শন" মতে মোক্ষ বা নাজাত লাভের জন্যে ঈশ্বরের তেমন কোন ভূমিকা নেই। ষোড়শ (১৬) পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করলে মোক্ষ লাভ হয়। ঈশ্বর থাকুক বা না থাকুক, তাতে কিছুই আসে যায় না। গৌতম ঋষি মনে হয় চিন্তাধারা ও দর্শন চিন্তায় আধুনিক চিন্তাবিদের ন্যায় অত্যন্ত প্রগতিশীল। তাঁর দর্শন তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন।

হিন্দু ধর্মের প্রথম– মতান্তরে প্রথম দার্শনিক পদ্ধতি হল ন্যায়। এই ন্যায় দর্শন হল দার্শনিক যুক্তিবাদ। ন্যায় দর্শনে বিশ্বকে বুঝার জন্য ১৬টি বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিষয়গুলোর উপরে গবেষণা করতে হবে। পরীক্ষা নীরিক্ষা চালাতে হবে। এ বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, সন্দেহ, ভ্রান্তি, মিথ্যা, যুক্তিবাদ (Sophism), তর্ক, অলংকার, দর্শন, ইত্যাদি।

ন্যায় বা যুক্তির কয়েকটি স্তর হল প্রাথমিক ধারণা, যৌক্তিক বিশ্লেষণ, উদাহরণ, প্রয়োগ, সিদ্ধান্ত। এ ন্যায় তত্ত্বের উদ্ভাবক হলেন গৌতম। বলা হয়েছে এ দার্শনিক তত্ত্বের বিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্যে উপনীত হওয়া যায় এবং পুর্নজন্মবাদের জড়াজাল থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

কনাদ ঋষি প্রণীত বৈশেষিকা দর্শন

দাক্ষিণাত্যের দার্শনিক কনাড কৈশ্যপকে বলা হয় বৈশেষিকা। তার দর্শন তত্ত্ব হলো আণবিক ও পারমাণবিক (Atomistic Reality)। কনাডো কৈশ্যপের মতে এই বিশ্বের সব কিছুর মূল হল অণু পরমাণু। সব কটি মানুষ, পশু, জীব-জন্তু, পশু-পাখি, বৃক্ষলতা ইত্যাদি অণু-পরমাণুর সৃষ্টি। এটা বিজ্ঞান প্রভাবিত আধুনিক ধর্মতত্ব। কে কোনটা হবে সেটা হবে তার ভাগ্য। অদৃষ্টের উপরে কারো হাত

www.nagorikpathagar.org

নেই। বাস্তবকে মেনে নিতে হবে। তা না হলে বিশ্বে শান্তি শৃঙ্খলা থাকবে না। কনাডো দর্শন তত্ত্বে পরম ব্রহ্মা বা পরম স্রষ্টার কোন স্থান নেই। এটা নিরিশ্বরবাদী দর্শন।

বিশ্বের অণু-পরমাণুকে বহুভাগে ভাগ করা যায়। কয়েকটি হচ্ছে (১) দ্রব্য, (২) গুণ, (৩) কর্ম, (৪) সমন্বয় বা ঐক্য, (৫) বিশেষ বা পার্থক্য, (৬) সমবায় বা ঐক্য। এ বিশ্ব সৃষ্টি বুঝতে হলে একেকটি ক্যাটিগরিতে বারবার জন্মের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করতে হবে।

কনাদ ঋষির মতে ৬টি বিষয়ে দর্শন জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করা হলে মোক্ষ বা শক্তি লাভ সম্ভব হয়। এর মাঝে কর্মের গুরুত্ব অধিক।

কপিল ঋষির শাঙ্খ দর্শন

কপিল ঋষির সাঙ্খ দর্শন নিরিশ্বরবাদী দর্শন। বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বর আছে অথবা নেই এরূপ কোন মতামত নেই। কপিল ঋষির শাঙ্খ দর্শন বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাবিত হিন্দুধর্ম।

ছয়টি হিন্দু দার্শনিক পদ্ধতির মধ্যে সাঙ্খ দর্শন হল নিগূঢ় এবং দুর্বোদ্ধ। পদ্ধতিগুলোর কোনোটি দার্শনিক চিন্তাধারা সংক্রান্ত কোনোটি আচার-আচরণমূলক।

শাঙ্খ শাস্ত্রের বা দর্শনের উৎস, উৎপত্তি কে বা কোথায় তা জানা যায় না। তবে চতুর্থ শতাব্দীতে ঈশ্বর শ্রী কৃষ্ণের রচিত একটি কবিতায় এর উৎস সন্ধান করা হয়। এ কবিতাটির মর্ম হলো– সব কিছুর একটি মূল আছে। মূল বা শুরু ছাড়া কিছুই হয় না। হ্যাঁ থেকে হ্যাঁ হয়। না থেকে না হয়। সেজন্য কোন কিছুর মূল সূত্র থাকতেই হবে। এ মূল সূত্রটি কি– তাতে মত পার্থক্য থাকতে পারে। এ মূল সূত্রটিকে প্রকৃতি বলা যেতে পারে। স্রষ্টা বা ঈশ্বরও বলা যেতে পারে।

যোগ দর্শন, পাতাঞ্জলী দর্শন

যোগ হল শাঙ্খ দর্শনের একটি শাখা। যোগ পদ্ধতির উদ্ভাবক হলেন চতুর্থ শতাব্দীর পাতাঞ্জলী। যোগের মধ্যে আছে শারীরিক অনুশীলন। শাঙ্খ দর্শনের বিষয়বস্তু মানসিক চিন্তা ও সাধনা। শাঙ্খ তত্ত্ব ঈমান জাতীয়। যোগতত্ত্বের সাথে সালাতের (নামাজের) শারীরিক ইবাদাতের মিল আছে।

যোগ প্রক্রিয়ায় হিন্দু শাস্ত্রে ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়। মুসলিম দর্শনে ঈমান প্রথম। নামাজ, রোযা, হজ্ব, যাকাত পরবর্তী আমল। হিন্দু দর্শনের একটি ব্যাখ্যায় প্রকৃতি বা মাতৃত্ব হলেন আদি সত্ত্বা।

www.nagorikpathagar.org

পুরুষত্ব, শারিরীক কসরত, যোগ, ব্যায়াম, ইত্যাদি হিন্দু ধর্মের অন্য সত্ত্বা অথবা দ্বিতীয় সত্ত্বা। প্রকৃতি এবং পুরুষের সাথে সংযুক্ত হয়েছে বিশ্ব আত্মা যা ঈশ্বর হিসাবে বিবেচিত। বিশ্ব আত্মা কল্পনার সাথে সাথে বিশ্ব আত্মার সাথে দৈহিক মিলনের প্রশ্নটি এসে যায়। বিশ্ব আত্মার সাথে মিলনের জন্য মানবাত্মার শারিরীক অঙ্গ ভঙ্গীর প্রয়োজন হয়। বর্তমান যোগ প্রক্রিয়া আরাধনা অথবা পূজা রূপ ধর্মীয় ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত।

মুসলিমদের আরাধনার মধ্যেও শারিরীক অঙ্গভঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। শাংখ্য গণনার সাথে তসবীহ পাঠেরও কিছুটা মিল আছে। শারীরিক শক্তি সংশ্লিষ্ট যোগ এর মাধ্যমে বিশ্ব প্রাণ ঈশ্বরের আবির্ভাব। ঈশ্বর প্রকৃতি অপেক্ষা অধিকতর প্রাণবন্ত। যোগ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হল ঈশ্বর বা বিশ্ব আত্মার সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং মিলন। এ বিশ্ব আত্মা চিরন্তন এবং সর্বত্র বিরাজিত।

বিশ্ব-আত্মা ঈশ্বর

বিশ্ব-আত্মা এবং ঈশ্বর শব্দদ্বয় দ্বারা একই সত্ত্বাকে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশ্ব আত্মার সাথে মিলনের পদ্ধতি হল দুটি। একটি মানসিক আর একটি শারীরিক। মানসিক পদ্ধতিটি হল ধ্যান এবং শারীরিক পদ্ধতিটি হল বিভিন্ন প্রকারের যোগ সাধনা, আসন এবং ব্যায়াম প্রক্রিয়া। ব্যায়ামগুলোর উদ্দেশ্য হল মানসিক একনিষ্ঠতা অর্জন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয় ভেদে যোগ প্রক্রিয়া বিভিন্ন নয়। সকলেরই যোগ প্রক্রিয়াগুলো একই। তবে বয়স-ভেদে ভিন্ন। স্বাস্থের জন্য যে শারীরিক ব্যায়াম, তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি মন-সংযোগ এবং ধর্মীয় চেতনা বা মূল্যবোধ থাকে না। ঈশ্বরের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য শারীরিক ব্যায়াম বা খেলাধুলা হয় না। তবে অত্যধিক যোগ প্রক্রিয়ায় শারীরিক কল্যাণও সাধিত হতে পারে।

পূর্ব মিমাংসা দর্শন/জেমিনী দর্শন

মিমাংসা বা সমাধান হল বেদ গ্রন্থ পাঠ ও বৈদিক সত্য উপলব্ধির বুদ্ধিবৃত্তিজাত একটি প্রক্রিয়া। এটি দার্শনিক গবেষণাও বলা যেতে পারে। ঈশ্বরকে পাওয়ার মাধ্যমে মানব জাতির সকল সমস্যার মিমাংসা বা সমাধান হয়।

মিমাংসা প্রায়োগিক দিক। অনেকটা ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠের অনুরূপ। ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠের মধ্যেই পূণ্য আছে। যেমন আছে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে। বেদ পাঠের মিমাংসা বা সমাধান পদ্ধতির মধ্যে জীবন সত্যে উপনীত হওয়ার একটি

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যাশা এবং উদ্দেশ্য থাকতে পারে। মিমাংসা হিসাবে যখন বেদ পাঠ করা হয়, তখন উদ্দেশ্য থাকে জীবন সমস্যার জবাব বা সমাধান খুঁজে পাওয়া।

পূর্ব 'মিমাংসা' ধর্মীয় জ্ঞান চর্চা এবং গবেষণা বলা যেতে পারে। মিমাংসা পদ্ধতিতে বেদ পাঠ হয়। মিমাংসার পূর্ব স্তর হলো পূর্ব মিমাংসা। এর অর্থ হল মানুষ বেদ পাঠের মাধ্যমে তাদের জীবন সমস্যার সমাধান খুঁজতে চেষ্টা করবে। তবে তা এমন সমাধান নয়– যা নতুন আবিষ্কার।

বরং, তা হবে পূর্ব মিমাংসা বা পূর্ব সত্য আবিষ্কার। জীব সত্ত্বা বা বৈশিষ্ট কি– তা ঈশ্বর পূর্বেই মিমাংসা করে রেখেছেন। এখন বেদ পাঠের মাধ্যমে সে মিমাংসাকে বা সিদ্ধান্তকে আবিষ্কার করতে হবে।

এ আবিষ্কারের একটি পদ্ধতি হল স্তুতি এবং মন্ত্র পাঠ। আর একটি হলো বেদের বাণীর মধ্যে যাদু মন্ত্র আবিষ্কার। যারা বেদ মন্ত্র পাঠ করবেন, তাতে বেদের মধ্যে যে প্রকৃত সত্য নিহিত আছে– সে বিশ্বাস সুদৃঢ় থাকতে হবে। বিশ্বাসে মিলে ঈশ্বর। তর্কে ঈশ্বর বহুদূর।

যারা কুরআনের সত্যতা বিশ্বাস করেন– কুরআন তিলাওয়াতে তাঁদের ফায়দা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা ধর্মীয় গ্রন্থের সত্যে বিশ্বাস করেন না, তারা ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করলে তাদের অবিশ্বাস আরো সুদৃঢ় হবে। অবিশ্বাসীদের ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করার সময় তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হবে ধর্মীয় গ্রন্থের মধ্যে ত্রুটি খুঁজে বের করা।

উত্তর মিমাংসা অথবা পূর্ব মিমাংসা– এ দু'টির একটিকে আরেকটির ব্যাখ্যাও বলা যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে পদ্ধতিগুলোর একটি আরেকটির পরিপূরক। অনেক ক্ষেত্রে একটি আরেকটির পরিপূরক নয় বরং বিপরীতমুখী। একটির সাথে আরেকটির সমন্বয় করা কঠিন।

বেদান্ত বা বাদসায়ন দর্শনঃ উত্তর মিমাংসা দর্শন

মিমাংসা পদ্ধতিতে বলা হয় বিশ্বাসে ঈশ্বর পাওয়া যায়। কিন্তু, তর্কে ঈশ্বর বহুদূরে পালিয়ে যায়। বেদ পাঠের মিমাংসা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন চতুর্থ শতাব্দীতে ঋষি জৈমীনি বা জ্যামিনী।

মিমাংসা পদ্ধতিতে ঈশ্বর আছে– এ বিশ্বাসটি তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া যাবে না। ঈশ্বর আছে এ বিশ্বাস নিয়ে বেদ পাঠ করতে হবে। যারা বেদ পাঠ করবেন তাদেরকে এ বিশ্বাস নিয়ে বেদ পাঠক মনে করতে হবে যে বেদের প্রত্যেকটি কথাই সত্য। বেদ পাঠের আনুগত্য সূচক এ পদ্ধতিকে বেদান্ত বলা হয়।

www.nagorikpathagar.org

তবে বেদান্ত এবং মিমাংসা পদ্ধতির মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। মিমাংসা পদ্ধতি বেদ পাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বেদান্তের মধ্যে পুরাণ চর্চাও অন্তর্ভূক্ত। বেদের অন্তে হল বেদান্ত। বেদের পাঠ এবং গবেষণা শেষ হয় মিমাংসায়। বেদ পরবর্তী ধর্মীয় গবেষণা শুরু হয় বেদান্তে। এজন্য বেদান্তকে মিমাংসা অথবা উত্তর মিমাংসা বলা হয়।

মিমাংসা উত্তর বা বেদান্ত গবেষণা চর্চা পদ্ধতির অন্যতম আবিষ্কারক হলেন– পঞ্চম শতাব্দীর বাদসায়ন। যেমন– বেদের পূর্ব মিমাংসা পদ্ধতি এর আবিষ্কারক ছিলেন জৈমিনী।

ঋষি বাদসায়ন পূর্ব মিমাংসা পদ্ধতিকেও উন্নয়ন করেন। পূর্ব মিমাংসা এবং উত্তর মিমাংসা বা বেদান্ত, ইত্যাদি পদ্ধতির উন্নয়নে আরো যাদের মূল্যবান অবদান ছিল তারা হলেন (১) শঙ্করাচার্য, (২) রামনুজ, (৩) মাধবা চার্য।

হিন্দু ষড় দর্শন দুর্বোধ্য এবং অপ্রয়োজনীয় জটিলতায় ভরপুর। হিন্দু ধর্ম কোন নবী রাসূল কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম নয়। বরং, তা মানব চিন্তা প্রসূত। ফলে একটির সাথে আরেকটি বিশ্বাসের সাদৃশ্য যেমন আছে বৈসাদৃশ্যও তেমন ব্যাপক।

নাযিলকৃত ধর্ম সমূহের মধ্যে ঐক্যের সুর ধ্বনিত হয়। হিন্দু ধর্মীয় দর্শনের সাথে ভারত বহির্ভুত চিন্তাধারার তেমন মিল নেই। এগুলো ভারতে উদ্ভুত এবং প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা কল্পনার ফসল। হিন্দু ধর্মে ঈশ্বর, দেবতা, মহা জাগতিক শক্তিগুলোর স্বীকৃতি এবং পরিত্রাণসূচক চিন্তাধারা আছে।

www.nagorikpathagar.org

৮ম অধ্যায়

২৬

হিন্দু জাতিভেদ প্রথা

হিন্দু ধর্মে জাতিভেদ প্রথার মূল উৎস হল ঋগবেদ। ঋগবেদের মতে স্রষ্টার এক চতুর্থাংশ প্রাণীকূল এবং তিন চতুর্থাংশ অমরকূল যা উর্ধ্বে স্থাপিত। এক চতুর্থাংশের মধ্যেই তিনি প্রাণী জগত ও প্রাণহীন বস্তুকে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

হিন্দু ধর্ম শাস্ত্র মতে সমগ্র মানব জাতি মূলত ৪টি বর্ণ বা শ্রেণী বা জাতিতে বিভক্ত। এ ৪টি বর্ণ কয়েক হাজার উপবর্ণ বা উপশ্রেণীতে বিভক্ত। এর মধ্যে ৪টি প্রধান বর্ণ– ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্র। এদের সকলের সৃষ্টি ভগবান ব্রহ্মের পবিত্র দেহ হতে। উচ্চতম বর্ণ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণগণই ধর্মশাস্ত্র বেদ এর যথাযথ উত্তরাধিকারী। তারাই হলো সৃষ্টির সেরা। ব্রাহ্মণগণ হল ধর্ম দেবতার অবতার।

বিশ্ব সম্পদের প্রাথমিক মালিক বা অধিকারী ব্রাহ্মণগণ। তাদের দয়া এবং আনুকূল্যে জীবন যাপন ও ধারণ করে অন্যান্য সৃষ্টিকুল। স্রষ্টা ব্রহ্মার মুখ মন্ডল থেকে উদগত হয়েছে– ব্রাহ্মণ জাতি (ঋগবেদ, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৯০)।

ব্রাহ্মণগণই প্রকৃতভাবে প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টি। ধর্মীয় অভিষেকের মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র পৈতা ধারণ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করা হয় (W.J. Wiklkins, Modern Hinduism, পৃঃ ২৩৯, London, 1975)।

ব্রাহ্মণদের মর্যাদা

ধর্মশাস্ত্র মনু স্মৃতিতে বলা হয়েছে ব্রাহ্মণদের মর্যাদা দেব মর্যাদার থেকে অধিক। মনু স্মৃতিতে বলা হয়েছে, "একজন ব্রাহ্মণ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যাই হোন না কেন, তিনি নিজেই একজন মহান দেবতা। ত্রিভূবন এবং এমন কি ঈশ্বরগণ স্বীয় অস্তিত্বের জন্য ঋণী থাকেন ব্রাহ্মণদের নিকট।"

'মনু স্মৃতি' শাস্ত্রে আরও বলা হয়েছে পবিত্র আইনের মূল সূত্র হল ব্রাহ্মণ। সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় সূত্র হিসাবে তিনি একজন দেবতা এবং তিনি দেবতাদেরও দেবতা। তার বাক্য হল মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক (Kilker, History of Caste; স্বামী, ধর্ম তীর্থ, History of Hindu Imperialism, পৃঃ ৩৭)।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে নেতৃত্বে এবং দায়িত্বের অধিকার একমাত্র ব্রাহ্মণদের। তবে অন্যরা ধর্মীয় ক্রিয়া কর্মে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা সম্বন্ধে

www.nagorikpathagar.org

বলা হয়- সমগ্র বিশ্ব ব্রাহ্মণদের মন্ত্রের ক্ষমতার অন্তর্ভূক্ত। মন্ত্র হল ব্রাহ্মণদের ক্ষমতার অন্তর্ভূক্ত। ব্রাহ্মণগণই হলেন ঈশ্বরের প্রতিভু (Wilkins, পৃঃ ২৪০, ১৯৭৫)।

কারো কারো মতে এ চার স্তরে জাতিভেদ প্রথা সৃষ্টি হয়েছে আর্যদের ভারতে আগমনের পর। আর্য ব্যবস্থায় শাসককুল ছিলেন অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়। তাদের সহায়তাকারী ছিলেন আইন প্রণেতা ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতবৃন্দ। ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষি কর্মে লিপ্ত ছিলেন বৈশ্যগণ। ভারতের আদিবাসীদেরকে উর্ধ্ব তিন শ্রেণীর সেবক বা শুদ্রতে পরিণত করা হয়। উপরোক্ত চারটি শ্রেণীকে বলা হত বর্ণ এবং প্রথাকে বলা হত বর্ণবাদ।

বর্ণ শব্দটির অর্থ হল রং। উচ্চবর্ণ বা রং ছিল আর্য ব্রাহ্মণদের শ্বেত বর্ণ। তাদের কাজ ছিল জ্ঞান-চর্চা, শিক্ষা, ত্যাগ, দিক-নির্দেশনা দান। ক্ষত্রিয়দের বর্ণ ছিল অনেকটা রক্তিম। তাদের কাজ ছিল জ্ঞান চর্চা, শাসনকর্মে সহায়তা, দেশ রক্ষা, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, অস্ত্রের ধারক ও বাহক হওয়া। পীত (হলুদ) বর্ণের বৈশ্যদের কাজ ছিল ব্যবসা বাণিজ্য, চাষাবাদ, পশু পালন, অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কর্ম।

ক্ষত্রীয়

ক্ষত্রীয়গণ হল বর্ণভেদ বা জাতিভেদ প্রথায় দ্বিতীয় স্তরের মনুষ্য। তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে ভগবান ব্রহ্মের বাহু যুগল থেকে (ঋগবেদ, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৯০)। তাদের কাজ হল রাজ্য শাসন ও রাজ্য রক্ষা করা। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা, বিচার করা। দুর্বৃত্ত এবং অপরাধীদের শাস্তি দেয়া। প্রত্যেক বর্ণ স্ব-স্ব দায়িত্ব যেন পালন করে– তা নিশ্চিত করা। এ কর্মে তারা নির্দেশিত হবে ব্রাহ্মণকুল কর্তৃক। সমাজের রাজা, মহারাজা, যোদ্ধা, সেনাপতি, প্রশাসক কর্তৃপক্ষ ক্ষত্রীয় শ্রেণী থেকে উদ্ভুত। (Jagannathan, p 56; Fazli, 145)

বর্তমান জীবন ও সমাজ ব্যবস্থায় যে কোন ব্যক্তি রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। সেনা বাহিনীতে বা পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করে দেশ রক্ষা বা দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা এবং শত্রুর হাত থেকে দেশ প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করতে পারে।

বৈশ্য

বৈশ্যগণ হল হিন্দু শাস্ত্র মতে মানব জাতির তৃতীয় বর্ণ বা শ্রেণী। তাদের সৃষ্টির উৎস হল– ব্রহ্মের উরুদ্বয় (ঋগবেদ, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৯০)। দেহের মধ্যে মুখমন্ডলের নীচে হল হস্তদ্বয়। আরো নিম্নে হলো উরুদ্বয়। সমাজে বৈশ্যদের অবস্থান হল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রীয়দের নিম্নে।

www.nagorikpathagar.org

বৈশ্য শ্রেণীর কাজ হল শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি কর্ম, গৃহপালিত পশু পালন। মানুষকে যেভাবে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রীয়দের অধিনস্ত হিসাবে তাদের তত্তাবধানে স্থাপন করা হয়েছে, অনুরূপভাবে সকল পশু-পাখীকে অধিনস্ত করা হয়েছে বৈশ্যদের (W.J. Wilkins, Modern Hiduism, p-247)।

বৈশ্যদের অবশ্যই উত্তম মানের শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং কৃষক হতে হবে। কারণ, তাদের সেবার উপর নির্ভর করে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ।

শুদ্র

বর্ণ বা জাতির মধ্যে শুদ্র হল সর্বনিম্ন জাতি। ভগবান ব্রহ্মের পদযুগল থেকে শুদ্রদের সৃষ্টি (ঋগবেদ, ১০ খণ্ড, পৃঃ ৯০)। শুদ্র বর্ণকে সৃষ্টি করা হয়েছে উচ্চতর তিন বর্ণের সেবার জন্য। তাদের কাজ হল উচ্চবর্ণের কল্যাণ এবং সন্তুষ্টির জন্য যে কোন কর্ম অথবা সর্বকর্ম সম্পাদন করা।

ভারতের আদিবাসী কৃষ্ণবর্ণের পরাজিত দ্রাবিড়দেরকে পরিণত করা হয় দাস শ্রেণীতে। তাদের কাজ ছিল উপরস্ত তিনটি বর্ণের লোকদের সেবা করা। এ চার বর্ণের লোকগণ তাদের জন্ম, বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান, সামাজিক অবস্থান, পেশা, আন্তবর্ণ বিভাগ, ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে ভাগ হতে হতে পঁচিশ শত বর্ণ বা জাতিতে বিভক্ত হয় (John A. Hardon, S.J. V-1 : Religions of the World, p-69)।

এ বর্ণভেদ এবং জাতি বিভাগের সাথে যুক্ত হয় পুনর্জন্ম তত্ব। এ তত্ত্ব নিম্ন স্ত রের জাতিদের সন্তোষ, সহনশীলতা ও সামাজিক প্রথার স্বীকৃতির জন্য প্রয়োজন ছিল। কৃষ্ণের দিকনির্দেশনা মূলক ভাগবত গীতা গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাধ্যমে ভারতের শাসক শ্রেণীকে বুঝাতে চেয়েছেন যে, শাসক শ্রেণীর কাজই হল যুদ্ধ করা এবং দেশ ও জাতি সমূহকে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার মধ্যে রাখা।

ভাগবত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাধ্যমে শাসককুলকে বলেন– তোমাদের জাত বা বর্ণের স্বধর্ম চিন্তা কর এবং সেভাবে কর্ম সম্পাদন কর। একজন ক্ষত্রীয়ের জন্য ধর্ম যুদ্ধ অপেক্ষা পবিত্রতম এবং সঙ্গততর কি আর কিছু হতে পারে? সুসংবাদ ক্ষত্রিয়দের জন্য। তাদের জন্যে সৌভাগ্য হিসাবে এসেছে এ কুরুক্ষেত্রে মহাসমর। এটাই হল তাদের জন্য স্বর্গদ্বার।

হে অর্জুন! যদি তুমি এ যুদ্ধ থেকে বিরত হও, তবে তুমি তোমার পবিত্র দায়িত্বে অবহেলা করবে। নিজেকে কলংকিত করবে এবং স্বীয় পাপের মধ্যে বর্ষণ করবে ঘৃণা এবং নিন্দা। একজন সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন মানুষের জন্য এটা মৃত্যুদন্ড অপেক্ষা কলংকজনক অবমাননা। (ভাগবত গীতা, পৃষ্ঠা-৩১-৩৪)।

www.nagorikpathagar.org

মানব জাতি গোষ্ঠির মধ্যে শুদ্রগণ হল সেবক এবং দাস শ্রেণীভুক্ত। তার দেহ, তার সম্পত্তি এবং তার সর্বস্ব ধর্মতঃ উচ্চবর্ণের সেবার জন্য নিবেদিত (W.J. Wilkins, Modern Hinduism, London, 1975)।

জাতিভেদ হয়ত ঈশ্বর প্রদত্ত বিধিবিধান নয়। এটা মানুষের সৃষ্টি। মহাভারত পূর্ব যুগে হিন্দুদের পরবর্তীকালে প্রবর্তিত জাতিভেদ প্রথা ছিল না। মহাভারত শান্তি পর্বের ৩৮৮ অধ্যায়ের একটি শ্লোক নিম্নরূপ– এ বিশেচু হস্তি বর্ণনাং স্বরবং ব্রম্মামিধং– জগত" অর্থ হল বিশ্বের সব কিছুই ব্রহ্মময়। আদিতে বর্ণ বলতে কিছু ছিল না। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ও বর্ণভেদ এবং বৈষম্য প্রয়োজনের তাগিদে পরবর্তীতে সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রী-মদ ভাগবদ গীতার একটি শ্লোক মহা প্রভু শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। শ্লোকটি নিম্নরূপ– "চতুরবর্ণ– ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম বিভাগশঃ" (শ্রী-মদ ভাগবদ গীতাঃ ৩ অধ্যায়, ১৩ শ্লোক, ৯৯ পৃষ্ঠা)। এ শ্লোকটির অর্থ– গুণ এবং কর্ম অনুযায়ী আমি চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছি"। এ চারটি বর্ণ হলো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য, শুদ্র।

বর্ণ শব্দটি সংস্কৃত বৃ-ধাতু থেকে নিস্পন্ন। বৃ-ধাতুর অর্থ বরণ করা। সেকালে নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী, বিশেষ করে গুণগত যোগ্যতার ভিত্তিতে লোকজন নিজেই নিজের কাজ বরণ করে নিতেন। এ বর্ণ বিভাগের ভিত্তি ছিলো কর্ম বিভাগ। যেহেতু ব্যক্তি নিজেই নিজের কর্ম বরাদ্ধ করে নিতেন, তাই এ কর্ম বিভাগটি বর্ণ বিভাগ নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীতে এ কর্ম বিভাগই জন্মগতভাবে বর্ণ ও জাতিগত বিভাগ হিসেবে স্বীকৃত হয়।

অস্পৃশ্য বর্ণ

মানব জাতির চারি বর্ণের নিম্নে রয়েছে অস্পৃশ্যগণ। এদের দেহের ছায়া যদি উচ্চবর্ণের বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের উপরে পতিত হয়, তবে ব্রাহ্মণদের দেহ অপবিত্র হয়ে যায় এবং তাদেরকে পবিত্র হতে হলে পবিত্র গঙ্গা নদীর জল তাদের উপর ছিটিয়ে দিতে হবে (F.M. Sandeela, Islam, Christianity and Hinduism, Delhi, 1990, pp-69-70)। যদি গঙ্গা নদীর জল সংগ্রহ করা না যায়, তবে অন্তত অন্য উৎসের পবিত্র জলে স্নান করতে হবে। এ অস্পৃশ্যদের মধ্যে হরিজনও অন্তর্ভুক্ত।

পূণ্যাত্মা গান্ধী

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী অস্পৃশ্যদেরকে একটি সম্মানজনক পরিভাষাগত নাম দিয়েছেন। তিনি তাদের বলেছেন হরিজন। হরি শব্দের অর্থ ঈশ্বর। মহাত্মা

www.nagorikpathagar.org

গান্ধীর দৃষ্টিতে অস্পৃশ্যগণ হল হরি বা ঈশ্বরের সন্তান। মহাত্মা গান্ধী অর্পিত এ নাম অস্পৃশ্যগণ মেনে নেননি।

কারণ, তাদের ধারণা মতে মহাত্মা গান্ধী তাদেরকে হরিজন বললেও উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ তাদেরকে তা মনে করেন না। তদুপরি সংস্কৃত ভাষায় হরিজন শব্দের অর্থ অবৈধ বা জারজ সন্তান (V.T. Rajshekar, Dalit, The Black Untouchables of India, Bangalor, 1979, p-53)।

দলিত

অস্পৃশ্যগণ তাদের নিজেদের জন্য আর একটি শব্দ অবলম্বন করেছেন। এ শব্দটি হল "দলিত"। কাউকে পদাঘাত করাকে বলা হয় পদদলিত করা। উচ্চ তিন বর্ণ কর্তৃক পদাঘাতে অস্পৃশ্য শ্রেণী দলিত, মথিত হয়। তাই তারা তাদের প্রতি রূঢ় আচরণের প্রতিফলন হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেয়ার জন্য "দলিত" শব্দটি ব্যবহার করেন।

দলিতগণ হলেন সমাজচ্যুত ও দাসসুলভ। তাদেরকে উচ্চবর্ণের লোকেরা তাদের সেবার জন্য সৃষ্টি হয়েছে বলেই মনে করে থাকেন। (V.T. Rajshekar, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৩)।

V.T. Rajashekor এর ভাষায়- "আপনারা গৃহে গরু এবং কুকুর পালন করতে পারেন। আপনারা গো-মূত্র পান এবং গোবর ভক্ষণ করে পাপের প্রায়শ্চিত্য করতে পারেন। কিন্তু আপনারা কখনো আদিবাসি দ্রাবিড়ের সংস্পর্শে আসতে ধর্মত পারেন না।"

তাদেরকে এখনও স্কুল কলেজ থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। মন্দিরের দ্বার তাদের জন্য বন্দ করে রাখা হয়। কারণ, তারা পিশাচসম। দ্রাবিড়গণ সংসর্গের অনুপযুক্ত। এমনকি, রাস্তায় চলাচলের জন্য, মৃতদেহ সৎকারের জন্য উচ্চবর্ণের প্রতিবেশীদের করুণার উপর নির্ভরশীল হতে হয় (Swami Dharma Theertha, History of Hindu Imperialism, Madras, 1992, pp-184-85)।

অনেকের মতে হিন্দু সামাজিক পদ্ধতি অতি নির্যাতনমূলক, অমানবিক এবং বর্বর। বিশেষ করে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রতি উচ্চবর্ণের মানুষের আচরণ অত্যন্ত নিষ্ঠুর। হিন্দু ধর্মের সামাজিক প্রথার কারণে বহু জ্ঞানী, গুণী এবং বিদগ্ধ ব্যক্তিগণও হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করছেন। তাদের একজন হলেন ড. বি. আর. আম্বেদকর।

ভারতীয় সংবিধান প্রণয়নে ড. বি. আর. আম্বেদকরের অবদানের জন্য তিনি স্বাধীন ভারতের সংবিধানের 'জনক' হিসাবে গণ্য। হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তাঁর বহু

www.nagorikpathagar.org

উদ্ধৃতির মধ্যে একটি নিম্নরূপ ঃ আমার বিবেকের কাছে হিন্দু ধর্মীয় তত্ত্বের কোন আবেদন নেই। আমার আত্মসম্মানবোধ হিন্দুত্বকে আত্মস্থ করতে পারে না। যে ধর্ম আপনাদেরকে মানুষ হিসেবে গণ্য করে না, অথবা পান করার জন্য জলদান পূণ্য কর্ম হিসাবে মনে করে না অথবা আপনাকে মন্দিরে প্রবেশে অনুমতি দেয় না, তা ধর্ম হিসাবে গণ্য হতে পারে না। যে ধর্ম তার অনুসারীদেরকে পশুর স্পর্শ নিষিদ্ধ করে না, অথচ নিম্নবর্ণের মানব সন্তানের স্পর্শ সহ্য করতে পারে না– এটা ধর্ম হিসেবে গণ্য হতে পারে না, বিবেচিত হতে পারে তামাশা হিসাবে The Times of India, May 23, 1994)।

২৭
হিন্দু ধর্মে উপদল

শাক্ত, বৈষ্ণব, লিঙ্গায়েত– এ তিনটি) দল-উপদল (Sects ছাড়াও বহু জাতীয় আঞ্চলিক প্রাদেশিক সংস্থা ক্রমশ গড়ে ওঠে। তারা নতুন কোন তন্ত্র আবিষ্কার করেননি বরং প্রাচীন তন্ত্রগুলোকে অনুসরণ করেন। ক্ষেত্র বিশেষে এদের মধ্যে সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়।

তন্ত্র ও তান্ত্রিক

তন্ত্র হিন্দু ধর্মের একটি প্রধান বিশ্বাস এবং দর্শন তত্ত্ব । এটা হলো পুরাণ শাস্ত্রভিত্তিক এবং পৌরাণিক কাহিনীর গূঢ় রহস্য বিশ্লেষণ এবং পৌরাণিক কাহিনী সংক্রান্ত বিদ্যা বা বিজ্ঞান। এর মধ্যে দর্শন আছে। ধর্মীয় রহস্য আছে যা বুঝা যায় না। অথবা যেমন ইচ্ছা তেমন বুঝা যায়। এ শাস্ত্রটিকে বলা হয় তন্ত্র শাস্ত্র। তন্ত্র শাস্ত্রের উদ্দেশ্য অত্যন্ত মহৎ। এর উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের সাথে মিলন।

এটা ছাড়াও তন্ত্র শাস্ত্রে বহু পার্থিব লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আছে– যা অতি বাস্তব এবং প্রয়োজনীয়। তাই তন্ত্র শাস্ত্র ও তান্ত্রিক জ্ঞানী ব্যক্তি হিন্দু ইতিহাসে সমাদৃত। এর উদ্ভব সপ্তম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত।

তন্ত্র শাস্ত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যে আছে জীবন সাফল্য ও ব্যর্থতা, প্রেমে সাফল্য ও ব্যর্থতা, ব্যবসায় সাফল্য ও ব্যর্থতা, রোগ প্রতিরোধ, শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় ও পরাজয়– এরূপ অত্যন্ত বাস্তব ও প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ। তাই তন্ত্র শাস্ত্র এবং তন্ত্র শাস্ত্রবিদ এবং তান্ত্রিক হিন্দু সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

তন্ত্র শাস্ত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যে আছে যাদু, টোনা, সম্মোহন, মায়া, ডাকিনী বিদ্যা, মোহিনী বিদ্যা– এরূপ আরো অনেক কিছু। তন্ত্র বিদ্যার অন্তর্ভূক্ত আছে চরম ত্যাগ, বৈরাগ্য, ক্ষুধা, বিজয়, সংযম, সহনশীলতা, প্রাণী-বলী, নরবলী, উদ্যামতা, যৌনতা, বহুগামীতা, বহু মন্ত্র, তন্ত্র, কুসংস্কার, শরীর পাতন, হিংসা,

www.nagorikpathagar.org

প্রতিহিংসা, আরো অনেক কিছু। এ সব বিদ্যা চর্চা ও অর্জনের মাধ্যমে অতিস্বাভাবিক শক্তি অর্জিত হয়।

তন্ত্র শাস্ত্রের উৎস হল– মহাদেব শিব এবং তার প্রণয়ী কালী। দেবীর প্রেম ভালবাসা, আলাপ আলোচনা, উপদেশ, নিষেধ ইত্যাদি। শিব এবং কালীর (পার্বতী) মধ্যে প্রেমলীলা ও প্রণয় কাহিনী বিভিন্ন ঘটনার সাথে তন্ত্র শাস্ত্রে সংশ্লিষ্ট। শিব এবং পার্বতীর প্রণয়, মানব এবং জীব জগতের উৎস ও প্রসারের ভিত্তি। যৌনতার আকর্ষণ শক্তি এবং প্রতিক্রিয়া অপরিসীম। এটাই সমগ্র জীব জগত এবং প্রাণী জগতের মূল উৎস।

নরবলী

ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে নরবলী ছিল অস্বাভাবিক বা অতি স্বাভাবিক শক্তি এবং সাফল্যের একটি প্রধান মাধ্যম। এর চর্চা করতেন কাপালিকবৃন্দ। তারা শিশুদের অর্থের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করতেন, অপহরণ করতেন এবং প্রতিপালন করতেন। শুভলগ্নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্য ও সৌভাগ্যের জন্য বলীদান করা হত। এর মাধ্যমে শিব এবং কালীর প্রসন্নতা অর্জিত হত।

কালীর পছন্দনীয় ছিল রক্ত এবং শিবের পছন্দনীয় ছিল নরমুন্ডের মালা। স্বেচ্ছাকৃত নরবলী প্রথাও প্রচলিত ছিল। যেমন ছিল সতীদাহ প্রথা। তান্ত্রিক পদ্ধতিতে যাদুবিদ্যার মাধ্যমে অসাধারণ সাফল্যের কাহিনী প্রচলিত এবং বিশ্বাস এখনো মযবুত।

শিব পূজারী শাক্ত

তান্ত্রিকের অপর নাম শাক্ত। শিবের একটি গুণ শক্তি। যারা শিব শক্তির পূজা করে তাদেরকে বলা হয় শাক্ত। শক্তিপূজা হল বিশেষ ধরণের জনেন্দ্রীয় পূজা। যা লিঙ্গ ও যোনীপূজা নামেও খ্যাত।

সর্বপ্রকার যৌন শক্তির শীর্ষে আছেন দেবী উমা, দেবী পার্বতী এবং দেবী কালীর স্বামী শিব মহেশ্বর। তিনি হলেন সর্বপ্রকার যৌন শক্তির উৎস।

যৌন শক্তি জন্মবাদের উৎস। শিব দেহের বাম অংশে আছে নারীর স্তন এবং ডান অংশে আছে যৌনাঙ্গ। শিব শুধু নর যৌনতার উৎসই নয়। তিনি নারী যৌনতারও উৎস।

শিব পূজারী শাক্তদের ডান অংশীয়দেরকে বলা হয় দক্ষিণাচারী এবং বাম অংশীয়দেরকে বলা হয় বামাচারী। বামাচারীগণের বিশেষ এবং গুপ্ত বা রহস্যসূচক পূর্জা পদ্ধতি আছে। তারা চন্দ্রাকারে মধ্য রাতে মিলিত হয়। তাদের পূজা আচারের মধ্যে পাঁচটি 'ম' আছে। এগুলো হল পঞ্চ মকর যেমন– মদ্য, মাংস, মৎস, মুদ্রা (ভাজা শস্য), মৈথুন (সঙ্গম)।

www.nagorikpathagar.org

তান্ত্রিক পূজার মাধ্যমে সর্ব বস্ত্র মুক্ত এবং উলঙ্গ একটি সুন্দরী যুবতীকে পূজা করা হয়। যদি তেমন যুবতী না পাওয়া যায়, তবে নারী (যোনীর) অঙ্গের একটি চিত্র নয়টি নারী যোনীর চিত্রের মধ্যে স্থাপন করা হয়। এরপর ভক্তগণ পানোমত্ত নৃত্যে লিপ্ত হয়। যারা এ তান্ত্রিক দলের সদস্য হয় তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ভেদাভেদ লুপ্ত হয় এবং তারা বিশেষ শক্তি সম্পন্ন হিসাবে গণ্য হয়।

বৈষ্ণব

বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর অনুসারী। তারা শাক্ত এবং লিঙ্গায়েতগণ থেকে ভিন্ন। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর ভালবাসা, ক্ষমা এবং দয়ায় বিশ্বাস করেন। তারা শাক্তদের ন্যায় শক্তি পূজারী নন। সাধারণ হিন্দুদের কাছে তাদের আবেদন অধিকতর।

বিষ্ণুর অবতার হিসাবে বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ পূজারী। বৈষ্ণবদের প্রেরণায় এবং নেতৃত্বে সমগ্র ভারতে ভক্তি আন্দোলন প্রসারিত হয়।

লিঙ্গায়েত

লিঙ্গায়েতগণ হল একটি শিব লিঙ্গ পূজারী সম্প্রদায়। লিঙ্গায়েতগণ শিব লিঙ্গের পূজায় বিশ্বাসী। তারা তাদের সঙ্গে সব সময় সাজি-মাটি (Soap Stone) এবং শিব লিঙ্গ বহন করেন। এই শিব লিঙ্গ একটি লাল রুমালে লিঙ্গায়েতগণ বেঁধে রাখেন। এ পাথর তারা কখনো নিজের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেন না।

লিঙ্গায়েতগণ শিব ছাড়া অন্য কোন দেবতায় বিশ্বাস করেন না। তাঁরা জাতিভেদ, বর্ণবাদ বা কাস্ট সিষ্টেম প্রত্যাখ্যান করেন। ব্রাহ্মণদেরকে তারা অন্যান্য হিন্দুদের থেকে উচ্চ স্তরের মনে করেন না। তাদের মতে নারী এবং পুরুষ সমস্তরের।

২৮

হিন্দু ধর্মের সংস্কার আন্দোলন

হিন্দুধর্মের উন্নয়ন এবং উৎকর্ষ সাধনে উত্তর ভারত বা আর্যাবর্তের ঋষিদের অবদানই ছিল বেশী। কিন্তু বেদান্ত অর্থাৎ বেদ এর পরবর্তী পদ্ধতির উন্নয়ন বা সংস্কারে যে তিনজন মহা ঋষি (শঙ্করাচার্য, রামনুজ ও মাধব) অবদান রাখেন– তাঁরা তিনজনেই হলেন দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী। এই তিন জনের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান হলেন শঙ্করাচার্য। তাঁর বিশেষ অবদান ছিল মহাভারতের অংশ গীতার ভাষ্য উন্নয়নে।

শঙ্করাচার্য হলেন অদ্বৈতবাদের সমর্থক। তার এ অদ্বৈতবাদকে বলা হয় অদ্বৈত বেদান্ত। তাঁর এ বেদান্ত চর্চার একটি বৈশিষ্ট্য একেশ্বর বাদের ধারণা। তিনি মনে করেন পরম এবং চরম সত্য হল এক এবং অদ্বিতীয়। তাকে ইসলামী দর্শনের ঈমাম গাজ্জালী এবং খৃষ্টধর্মের থোমাস একুইনাস (Thomas Aquinas) এর

www.nagorikpathagar.org

সাথে তুলনা করা হয়। শঙ্করাচার্যের মতে চুড়ান্ত বাস্তবতা হল ব্রহ্ম এবং চুড়ান্ত বাস্তবতা তুলনাবিহীন। ব্রহ্মই সব কিছুর ভিত্তি।

রামানুজ এবং মাধব

শঙ্করাচার্যের সাথে পরবর্তীকালের রামানুজ এবং মাধব আচার্যের কিছুটা পার্থক্য আছে। তারাও অদ্বৈত্যবাদে বিশ্বাসী কিন্তু শঙ্করাচার্যের মত বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদে নন। রামানুজের মতে পরম প্রিয় ঈশ্বর সব কিছু উৎপাদন করে প্রতিপালন করেন এবং সর্বশেষে তার সৃষ্টির সাথে মিশে যান। অর্থাৎ সব কিছুর একটি শেষ আছে।

মাধব আচার্য ছিলেন মধ্য যুগের (ত্রয়োদশ শতাব্দী) ঋষি। হিন্দু ধর্মের একটি শিক্ষা হল পরম স্রষ্টা এবং সৃষ্টি অবিচ্ছেদ্য। অর্থাৎ সৃষ্টি হল স্রষ্টারই অংশ। এ ধারণার সাথে ইসলামের মিল নেই।

মাধব আচার্য সৃষ্টিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন। এক ভাগ তার পূণ্যকর্মের মাধ্যমে স্বর্গে স্রষ্টার সাথে মিলিত হবেন এবং চিরন্তন সুখের অংশীদার হবেন। তাঁর এই ধারণার সঙ্গে ইসলামের মিল আছে। যারা এ জন্মে ভালো কাজ করবেন তারা জান্নাতী হবেন এবং আল্লাহুর সাথে মিলে যাবেন। আরেকজন তাদের পাপের শাস্তি পেয়ে সীমাহীনকাল জাহান্নামে থেকে শাস্তির মেয়াদ শেষে জান্নাতে স্রষ্টার সাথে মিলিত হবেন। আরেকজন জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে।

মাধব আচার্য মনে করেন, এক দল চিরস্থায়ীভাবে অনন্তকাল নরকে শাস্তি পাবে। আরেক দল তাদের কর্মফল অনুসারে পুনর্জন্ম লাভ করে এ বিশ্বে আবির্ভূত হবেন। কখনও ব্রাহ্মণ হিসাবে, কখনও কুকুর, বিড়াল হিসাবে। কখনও পোকা-মাকড় হিসাবে। এরপর তাদের শাস্তির মেয়াদ শেষে তারা স্বর্গে যাবেন। তারা তৃতীয় দলে (প্রথম পর্যায়ে নয়) স্বর্গবাসী হয়ে যাবেন।

মাধবাচার্যের দর্শনে ঈশ্বরের এক পুত্র কল্পনা করা হয়েছে। পরমেশ্বর হলেন বিষ্ণু, তার পুত্র হল বায়ু যেমন খৃষ্টধর্মে গড হলেন ঈশ্বর। যীশুখৃষ্ট হলেন তাঁর পুত্র। যারা যীশু খৃষ্টকে বিশ্বাস করেন, তারা তার করুণায় স্বর্গবাসী হবেন। অনুরূপভাবে বিষ্ণু পুত্র বায়ুর সুপারিশ যারা পাবেন, তারা স্বর্গবাসী হবেন। মাধব আচার্যের অনুসারীগণ মাধবকেই বায়ুর অবতার মনে করেন।

সংস্কার আন্দোলনগুলো নতুন সংযোগ বা সংযুক্তি পরিহারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনটি সংস্কার আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব হলো রামকৃষ্ণ আন্দোলন, আর্য সমাজ এবং ব্রহ্ম সমাজ।

www.nagorikpathagar.org

রামকৃষ্ণ আন্দোলন

বাঙ্গালী শিব দার্শনিক গদাধর চ্যাটার্জী (১৮৩৬-১৮৮৬ খৃঃ) এর নেতৃত্বে স্থাপিত হয় রামকৃষ্ণ মিশন আন্দোলন। তিনি কালীপূজা ভিত্তিক সংস্কার আন্দোলন শুরু করে রামকৃষ্ণ নাম ধারণ করেন।

গদাধর চ্যাটার্জী ছিলেন মূলত কলকাতার নিকটে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের একজন পুরোহিত। তিনি মোহাবিষ্ট অবস্থায় এবং জাগ্রত অবস্থায় দেবী কালী পার্বতীর সাক্ষাত লাভ করেন এবং রামকৃষ্ণ মিশন আন্দোলন শুরু করেন। রামকৃষ্ণ মূলতঃ ছিলেন একজন বেদান্ত ধর্মবিদ এবং দার্শনিক। ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের জন্য তিনি বিভিন্ন পদ্ধতির উল্লেখ করেন। এর মধ্যে সর্বোত্তম ছিল মানব সেবা।

ত্যাগী রহস্য পুরুষ হিসাবে তার সুখ্যতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার অনুসারীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ অনুসারীদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন শ্রী বিবেকানন্দ। তিনি ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ পন্ডিত, লেখক এবং বক্তা। তাঁর মাধ্যমে পাশ্চাত্যে হিন্দু ধর্ম প্রচারিত হয়। দেশে বিদেশে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হয়। এরা স্কুল এবং হসপিটালও স্থাপন করেন। বিবেকানন্দ যেভাবে হিন্দু মিষ্টিসিজম বা রহস্যবাদ প্রচার করেন, তার মাধ্যমে প্রভাবিত পাশ্চাত্য লেখকদের মধ্যে ছিলেন ফরাসী লেখক রোমা রোলা (Romain Rolland). রোমা রোলা বিবেকানন্দের আদর্শ সম্পর্কে প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করেন।

আর্যসমাজ

আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩ খ্রীঃ)। তিনি মুম্বাই (বুম্বাই) শহরে ১৮৭৫ খ্রীঃ আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। আর্যসমাজ ছিল একটি সংস্কার আন্দোলন। দয়ানন্দ সরস্বতির মতে বহু অপবিত্র প্রথা হিন্দু ধর্মকে কলুষিত করেছিল। তাই এ কলুষিতা দূর করে হিন্দুধর্ম ও সমাজকে পবিত্র করণ প্রয়োজন। তার আন্দোলনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। বেদ গ্রন্থ সমূহে মূর্তি পূজার কোন অনুমোদন নেই। তিনি হিন্দুদেরকে প্রাচীন বেদে প্রত্যাবর্তনের আবেদন জানান।

দয়ানন্দ সরস্বতী হিন্দুদের চারবর্ণ প্রথা বিরোধিতা করতেন এবং বিধবা বিবাহ সমর্থন করতেন। তিনি মুসলিম এবং খৃষ্টানদের ন্যায় জামাতে নামায বা গীর্জায় সমষ্টিগত আরাধনার ন্যায় সমষ্টিগত পূজা অর্চনায় বিশ্বাস করতেন এবং তা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। দেশে এবং বিদেশে আর্য সমাজের বহু শাখা স্থাপিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

শুদ্ধি আন্দোলন

আর্য সমাজের একটি প্রধান কর্ম ছিল শুদ্ধি আন্দোলন। এ শুদ্ধি আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল হিন্দুদের মধ্যে যারা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম এবং খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন তাদেরকে প্রায়শ্চিত্যের মাধ্যমে শুদ্ধ করে হিন্দু ধর্মে পুন দীক্ষিত করা।

মুসলিমদের প্রতি হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত আক্রমণাত্মক। যে কোন প্রকারে ইসলাম ধর্ম প্রচারে বাধা দেয়া ছিল আর্যদের লক্ষ্য। তারা হিন্দুদেরকে সমকালীন আচার অনুষ্ঠান ত্যাগ করে সনাতন হিন্দু ধর্মে প্রত্যাবর্তনের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

ব্রাহ্ম সমাজ

পাশ্চাত্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে যারা হিন্দু ধর্ম সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যমণি ছিলেন বাঙ্গালী হিন্দু রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ খ্রীঃ)। তার প্রতিষ্ঠিত সংস্থার নাম ছিল ব্রাহ্ম সমাজ। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন বহু ভাষাবিদ। তিনি বাংলা, ইংরেজী, হিন্দি, সংস্কৃত, আরবী এবং ফরাসী ভাষায় সুদক্ষ ছিলেন।

বৈদিক ধর্মে মূর্তি পূজা ছিল না। বহু দেবতার পরিবর্তে এক ঈশ্বরবাদে রামমোহন রায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বৈদিক যুগের পরে যে সমস্ত অযৌক্তিক কুসংস্কার হিন্দু ধর্মে প্রবেশ করেছিল সেগুলো প্রত্যাখ্যান এবং পরিত্যাগ করে সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রবর্তনের আবেদন জানান।

রাজা রামমোহন রায় এক ঈশ্বরবাদের সমর্থনে পুস্তক রচনা করেন। তাঁর আন্দোলন জোরদার হওয়ার পূর্বেই ৫৯ বছর বয়সে তিনি লন্ডনে মৃত্যু বরণ করেন। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শে পরিবর্তন আসে। কারণ, বেদে মূর্তি পূজা ছিল না বটে। কিন্তু একাধিক দেবতা– যেমন ব্রাহ্ম, বিষ্ণু, শিব এর স্বীকৃতি ছিল। তাই রামমোহন রায়ের অনুসারীগণ বহু ঈশ্বরবাদের পূজায় ফিরে যান।

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃত্বে আসীন হন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁরা ব্রাহ্ম সমাজের বিশ্বাসে বহু পরিবর্তন আনয়ন করেন।

ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসে অবহিত হওয়ায় আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা সর্বশক্তিমান এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। অবতারবাদ প্রত্যাখ্যান করেন। তবে তাঁরা আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। অনুশোচনা ও সৎকর্মের মাধ্যমে অমরাত্মার মুক্তিই ছিল তাঁদের লক্ষ্য।

পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম সমাজ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগের নাম হয় আদি (মূল) ব্রাহ্ম সমাজ। অপর ভাগের নাম হয় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ। এক ভাগের নেতৃত্ব দেন বাংলার কেশব চন্দ্র সেন।

www.nagorikpathagar.org

যেহেতু ব্রাহ্ম সমাজিগণ হিন্দু ধর্মের মৌলিক সংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরা বৃহত্তর হিন্দু সমাজের সমর্থন পাননি। সনাতন হিন্দুগণ তাদেরকে দল ত্যাগী বা ধর্ম ত্যাগী মনে করতেন। ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব ক্রমশ বিলোপ পায়। সংস্থাটি নাম মাত্র অস্তিত্বে বিরাজ করে।

শ্রী অরবিন্দের শ্রীকৃষ্ণ আন্দোলন

শ্রী অরবিন্দ ছিলেন একজন শ্রীকৃষ্ণ পন্থী বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী। অল্প বয়সে তিনি লন্ডনে চলে যান। বাংলা অপেক্ষা ইংরেজীতে অধিকতর পান্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস চাকরীতে যোগদানের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। লন্ডন থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি প্রথমে ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী। পরবর্তীতে সন্ত্রাসবাদী। তাঁর লক্ষ্য ছিল সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন। সন্ত্রাসীবাদ আন্দোলনে সুবিধা করতে না পেরে তিনি ফরাসী কলোনী পন্ডিচেরীতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন।

এ পর্যায়ে তিনি সন্ত্রাসবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সন্ন্যাসবাদ (Mysticism) এ দীক্ষা লাভ করেন। Mysticism একটি রহস্যমূলক অলৌকিক গূঢ় অর্থপূর্ণ অতিন্দ্রীয় আন্দোলন। এর অনুসারীগণ স্রষ্টার সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনে বিশ্বাস করেন।

শ্রী অরবিন্দের অতিন্দ্রীয় আন্দোলনের একটি মাধ্যম ছিল হিন্দু যোগ পদ্ধতি। তিনি ফরাসী কলোনী পন্ডীচেরীতে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণের মাধ্যমে শ্রী অরবিন্দ ঈশ্বরের সাথে সংযোগে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি আধুনিক মনের কাছে গ্রহণযোগ্য যুক্তি এবং দর্শনের মাধ্যমে গীতা চর্চা দীক্ষা দিতেন। তাঁর অনুসারীগণ ছিলেন আধুনিক এবং যুক্তিবাদী। শ্রী অরবিন্দের আকর্ষণে কয়েকজন ইংরেজ এবং একজন ফরাসী মহিলা হিন্দু তত্ত্ব এবং দর্শন গ্রহণ করে।

শ্রী অরবিন্দ হিন্দু ধর্মের পরম পুরুষতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। এ তত্ত্বের মূল কথা সৃষ্টির আদিতে এবং ঈশ্বরে ফিরে যেতে হবে। আরাধনা, তপস্যা এবং সর্ব বস্তুর আকর্ষণ মুক্ত হয়ে মহান স্রষ্টাকে পাওয়া যায়। এই পরম স্রষ্টা ইসলাম ধর্মের আল্লাহ্ এবং খৃষ্টান ধর্মের গড থেকে একটু ভিন্নতর।

ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্মে ফিরিস্তা বা এঞ্জেল এ বিশ্বাস করা হয়। তারা হল স্রষ্টার বাণী বাহক। তাদের নিজস্ব কোন শক্তি নেই। শ্রী অরবিন্দু বিশ্বাস করতেন যে, এ ফিরিস্তা বা এঞ্জেলিক সত্ত্বাসমূহ শুধু বাণী বাহক নন এবং শুধু স্রষ্টার কর্মচারী নন। বরং, তারা নিজেরাও শক্তিধর, যা দেবতাদের বৈশিষ্ট। তিনি শিব দেবতা এবং কালীতে বিশ্বাস করতেন । যেহেতু তারা সৃষ্টি শক্তির উৎস।

www.nagorikpathagar.org

৯ম অধ্যায়

২৯

মানব জাতির চার পর্যায়

হযরত আদম (আ.) থেকে মানব জাতির ইতিহাস শুরু। বিবর্তনবাদীগণ ধারণা করেন যে, বানর জাতি থেকে মানবের উত্তরণ হয়েছে। যারা ধর্মহীন তারা হলেন ডারউইন-বাদী। যেহেতু মানুষ তাদের মতে বানরের বংশধর, তাই তাদের স্বভাবে বাদরামী থাকবে এবং বাদরামী তারা করবে– এটা তাদের মতে স্বাভাবিক এবং জন্মগত অভ্যাস এবং অধিকার। আদিম শব্দটির উৎস আদম।

মানব জাতির চার অধ্যায়

মানব জাতির ইতিহাসকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। এ চার অংশের প্রথম ভাগ হচ্ছে আদমের যুগ বা আদিম যুগ– যার শুরু আদম (আ.) থেকে এবং শেষ হয় নূহ (আ.) পর্যন্ত। দ্বিতীয় যুগ হচ্ছে নূহী যুগ। এ যুগ হযরত নূহ (আ.) থেকে ইব্রাহীম (আ.) পর্যন্ত। তৃতীয় যুগ হল ইব্রাহীমী যুগ। এ যুগের শুরু হযরত ইব্রাহীম (আ.) থেকে ঈসা (আ.) পর্যন্ত। চতুর্থ যুগের শুরু হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এবং তৎপরবর্তী যুগ।

আদম যুগ

প্রথম যুগ শুরু হয় খৃষ্টপূর্ব ১০,০০০ বছর থেকে। হযরত আদম (আ.) এর উত্তরাধিকারীগণের ইতিহাস তেমন জানা যায় না। তাই তাদের জামানাকে আদিম যুগ, প্রাক-ঐতিহাসিক যুগ বা ইতিহাস পূর্ব যুগ বলা হয়।

হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু হয় আদম যুগ। যাকে ধর্মহীনগণ আদিম যুগ বা বর্বর যুগ মনে করে থাকেন। কারণ, তা তাদের জন্য সুবিধাজনক। পূর্ব পুরুষ যদি আদম (আ.) এর বংশধর আদমি না হয়ে আদিম হয়ে থাকে, তবে তাদের পক্ষে আদিম মানুষের স্বভাব জাত বর্বর হওয়া সম্ভব হয়।

হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত নূহ (আ.) এর যুগ ছিল মানব ইতিহাসের প্রথম যুগ বা আদম যুগ। হযরত আদম ও হাওয়াকে মানব ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করতে হয়। মানব প্রকৃতি কি হওয়া উচিত– এর প্রথম আদর্শ তার বংশধরদের মধ্যে তারাই সৃষ্টি করেন।

আদম (আ.) সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ্ তা'য়ালা ফিরিস্তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আদম সৃষ্টিতে ফিরিস্তাদের সর্দার ইবলিস খুশি হতে পারেনি। তাই সে আদমের আওলাদের আদিম শত্রু হয়ে যায়। আদম থেকে ইবলিস বা শয়তানের জীবনকাল এবং অভিজ্ঞতা ছিল বেশী। আদমের আওলাদ বিরোধী সংগ্রামে তাদেরকে ইবলিস

www.nagorikpathagar.org

বিভিন্নভাবে নাকানী চুবানি শুরু থেকেই খাওয়াইয়ে আসছে। আদম (আ.) কে জান্নাত থেকে দুনিয়াতে আগমনে শয়তানের অবদান ছিল একক অবদান।

খৃষ্টপূর্ব প্রায় দশ হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীর বুকে হযরত আদম (আ.) এর আবির্ভাব হয়। তখন থেকে চাষাবাদ, কৃষি কাজ এবং হাওয়া (আ.) এর সূতা কাটা এবং বস্ত্র নির্মাণের ধারা শুরু হয়। আদম (আ.) এর পুত্র হাবিল এবং কাবিল চাষাবাদ শুরু করেছিলেন। সে কালে আরব দেশ এবং ভারত ভূমি সংযুক্ত ছিল।

মানুষ এবং পশুর দৈহিক এবং জৈবিক ক্ষুধা আছে। কিন্তু পশু বস্ত্র পরিধান করে না। এটা আদম (আ.) এর আওলাদের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য।

হযরত আদম (আ.) এর আবির্ভাব হয়েছিল শ্রীলংকার আদম শৃঙ্গে (Adam's Peak)। হযরত হাওয়া (আ.) জান্নাত থেকে পড়েছিলেন মীনা এবং আরাফাত এলাকায়। ভারত অতিক্রম করে হযরত আদম (আ.) আরবে আসেন এবং হযরত হাওয়ার সাথে মিলিত হন।

নূহের যুগ

হযরত নূহ (আ.) যুগ শুরু হয় খৃষ্ট পূর্ব ৬,০০০ থেকে ৫,০০০ সাল এর মধ্যে। হযরত নূহ (আ.) ৯৫০ বছর বেঁচে ছিলেন। হযরত নূহ (আ.) এর বাসস্থান কোথায় ছিল ? সে বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে তাঁর আবির্ভাব কেলডিয়া (Caldia) ইরাক অঞ্চলে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। হযরত নূহের যুগে একটি প্রধান ঘটনা হচ্ছে মহা প্লাবন।

হযরত নূহ (আ.) এর হায়াত ছিল মহা প্লাবনের পূর্বে ৬০০ বছর এবং প্লাবনের পর ৩৫০ বছর। তার কর্মস্থল ছিল ইরাক, সিরিয়া এর তুরস্ক এলাকা।

এ অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ সুমেরিয়া, সামেরিয়া, আশিরিয়া বা এশিরিয়া, শাম, মেসোপোটেমিয়া, ব্যকট্রিয়া (Bactria), কালডিয়া (Caldia) ইত্যাদি নামে অভিহিত হত।

হযরত নূহ (আ.) এর তিন পুত্রের নাম ছিল শাম (Shem), হাম (Hem), জাপেথ (Japath), তাঁদের বংশধরগণ সারা পৃথিবী জুড়ে আছেন। মধ্যপ্রাচ্য মুসলিম ইতিহাসে উম্মুল বেলাদ (মাতৃভূমি) নামে খ্যাত। শ্যাম বা শেমের বংশধরগণ সেমিটিক এবং হাম বা হেমের বংশধর হেমিটিক নামে খ্যাত হয়।

হযরত নূহ (আ.) এর পুত্র হাম বংশধরগণ পূর্বে এশিয়া চীন এবং ভারতে বসতি স্থাপন করে। হাম এর পুত্র হিন্দ এর নামে ভারত ভূমি এবং হিন্দুস্থানের নাম হয়। হাম এবং তার বংশধরগণ ছিল আর্যদের পূর্বপুরুষ। হিন্দ এর বংশধর এবং হিন্দুস্থানের অধিবাসীবৃন্দ হযরত নূহ (আ.) এর বংশধর হিসেবে মুসলিমদের আত্মীয় এবং আপনজন হিসেবে বিবেচিত।

www.nagorikpathagar.org

ইব্রাহীমী যুগ

হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর যুগ শুরু হয় খৃষ্টপূর্ব ২২০০-২১০০ থেকে ইসার (আ.)-এর জন্ম পর্যন্ত। হযরত ইব্রাহীম (আ.) জন্মভূমি ছিল ইরাকের বাবেল বা উর নামে খ্যাত ভূমি। মিশর এবং সিরিয়া পর্যটন করে তিনি প্যালেষ্টাইন বা কেনানে বসতি স্থাপন করেন।

পশ্চিম এশিয়া বা মধ্যপ্রাচ্যের অন্তর্ভূক্ত মিশর ও প্যালেষ্টাইন ব্যাকট্রিয়া (Bactria) নামে পরিচিত ছিল। এ অঞ্চলে হয় অধিকাংশ নবীদের আবির্ভাব। এ অঞ্চলের মধ্যে মিশর হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর পূর্ব থেকেই সভ্য জাতি ছিল। মিশরের বাদশাহের সাথে হযরত ইব্রাহীম (আ.) সাক্ষাৎ করেন।

হযরত মূসা (আ.) এর নেতৃত্বে ইসরাইলীগণ মিশরের জুশান অঞ্চল থেকে বের হয়ে আসেন। এ ঘটনা Exodus (বা বহির্গমন নামে খ্যাত)।

হযরত ইব্রাহীমের যুগের অন্তর্ভূক্ত হযরত মূসা (আ.) এর যুগ ছিল খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০-১২০০ পর্যন্ত। হযরত মূসা (আ.) ইয়াহুদীদেরকে ফেরাউন দ্বিতীয় রামেসিস এর বন্দী দশা থেকে মুক্ত করলে তারা পারস্য সম্রাট বখত নজর (নেবুচাদ নজার) এর দাসত্বে পরিণত হন। নেবুচাদ নজার প্যালেষ্টাইন দখল করে ইয়াহুদীদেরকে বন্দী করে নিজ রাজ্যে নিয়ে আসেন।

ঈসাই যুগ

হযরত ঈসা (আ.) এর যুগ শুরু হয় তার জন্মকাল থেকে ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এটাই ছিল চার যুগের ক্ষুদ্রতম যুগ। ৫৭০ খৃষ্টাব্দ থেকে শুরু হয় খতমে নবুয়তি যুগ।

হযরত ঈসা পরবর্তী মুহাম্মদী যুগ

হযরত ঈসা (আ.) এর জন্মের ৫৭০ বছর পর মক্কায় বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর জন্ম হয়। তাঁর অনুসারীগণ মরক্কো থেকে মিশর, আরব, তুরস্ক থেকে হিন্দুস্থানে ব্যাপকভাবে বসতি স্থাপন করেন।

৩০
জীবনের চর্তুস্তর

হিন্দু সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে এবং ধর্মে চারটি স্তর বা মঞ্চ আছে। এ চারটি স্তর হচ্ছে – (১) ব্রহ্মাচর্য, (২) গার্হস্থ্য, (৩) বানপ্রস্থ, এবং (৪) সন্ন্যাস। শিশুকাল থেকে ব্রহ্মাচর্য স্তরের শুরু এবং তা চলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তি এবং বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত।

www.nagorikpathagar.org

ব্রহ্মাচর্য

ব্রহ্মাচার্য, (২) গার্হস্থ্য, (৩) বানপ্রস্থ এবং (৪) সন্ন্যাস– এই চারটি স্তরের সমান্তরালে রয়েছে চারটি অবস্থা। এগুলো হচ্ছে (১) অর্থ, (২) কাম, (৩) ধর্ম এবং (৪) মোক্ষ। এ চারটি অবস্থা অবশ্য বয়ক্রম অনুসারে কঠিনভাবে বিভক্ত অথবা সীমাবদ্ধ নয়। জীবনে চলার জন্য অর্থ ও সম্পদ প্রয়োজন। এটা যৌবন এবং বৃদ্ধকালেও চলতে থাকে।

পশু তার প্রকৃতি অনুসারেই চলে। পশু নিজেকে সংশোধন করতে পারে না। তাই পশুদের মধ্যে বিবর্তন নেই। মানুষের মত অধপতনও নেই। পশু যেখানে আছে সেখানেই থেকে যায়। কিন্তু মানুষের ধর্ম তা নয়। মানুষ সীমিতকে উপেক্ষা করে অসীমে হারিয়ে যায়।

পাখী উড়তে পারে। এটা তার প্রকৃতি। কিন্তু পশু নিজের নিবাসেই থাকে। আশ্রয় ত্যাগ করলে তার বিপদের সম্ভাবনা আছে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে মুক্তমনা হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। পাখা উন্মুক্ত করে পাখীর ন্যায় অসীম নীলিমায় হারিয়ে যেতে পারে–নিজের আহার বিহারের জন্য নব নব আবিষ্কার আয়ত্ব করার লক্ষ্যে।

গার্হস্থ্য

এ গার্হস্ত স্তর হল বিবাহ থেকে শুরু করে সংসার ধর্ম প্রতিপালন, সন্তানদের শিক্ষা প্রদান এবং তাদেরকে বিবাহিত ও স্বনির্ভর করে দেয়া পর্যন্ত।

হিন্দু সমাজে গার্হস্থ স্তরে কাম অথবা যৌনতা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সঙ্গত কর্ম। যৌনতা ধর্মেরই একটি অঙ্গ। হিন্দু দেব-দেবীগণ যৌনতার সর্বোত্তম বা তীব্রতম মডেল। মহাদেব শিব তার স্ত্রী পার্বতীর সাথে এমন তীব্র যৌনতায় লিপ্ত ছিলেন যে, পার্বতীর মৃত্যুর পূর্ণ সম্ভাবনা দেখা দেয়। পার্বতী জীবন রক্ষার প্রয়োজনে মানুষের তথা সকল সৃষ্টির পালনকর্তা বিষ্ণুর আশ্রয় কামনা করেন।

মহেশ্বর বিষ্ণু পার্বতীকে রক্ষাকল্পে শিব ও পার্বতীর যৌন কার্যক্রম চলা কালেই শিব লিঙ্গ কর্তন করে শিব দেহ থেকে তা বিচ্ছিন্ন করে দেন। এ বিচ্ছিন্ন লিঙ্গ স্বর্গ থেকে ভূমিতে পতিত হয়। যা এখন শিব মন্দিরে পূজীত হয়।

দেবতাদের যৌনতা এবং যৌন প্রক্রিয়া, অবস্থান, অনুভূতি ইত্যাদি অতীব স্বচ্ছতায় প্রতিফলিত করা হয় হিন্দু ভাস্কর্যে ও স্থাপত্যে। দেবতাদের যৌন কর্মের বাস্তব প্রতিফলন ও অনুভূতি দেখে অহিন্দুগণ হতভম্ব হয়ে যান।

গার্হস্থ্য স্তরের একটি অধ্যায় হচ্ছে বিবাহ, যৌনানন্দ, সন্তান-সন্ততি লাভ এবং তাদের প্রতিপালন। তৃতীয় বানপ্রস্ত স্তরে আছে ধর্ম পালন।

www.nagorikpathagar.org

বানপ্রস্থ

জীবনের তৃতীয় বানপ্রস্থ স্তরে পুরুষ ব্যক্তি সাংসারিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সম্ভব হলে বনবাসের জীবন অবলম্বন করেন। এ স্তরে ব্যক্তি সংসারের ভার পুত্র-কন্যাদের উপর দিয়ে নিজের পরকাল সম্বন্ধে চিন্তা শুরু করেন।

সন্ন্যাস

সংসার জীবনের চতুর্থ স্তর হল সন্ন্যাস। এ স্তরে একজন হিন্দু পুরুষ সংসারের দায়িত্ব সম্পূর্ণ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন এবং ধর্মীয় আশ্রমে বাস করবেন। এসময় তিনি যপতপ এবং তপস্যায় এবং মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকেন।

জীবনের যে চার স্তরের কথা বলা হল–সকল হিন্দু তা আনুগত্য ও দৃঢ়তার সাথে পালন করেন না। তবে তা আদর্শ বা মডেল হিসাবে সামনে থাকে। যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব তিনি ততটুকুই অবলম্বন করেন।

মোক্ষ লাভ

ইসলাম ধর্মে এ ধর্ম পালনের কাজটি কয়েকটি নির্দিষ্ট স্তরের কাজ নয়। এটা শিশুকাল থেকে আমৃত্যু পর্যন্ত। চতুর্থ মোক্ষপ্রাপ্তি স্তর হিন্দুদের জন্য অতি দীর্ঘ এবং সীমাহীন। মোক্ষ লাভের অর্থ আত্মার পরিত্রাণ বা নির্বাণ লাভ। কর্মফলের কারণে আত্মা কর্মের অনুপাতে উচ্চ স্তরে এবং নিম্ন স্তরে জন্ম গ্রহণ করে।

অধপতন ও শাস্তি যদি কারো নিয়তি হয়, প্রথম জন্মে তিনি ব্রাহ্মণ হিসাবে জন্ম গ্রহণ করলেও পরবর্তী জন্মে ক্ষত্রীয়, বৈশ্য, শুদ্র, স্তর অতিক্রম করে সিংহ, বাঘ, মহিষ, গরু, ছাগল, শুকর, সর্প, হাঙ্গর, কুমির, তিমি, ক্ষুদ্রতর মৎস এবং কীট-পতঙ্গ হিসাবে জন্মগ্রহণ করতে পারেন। তবে ব্রাহ্মণ থেকে অধপতন হতে হতে কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত নাও আসতে হতে পারে। যে কোন স্তর থেকে উর্ধমূখী প্রক্রিয়া শুরু হয়ে মোক্ষ বা পরিত্রাণ লাভ হয়ে যেতে পারে।

কর্ম অনুসারে ইসলাম ধর্মে জীবনের ভাগ আছে। শিশুকাল এবং বাল্যকাল শেষে প্রাথমিক যৌবনকাল হল শিক্ষা এবং সংসার জীবনের প্রস্তুতিকাল। এরপর হচ্ছে বিবাহ, সংসার জীবন, পরিবার, অর্থ রোজগার, ব্যবসা, বাণিজ্য, চাকুরী এবং সাংসারিক কাজে লিপ্ত থাকা।

তবে, ধর্মপরায়নতা চলতে থাকবে সারাটি জীবন। কৈশোর থেকে শুরু করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সকল কর্মের হিসাব যে কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর দিতে হবে। দাড়িপাল্লায় হিসাব এবং বিচারের পর হবে নাযাত অথবা অনন্তকাল ধরে শাস্তি।

www.nagorikpathagar.org

চর্তুবর্ণ

হিন্দ ধর্ম মানুষকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য ও শুদ্র– এ চার বর্ণে বা শ্রেণীতে বিভক্ত করে। ব্রাহ্মণের জন্ম হল স্রষ্টা ব্রহ্মার মুখ থেকে। ক্ষত্রীয়গণ সৃষ্টি হয়েছে বাহু থেকে। বৈষ্ণবগণ সৃষ্টি হয়েছে উরু থেকে এবং শুদ্রগণ সৃষ্টি হয়েছে পদযুগল থেকে।

মানুষের এমন শ্রেণীবিভাগ চতুর্বেদে নেই। গীতাতে নেই। উপনিষদে নেই। পুরাণ গ্রন্থসমূহে নেই। তা হলে এ চর্তুবর্ণ প্রথা এল কোথা থেকে ? হিন্দু ধর্মের কাষ্ট-সিষ্টেম বা চর্তুবর্ণ প্রথার উৎস হচ্ছে মহাভারত।

হিন্দুদের মধ্যে চরম প্রকৃতির জন্ম সূত্রের ব্রাহ্মণ্যবাদ আছে। ইয়াহুদ খৃষ্টানদের মধ্যেও কিছুটা আছে। খৃষ্টানগণ তাদের ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বার সকল অনুসারীদের প্রতি খুলে দিয়েছে। এর ফলে একজন পোপ এর অবৈধ সন্তানও পোপ হতে পারে এবং হয়েছে। কিন্তু জন্মসূত্রকে ভিত্তি করায় হিন্দু ধর্মে ব্রাহ্মণ্যবাদ এর আবেদন সীমিত করে ফেলা হয়েছে। ব্রাহ্মণ জন্মসূত্রে ধর্মীয় প্রধান হলেও তিনি পোপের ন্যায় সম্মানিত নন।

খৃষ্টান পাদ্রীর ন্যায় হিন্দু বৈষ্ণবগণ আখড়া আশ্রমে অবিবাহিত জীবন যাপন করেন। ধর্মযাজকদের মধ্যেও বিবাহ বহির্ভুত যৌনতা এবং সমকামীতার প্রাবল্য দেখা যেতে পারে। কোন কোন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে এইডস অতি প্রবল।

হিন্দু মন্দিরে বহু হিন্দু বিধবা ও অবিবাহিত ব্যক্তি যৌন জীবন প্রত্যাখ্যান করে বৈষ্ণব বৈষ্ণবী হন বা মন্দিরের সেবাদাসী হন। তারা ধর্মীয় বিশ্বাসগত কারণে খৃষ্টান নান এবং সিষ্টারদের মত ভক্তি শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেন না এবং ধর্মীয় অবদান রাখতে পারেন না।

হিন্দু ও খৃষ্টানদের মোনাসষ্ট্রিসিজম এবং বৈরাগ্যবাদ ইসলাম সমর্থন করে না। তারা বিবাহ সিদ্ধ যৌনতাকেই সওয়াবের কাজ অর্থাৎ পূণ্যকর্ম মনে করেন। কিন্তু খৃষ্টান নান, সিষ্টার এবং পাদ্রীগণ চার্চে থেকেই যৌনতামুক্ত জীবন যাপন করতে চান।

নগ্নতা

হিন্দু পুরোহিত এবং দেবতাগণ মানব সমাজ পরিত্যাগ করে বনে, জঙ্গলে, পর্বতে জীব জগতের পশুর ন্যায় অর্ধ উলঙ্গ এমনকি উলঙ্গ জীবন যাপন করতে পারেন। এ উলঙ্গতাকে ধর্মের অঙ্গ হিসাবে ধরে নেন। যৌনতা সংবরণ এবং সংহত করে তারা ঋষিদের পর্যায়ে উঠে যান। তখন তারা জনসম্মুখেও বস্ত্রহীন জীবন সাধনায় শীত গ্রীষ্মের কষ্ট সহ্য করেন।

মুণী, ঋষিগণ যৌনতাকে দাবিয়ে রাখার জন্য শুধু যে উলঙ্গতা অবলম্বন করেন তা নয় বরং শীত, গ্রীষ্মের তীব্রতা সহ্য করে আত্ম-পীড়ন করেন। নিজ দেহে

www.nagorikpathagar.org

বেত্রাঘাত করেন, অঙ্গহানী করেন, নিদ্রা বিসর্জন দেন। বৃক্ষ থেকে রশি যোগে ঝুলে থাকেন।

পুরোহিতের ভূমিকা

হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ভূমিকা সর্বোচ্চ স্তরে। পুরোহিতের প্রধান ভূমিকা মন্দিরে পূজা করা। বিবাহ, শ্রাদ্ধ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদেরকে নিমন্ত্রণ করা হয় নেতৃত্ব দানের লক্ষ্যে।

অগ্নি হিন্দুদের মধ্যে একজন দেবতা। পূজায় ধুপ ধুনা জ্বালানো হয়। মৃতদেহের সৎকারে চিতায় অগ্নি দেবতার ভূমিকা মুখ্য।

মৃত্যুর পরও প্রাণ মৃত ব্যক্তির গৃহে বা বাড়িতে ঘোরাফেরা করে। তাই মৃতদেহের আত্মার উদ্দেশ্যে খাদ্য ছড়াতে হয়। এ খাদ্য ভোজের অতিথি পাখি ও প্রাণী। মৃত্যুর ৪০ দিন পর হিন্দুদের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রাদ্ধ ব্যবস্থা না হলে মৃত ব্যক্তির আত্মা শান্তি পায় না।

বহু উচ্চস্তরের সাধকগণ চুল, নখ কাটেন না। মাথায় জটা সৃষ্টি করেন। এগুলো সবই করা হয় আধ্যাত্মিকতা এবং যৌন সংযম অর্জনের লক্ষ্যে। তাদের ত্যাগ, তিতীক্ষা, কষ্ট যে কোন মানুষের প্রশংসার উদ্রেক করে। কিন্তু দেহকে এত নির্যাতন করে দৈহিক চাহিদা কি ধ্বংস করা সম্ভব হয় ? মুণী ঋষি দেবতাদের যৌন জীবন এবং যৌন কাহিনী অবহিত হলেই এ অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ব্যর্থতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

কোন কোন ঋষি সাধকগণ বিভিন্ন প্রকার আত্মসংযম করে মাটির নীচে, গর্তে কয়েক দিন অবস্থান করে জীবিত হয়ে বেড়িয়ে আসেন এবং মোক্ষ লাভ সমর্থ হয়েছেন বিধায় বরিত হন। কিন্তু অক্সিজেনের অভাব হলে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া ব্যাহত হলে এরূপ ত্যাগ তিতীক্ষার মাধ্যমে জীবিত থাকা সম্ভব নয়।

মুণী-ঋষিদের সাধনা মুসলিম পীর, মৌলভী, হুযুর কিবলা অথবা খৃষ্টান পাদ্রীদের সাধনা লাভ থেকে অনেক বেশী তীব্র। ধর্মান্তরণের মাধ্যমে হিন্দুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় না। অথচ মুসলিম এবং খৃষ্টানদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে।

৩১

পরকাল ও পুনর্জন্মবাদ

পরকাল সম্বন্ধে হিন্দু ধর্মের ধারণা কি? হিন্দু ধর্মে পরকালে বিশ্বাস আছে। তবে পরকাল বিশ্বাসটি ইসলাম ধর্মের পরকালের বিশ্বাস থেকে ভিন্নতর। হিন্দু ধর্মানুসারীদের অনেকেই পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন।

www.nagorikpathagar.org

অনেকেই পরকাল এবং পুর্নজন্ম উভয়তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। পরকাল বিশ্বাসীগণ স্বর্গ ও এবং নরকে বিশ্বাস করেন। পুনর্জন্মবাদীদের স্বর্গ এবং নরক এ পৃথিবীতেই।

কেউ পরকাল, স্বর্গ ও নরক এবং পুনর্জন্ম–সব কিছুতেই কিছু কিছু বিশ্বাস করেন। যদি কেউ এ জন্মে ভাল কাজ করেন তবে উন্নততর প্রাণী হিসাবে অথবা উন্নততর প্রজাতিতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করবেন।

একজন বৈশ্য ভাল কাজ করলে তিনি ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ হিসাবে পুনর্জন্ম লাভ করবেন। একজন ক্ষত্রিয় স্বীয় অপকর্মের পরিণতিতে তার থেকে ক্ষুদ্র হিসেবে অথবা নিম্নতর প্রাণী হিসাবে পুন জন্মগ্রহণ করবেন।

ভাল কর্মের ফল যে কোন জীব এ পৃথিবীতে ভোগ করবে। ইসলাম এ পৃথিবীতে এ ধরণের পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে না। এটি অনেকের মতে হিন্দু ধর্মেরও সঠিক বিশ্বাস নয়।

বৈদিক যুগে বৈদিক ধর্মাবলম্বীগণ এ পৃথিবীতে পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতেন না। তবে তারা মুসলিমদের ন্যায় কর্মের ফল হিসাবে স্বর্গ এবং নরকে বিশ্বাস করতেন।

ঋষি রাহুল সংকীর্তায়ন বেদ ধর্ম গ্রন্থ সমূহ গবেষণা করে পুনঃজন্ম অপেক্ষা ভিন্নরূপ সিদ্ধান্তে আসেন। তাঁর মতে বৈদিক ঋষিগণ বিশ্বাস করতেন যে, এ জন্মের পর কর্মের ফল হিসাবে প্রত্যেক মানুষ সুন্দরতর পৃথিবী বা জীবনে স্বর্গীয় কর্মফল ভোগ করবে।

যারা এ জন্মে অপকর্ম করবে, তারা পরজন্মে নরকের গভীরতর অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয়ে শাস্তি ভোগ করবে। বৈদিক ঋষিগণ পুর্নজন্ম বিশ্বাস করতেন না।-(রাহুল সংকীর্তায়ন ঃ Perspectives of the World, page-552).

বৈদিক ঋষিগণের পরকাল এবং পরজীবন সম্বন্ধে ধারণা ইসলামী বিশ্বাস থেকে ভিন্নতর ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে ধর্মীয় তত্ত্বের ভিন্ন ব্যাখ্যা করে এ পৃথিবীতে পুনঃজন্মের তত্ত্ব আবিষ্কার করা হয়। এর কারণ, ধর্ম সম্বন্ধে সন্দেহবাদীগণ স্বর্গ নরকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।

এ ব্যাপারে রাহুল সংকীর্তায়ন লিখেছেন, পরকাল সম্পর্কে সন্দেহবাদের ফলে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ উপনিষদের যুগে পুনর্জন্মের তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। যখন মানুষ স্বর্গ এবং নরকের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, তখন এই তত্ত্ব প্রচার করা হয় যে, অপকর্মের ফল মানুষ পুনর্জন্মের মাধ্যমে এ পৃথিবীতে ভোগ করবে।-(রাহুল সাংকীর্তায়ন ঃ Perspectives of the World, page-552).

জন্মান্তরবাদী বা শব্দান্তরে পুনর্জন্মবাদীদের মতে এ জন্মই প্রথম বা শেষ জন্ম নয়। পুনর্জন্মবাদ অনুসারে মৃত্যুর সাথে সাথেই জীবন শেষ হয়ে যায় না। হিন্দু

www.nagorikpathagar.org

ধর্ম মতে পুনর্জন্মবাদের প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যায় যখন মানুষ অথবা প্রাণীর সকল পাপমোচন হয়ে যায়। তখন সকল সৃষ্টি মহাব্রহ্মার মধ্যে বিলীন হয়ে যান। এর পূর্বে তারা তাদের জীবন কালের কর্মের প্রতিফলে বারবার জন্ম গ্রহণ করতে থাকেন।

এই পুনর্জন্মবাদ হলো হিন্দু ধর্মের জাত বা জাতিভেদ প্রথার ভিত্তি। এ জন্মের পূর্বেও প্রত্যেকের জন্ম ছিল এবং তাদের কর্মফলের ভিত্তিতেই এ পরবর্তী জাতে পুনর্জন্ম লাভ হয়েছে। কিন্তু, কোন ব্যক্তি স্মরণ করতে পারবে না- তাঁর পূর্ব জন্মে তিনি কি ছিলেন।

জন্মান্তরবাদ/পুনর্জন্মবাদ

মানুষ হিসাবে জন্ম গ্রহণের পূর্বে অন্যান্য কীট-পতঙ্গ এবং পশু-পাখি হিসাবে বহু বার জন্ম গ্রহণ করতে হতে পারে। ঐ জন্মের উত্তম কাজের পুরষ্কার স্বরূপ মানব কুলে তাদের জন্ম। অর্থাৎ কীট পতঙ্গ, পশু-পাখিরা হল মানব জাতির পূর্ব পুরুষ। সুতরাং কারো সাথে দুর্ব্যবহার করা যাবে না।

যারা এ জীবনে মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন, পূর্ববর্তী জীবনে তারা হয়ত পশু-পাখি হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ ধুলি, কণা, প্রস্তর, পর্বত, সব কিছুই মানব প্রজাতির পূর্ব পুরুষ। কিন্তু প্রশ্ন হল, প্রথম প্রজন্মে কোন প্রজাতি কি ছিল?

ইসলাম ধর্মেও পুনর্জন্মবাদ আছে। তবে তা মাত্র একবার, মহাপ্রলয় বা কিয়ামতের পর। শেষ বিচার হবে একমাত্র মানব জাতির। আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা মানব জাতির পুনর্জন্ম এবং বিচারের পর তারা জান্নাত বা জাহান্নামে স্থান পাবে। জান্নাতে তাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু নতুন করে সৃষ্টি হবে।

গীতা

মুসলিমগণ প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করতে চেষ্টা করেন। হিন্দু ধর্ম মতে প্রত্যহ পাঠ্য পুস্তক হল গীতা। গীতার ভাষ্যগুলো এমনভাবে রচিত যে, এর প্রত্যেকটি বাক্যের একাধিক ব্যাখ্যা হতে পারে। ফলে কোন না কোন ব্যাখ্যা কারো না কারো হৃদয়ে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে। ধার্মিক, সন্ত্রাসী, স্বল্প শিক্ষিত, রাজনৈতিক, সমাজসেবী সকলের হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ হচ্ছে গীতা।

শ্রীকৃষ্ণের মতে পুনর্জন্মবাদ

গীতার একটি শিক্ষা হল পুনর্জন্মবাদ। শ্রীকৃষ্ণের মতে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দেবত্ব আছে। যদি মানুষ এ দেবত্ব থেকে বিচ্যুত হয়, তবে তাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হবে এবং তা হবে অপেক্ষাকৃত নিম্ন বর্ণে বা জাতিতে। এটা যদি না হত, তাহলে মানুষের সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া আরো বেশী হত।

www.nagorikpathagar.org

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন– তার এই জন্মই প্রথম এবং শেষ জীবন নয়। তিনি ইতোপূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং প্রয়োজনবোধে মানব জাতিকে দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য পুনর্জন্ম গ্রহণ করবেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শিক্ষা দেন যে, মানব জীবনে ব্যক্তির আদর্শ থাকতে হবে। লক্ষ্য থাকতে হবে। তদুপরি মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রাগ, বিরাগ, অনুরাগ, লালসা, বাসনা থাকতে পারে এবং থাকে। মানুষের লক্ষ্য হয়া উচিত নেতিবাচক অনুভূতি এবং কুবাসনা সমূহকে সংযত ও সংহত করা। যে বিশ্বটাকে আমরা মানবিক চোখ দিয়ে দেখি তা হল মায়া, অসত্য। এ মায়া বা হেয়ালীর পেছনে দৌড়ে মানুষ পথ বিচ্যুত হয়।

৮০ লক্ষ বার পুনর্জন্ম

অগ্নি পুরাণের ভাষ্য মতে, একটি মানুষ মৃত্যুর পর ৮০ লক্ষ বার মানুষ অপেক্ষা নিম্নতর অথবা উচ্চতর নতুন প্রজাতিতে জন্ম গ্রহণ করে। ৮০ লক্ষ বার জন্ম ও জন্মান্তরের পর সে পুনরায় মানুষ হিসাবে জন্ম গ্রহণ করবে।

এ ৮০ লক্ষ বারের মধ্যে ২১ লক্ষ বার জন্ম হবে বিভিন্ন প্রকারের বৃক্ষ, পাথর, মাটি, শিলা ইত্যাদি হিসাবে। ৯ লক্ষ বার জন্ম হবে জলজ প্রাণী হিসাবে। ১০ লক্ষ বার জন্ম হবে পোকা-মাকড় ইত্যাদিরূপে। ১০ লক্ষ বার জন্ম হবে উড়ন্ত পাখি হিসাবে। ৩০ লক্ষ বার জন্ম হবে স্থলজ পশু-প্রাণী হিসাবে।

এরপর শুরু হবে মানুষ হিসাবে জন্মের প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় সুদীর্ঘ ৪ লক্ষ বার জন্ম গ্রহণ করতে হবে– ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিম্ন স্তরের মানুষ প্রজাতি হিসাবে।

পাপমোচন

হিন্দু ধর্মে পাপমোচনের জন্য ক্ষমার বিধান নেই (Wilking, পৃঃ ৪১-৪২, ১৯৭৫)। হিন্দুধর্ম মতে যেমন কর্ম তেমন ফল। এ নীতির ফলে ক্ষমা প্রার্থনা বা ক্ষমা দানের সুযোগ থাকে না।

হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রে, কোন্ পাপ করলে কি পরিণতি হবে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু কিভাবে ক্ষমা পাওয়া যায়–সেটা সুস্পষ্ট নয়। যদিও তীর্থ স্থানে গমনের বিধান আছে। গঙ্গা স্নানে পূণ্যের কথা বলা হয়েছে। ক্ষমাপ্রাপ্তির অসংখ্য পদ্ধতি রয়েছে।

স্বর্গ ও নরক

তেত্রিশ কোটি দেবতার প্রত্যেকেরই স্বর্গ বা নরক আছে। যারা পূজা করে স্বীয় দেবতার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেন, তারা তাদের দেবতার স্বর্গে বা নরকে গমন করবেন।

www.nagorikpathagar.org

দেবতাদের আশির্বাদ পেতে হলে তা ক্রয় করা যায়। সাধনা ও শাস্তির পর বিচারক দেবতার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করান যায়। তবে তা সেবা ও উপহারের মাধ্যমে।

গৃহে দেবতাদের প্রতিমূর্তি রেখে পূজা করা যায়। মন্দিরে যাওয়া যায়। পবিত্র স্থানে স্নান করা যায়। এভাবে পূণ্যের পরিমাপ হয়ে বিচার হবে এবং এ বিচারের পরিণতিতে হবে পুনর্জন্ম।

ভাগ্য ও সামাজিক শান্তি

প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য তারই অর্জন এবং পরবর্তী জীবনে এই ভাগ্যের পরিবর্তন হয়ে বার বার নতুন করে জন্মের প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। এরূপ বিধানের ফলে কেউ যদি মযলুম বা নিরাশ্রয় এবং নির্যাতিত হয়– এটা তার ভাগ্য হিসাবে গন্য হবে এবং পরজন্মে এ পৃথিবীতে পুরষ্কার ও শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ ধরনের বিধানের ফলে জীবনে ও সমাজে শান্তি বিরাজ করে।

কর্মফল/পরকাল

হিন্দু ধর্মে কর্মফলের উপর বিশ্বাস আছে। পরকালে বিশ্বাস আছে। মৃত্যুর পর এ জীবনের কর্মফলের ভিত্তিতে আত্মা স্বর্গে যায় অথবা নরকে নিপতিত হয়। কিছু কাল আনন্দ অথবা শাস্তি ভোগের পর পুনর্জন্ম লাভ করে এ পৃথিবীতে ফিরে আসে। কি হিসাবে পুনর্জন্ম হবে–তা নির্ভর করে পূর্ববর্তী জন্মের কর্মফলের উপর।

এখানে দেখা যায়-একটি জীবনের এবং কর্মফলের পরিণাম চারটি। কিছু কাল নরকে বাসের পর পুনর্জন্ম অথবা কিছুকাল স্বর্গে বাসের পর পুনর্জন্ম। এ নরকে বাস চিরস্থায়ী নয়। জীবন যেমন অস্থায়ী, পরকালও তাই। স্বর্গ এবং নরকে বাসের পরই পুনর্জন্ম লাভ করে এ পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন হবে।

পৃথিবীতে কাউকে দেখা যায় স্বাস্থ্যবান এবং কাউকে দেখা যায় অসুস্থ বা জন্মগত ভাবে বিকলাঙ্গ। কেউ জ্ঞানী, কেউ নিরক্ষর, কেউ চক্ষুষ্মান, কেউ অন্ধ, কেউ বুদ্ধিমান, কেউ অঘা বা মূর্খ। কারও জন্ম উচ্চ বর্ণে। কারও জন্ম নিম্ন বর্ণে, ইত্যাদি। সব কিছু হিন্দু ধর্ম মতে পূর্ববর্তী জন্মের কর্মফল।

মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী তাদের কর্মফল অনুসারে এ পৃথিবীতে ফিরে আসবেন নতুন জন্ম লাভ করে। কেউ পূর্ব জন্ম অপেক্ষা পূণ্যের কর্মফল অনুসারে উন্নততর অবস্থায় ফিরে আসবেন। একজন শুদ্র বা বৈশ্য পরবর্তী জন্মে উচ্চতরবর্ণে জন্ম লাভ করবেন অথবা নিম্নতরবর্ণে– এমনকি পশু হিসাবেও।

পরবর্তী জন্মের কর্মফল অনুসারে মানুষ নতুন জন্ম লাভ করে পৃথিবীতে আসবেন। এভাবে জন্ম এবং মৃত্যু প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে। একজনের মৃত্যুর পর

www.nagorikpathagar.org

কতকাল তারা পুনর্জন্মের পূর্বে স্বর্গে বা নরকে থাকবেন– তা নির্ভর করবে তাদের পূর্ববর্তী কর্মফলের উপর।

জন্ম-জন্মান্তর

জন্ম জন্মান্তর ধরে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং তা লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি বছর ধরে চলতে থাকতে পারে। জন্ম ও জন্মান্তরের এই প্রক্রিয়া শেষ হলে পরে এ জীবন এবং পরকালের জীবনের শেষ হবে পরম স্রষ্টা বা পরম আত্মার সাথে মিলনে। পরম আত্মার মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে জীবনের নির্বাণ লাভ হয়।

জাতিভেদ

জন্মগত জাতিভেদ এ জন্মে পরিবর্তনের কোন সুযোগ নেই। যদিও পরবর্তী জন্মে উচ্চতর বর্ণে জন্মের সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে অতি প্রবল। পুনর্জন্মবাদের মধ্যেই ব্যাখা রয়েছে জাতিভেদ কেন?

কেউ ব্রাহ্মণ হিসাবে জন্ম গ্রহণ করে, কেউ অস্পৃশ্য বা শুদ্র হিসাবে জন্ম গ্রহণ করে। এর মধ্যে ক্ষয়িত্র, বৈশ্য অন্তর্ভূক্ত। দলিতদেরকেও মানব প্রজাতির অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। ব্রাহ্মণ্য পর্যায় জন্ম হবে শত বার। (W.J. Wilkins, p- 117, 1975).

ক্ষত্রীয় জন্ম

ক্ষত্রীয়দের কাজ রাজ্য শাসন ও রাজ্য রক্ষা করা। বর্তমান জীবন ও সমাজ ব্যবস্থায় যে কোন ব্যক্তি রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। সেনাবাহিনীতে বা পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করে দেশ রক্ষা বা দেশের শৃঙ্খলা রক্ষা এবং শত্রুর হাত থেকে দেশ প্রতিরক্ষা দায়িত্ব পালন করতে হবে।

শুদ্রদের শাস্তি

অস্পৃশ্য শুদ্রগণ এমন অস্পৃশ্য যে তাদের ছায়াও অস্পৃশ্য। তাদের ছায়া যদি উচ্চ বর্ণের কারও উপরে পড়ে, তাহলে তাকে পরিচ্ছন্ন বা পবিত্র হওয়ার জন্য স্নান করতে হবে।

যদি নিম্ন বর্ণের মানুষেরা উচ্চবর্ণের ক্ষত্রীয় এবং ব্রাহ্মণদের অবমাননা করে অথবা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাহলে তারা তাদের পাপ অনুসারে নিম্নতর পশু, জীব-জন্তু এবং কীটপতঙ্গ হিসাবে জন্ম গ্রহণ করবে।

পূর্ব জন্মে পাপের পরিণতি

যখনই এ জীবনে কোন দুঃখজনক ঘটনা ঘটে- প্রথমেই কল্পনায় আসে কোন দেবতার অসন্তুষ্টি আমি উৎপাদন করেছি। কারো একটি নিস্পাপ শিশু মারা গেল তখনি মনে জাগে– কি পাপ আমি করেছি।

www.nagorikpathagar.org

খুঁজে বের করতে হয় এ জীবনে তার কৃত পাপের হিসাব। হিসাব না মিললে ধারণা করা হয় পূর্ব জন্মের পাপের ফলে এ জীবনের শাস্তি স্বরূপ দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটেছে।

ইসলামে এ ধরনের জন্ম জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস নেই। জন্ম এবং মৃত্যু এ পৃথিবীতে একবারই।

জন্ম জন্মান্তরবাদ

হিন্দু জীবন দর্শনের লক্ষ্য এক জন্মের পর আর এক জন্ম। আর একটি লক্ষ্য হবে পূর্ব জন্মের পূর্বে আর এক জন্মের ধারা বা চেইন–কিভাবে ভঙ্গ করা যায়। কিন্তু, যখন দেখা যায়–অনেক বেশী পাপ করেও কেউ কেউ ভালভাবে আছে, তখনি মনে প্রশ্ন জাগে–কি পূণ্য তারা করেছিল!

হিন্দু ধর্মের লক্ষ্য জন্ম বা জন্মের পর পুর্নজন্মের যে চেইন তা ভঙ্গ করে পরম ব্রহ্মা বা ঈশ্বরের প্রিয়ভাজন হিসাবে তার দলে মিশে যাওয়া। মুসলিমগণ বিশ্বাস করে স্রষ্টার সাথে মিলিত হতে হলে পুনর্জন্ম বা পর পর জন্মের প্রয়োজন নেই।

কিয়ামত/মহা প্রলয়

এ জন্ম ও মৃত্যুর পর কিয়ামত বা মহা প্রলয় হবে। শেষ বিচার দিবসে হাশরের মহা আদালতে বিচার হবে। বিচারের পর জান্নাত বাস অথবা জাহান্নাম বাস হবে। মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল আত্মা বিচারাধীন থাকবে। ঐ সময়ও মানব আত্মা এর কর্মফল ভোগ করবে।

ধর্ম পালন ও মিলন

পরম ব্রহ্মের সাথে মিলনের উপায় ধর্ম পালন করা ও ধর্মীয় বিধি নিষেধ মেনে চলা। ধর্মীয় বিধি নিষেধের বড় কথা হল কাস্ট্ (Caste) সিস্টেমের বিধিবিধান মেনে চলা। জন্মগতভাবে যার যে কর্তব্য তা পালন করা (Jagannathan, p- 56, Fazli- 145).

বিষ্ণু পুরাণে স্বর্গের অধিবাসীদের অবস্থায় বর্ণনা আছে। এতে উল্লেখ করা হয় যে, শুধুমাত্র নরকেই নরক যন্ত্রণা আছে তা নয়, যারা পরবর্তী জীবনে স্বর্গ প্রাপ্ত হবেন তারাও নরক যন্ত্রণা ভোগ করবেন। স্বর্গবাসীদের নরক যন্ত্রণা হবে স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হয়ে এ পৃথিবীতে পুনর্জন্ম গ্রহণ।

এ পুনর্জন্মে পূর্ববর্তী জন্ম অপেক্ষা গুণগত মানে উন্নততম কর্ম সম্পাদন করা না হলে নিক্ষিপ্ত হতে হবে নরকের গহ্বরে। পূর্ববর্তী জন্মের অতীতের হিসাবে যতটুকু অগ্রগতি হয়েছিল তা হারিয়ে যাবে, আবার নতুন করে জীবন যাপন শুরু হবে।

www.nagorikpathagar.org

পার্বতীর দূর্গারূপে পুনর্জন্ম

শিব পত্নী পার্বতী খুবই আবেগপ্রবণ ছিলেন । এক উপলক্ষ্যে তিনি শিবের সাথে অত্যধিক ক্রুদ্ধ হয়ে আত্মহত্যা করে বসলেন। কিন্তু এতে পার্বতীর আত্মা তৃপ্ত হল না। তিনি দুর্গা হিসাবে পুনর্জন্ম নিলেন। তিনি চাইলেন যে দেবতা শিবের সাথে তিনি পুনরায় মিলিত হবেন।

এদিকে পার্বতীর আত্মহত্যায় চরম, দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে দেবতা শিব গভীর তপস্যায় রত হলেন। শিবকে ধ্যান ভঙ্গ করতে না পেরে দেবী দুর্গাও শিবের সামনে বসে অনুরূপ তপস্যায় লিপ্ত হলেন।

যৌন চেতনা

দুর্গা এবং শিবের বিচ্ছেদ বেদনা লক্ষ্য করে অন্যান্য দেবতাগণ তাদেরকে সান্তনা দিতে এলেন। এদের মধ্যে যৌন দেবতা কাম দেব ছিলেন। তিনি ভাবলেন, তার পক্ষে দুর্গা এবং শিবকে সাহায্য করা সম্ভব। তিনি উভয়ের মধ্যে যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি করতে তপস্যা শুরু করলেন। তার তপস্যায় শিব এবং দুর্গা উভয়ের মধ্যে যৌনাকাঙ্খা জাগ্রত হল। উভয়ে তপস্যা মুক্ত হলেন এবং স্বামী-স্ত্রী হিসাবে পুনরায় মিলিত হলেন (Wilkins, Hindu Mythology, p- 295).

পুনর্জন্ম

ভগবত গীতায় বলা হয়েছে মানুষ যেমন কাপড় চোপড় ছেড়ে নতুন কাপড় চোপড় পরে, একই ভাবে আত্মা একটা শরীর ছেড়ে নতুন শরীরে প্রবেশ করে। (ভাগবত গীতা, অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-২২)।

উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে, "শুয়াপোকা ঘাস খেয়ে উপরে উঠে যায়। তার পর অন্য ঘাসে লাফ দেয়। একই ভাবে মানুষের আত্মা একটা শরীর থেকে আর একটি শরীরে প্রবেশ করে"। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৪র্থ অংশ, ৪র্থ অধ্যায়, ৩য় অনুচ্ছেদ)।

www.nagorikpathagar.org

১০ম অধ্যায়

৩২

হিন্দু ধর্মে নারীর মর্যাদা

মণু সংহিতা মতে নারী জাতি সম্পর্কে হিন্দুধর্মের বিধি-বিধান ও ধ্যান ধারণা অনেক ক্ষেত্রে জঘন্য ও মানবতা বিরোধী। পুরুষের ন্যায় নারী একই স্তরের সৃষ্টি নয়। ধর্মীয় বিধান অনুসারে তাদের স্থান মনুষ্য ও পশুর মধ্যবর্তী স্তরে। বিধবাদের অবস্থান শুধুমাত্র অমানবিক নয়, পশু সুলভ অথবা আরও নিম্নস্তরের বলা যেতে পারে।

নারীর মানসিকতা

মণু সংহিতা মতে নারীগণ সৌন্দর্য অন্বেষণ করে না। পুরুষ কি যুবক অথবা বৃদ্ধ তাও নারী দেখে না। সুরূপ অথবা কুরূপ হোক, পুরুষ পেলেই তার সঙ্গে নারী সম্ভোগে লিপ্ত হয়। মণু সংহিতায় এ সংক্রান্ত ভাষ্যটি হল– "নৈতা রূপং পরীক্ষান্ত নাসাং বয়ীসি সংস্থিতি। সুরূপম্বা বিরূপম্বা পুমানিভ্যেব ভূঞ্জতে।-(মণু সংহিতা, অধ্যায়-৯, শ্লোক-১৪)।

মণু সংহিতা মতে, পুরুষ দর্শন মাত্র তার সাথে যৌন ক্রীড়ার ইচ্ছা নারী হৃদয়ে সৃষ্টি হয়। তাদের চিত্তে স্থিরতার অভাব আছে। ভর্তার (স্বামী) স্নেহ বঞ্চিত হলে স্ত্রী তার স্বামীর বিরুদ্ধে ব্যাভিচার প্রক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। মণু সংহিতার সংস্কৃত ভাষ্য হল– পৌংশ্চল্যাচ্চল চিত্তাচ্চ নৈঃ স্নেহ্যাচ্চ স্বভাবত। রক্ষতাং যত্ন তোহলীহ ভর্ত্তৃস্মেতা বিকর্বতে।-(মণু সংহিতা, অধ্যায়-৯, শ্লোক-১৫)।

যেহেতু বিধবা এবং স্ত্রীদের এরূপ স্বভাব, এটা বিলক্ষণ অবগত হয়ে স্ত্রীদের রক্ষণের প্রতি পুরুষকে অতিশয় যত্নবান হতে হবে। মণু সংহিতায় সংস্কৃত ভাষ্য হল– স্বভাবং জ্ঞাত্বাসাং প্রজাপতি নিসর্গজম্ে। পরমং যত্ন মতিষ্টেৎ পুরুষো রক্ষণং প্রতি। (মণু সংহিতা, অধ্যায়-৯, শ্লোক-১৬)।

নারীদের স্বভাব

শয়ন, উপঢৌকন, ভূষণ, কাম, ক্রোধ, কৌটিল্য, পরহিংসা, ঘৃণ্য ব্যবহার, ইত্যাদি নারীদের স্বভাব সুলভ। এভাবেই সৃষ্টিকালে মণু কর্তৃক নারী পরিকল্পিত হয়েছিল (মণু সংহিতা, অধ্যায়-৯, শ্লোক-১৭)।

অধরে পিযুষ, হৃদয়ে হলাহল

পিযুষ অর্থ অমৃত। হলাহল অর্থ বিষ। মণু সংহিতা মতে নারীদের অধরে বা ঠোঁটে থাকে পিযুষ (অমৃত)। কিন্তু হৃদয়ে থাকে হলাহল (বিষ)। ধর্মীয় শাস্ত্রীয় মন্ত্র

www.nagorikpathagar.org

এবং পূজা কর্ম দ্বারা নারী হৃদয়ের উন্নতি বা সংস্কার হয় না। তাই, তাদের অন্ত করণ বা হৃদয় কখনো নির্মল হয় না।

এ কারণে বেদ স্মৃতি গ্রন্থ পাঠে নারীদের অধিকার নেই। তারা পাপ করলে মন্ত্র দ্বারা তাদের পাপ স্খালন বা দূরীকরণ হয় না। সুতরাং এরা শুধুমাত্র অপসৃষ্টি। এ সংক্রান্ত মণু সংহিতার শ্লোকটি হল–"নাস্তি শ্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিত। নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়ো স্থইতমিতি স্থিতি।"

বেদ পাঠে সার্বজনীন নিষেধাজ্ঞা

বেদ ও ধর্মীয় শাস্ত্র পাঠ হিন্দু নারীর জন্য নিষিদ্ধ। এ নিষিদ্ধতা শুধুমাত্র সাধারণ নারীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, ব্রাহ্মণ কন্যাগণও এ নিষেধাজ্ঞার ব্যতিক্রম নন। শাস্ত্র মতে, কোন হিন্দু নারী বেদ ও স্মৃতিগ্রন্থ পাঠ করতে পারে না। কোন মন্ত্র পাঠ করতে পারে না। পূজা অর্চনা করতে পারে না। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে তাদের অংশ গ্রহণের ধর্মীয় অধিকার নেই। আজকাল তারা উপস্থিত থাকে।

শুদ্র

শুদ্র শব্দের অর্থ দাস। শুদ্রগণ হিন্দু সমাজে দাসশ্রেণী তুল্য। শুদ্রানীগণ হল দাসীর সদৃশ। পুরুষগণ পাপ করলে মন্ত্র পাঠ ও পূজা অর্চনার মাধ্যমে তাদের প্রায়শ্চিত্য বা পাপ স্খালনের বিধি আছে। কিন্তু, ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রীয়া, বৈশ্যা, শুদ্রানী, নির্বিশেষে কোন হিন্দু নারীর ঐ অধিকার নেই। পূজা, অর্চনা ও ধর্মীয় জাত কর্মাদি ও সংস্কারের অধিকার না থাকার ফলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় মহিলারাও শুদ্রানী বা দাসী সমতুল্য।

পুরুষরা পাপ করে মন্ত্র উচ্চারণ করলে তাদের পাপ ক্ষয় হয়। শুদ্র ও বৈশ্য দূরের কথা, ক্ষত্রীয় বা ব্রাহ্মণ নারী ও কন্যাদেরও মন্ত্র উচ্চারণের অধিকার নেই। শাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্রাহ্মণ নারী ও কন্যাদের জীবন ও দাসীসুলভ এবং অর্থহীন বস্তু সমতুল্য।

নারীর উপাস্য

হিন্দু ধর্ম শাস্ত্র মতে, পুরুষের প্রভু বা উপাস্য হল–ঈশ্বর এবং দেবতা। নারীর প্রভু ও উপাস্য হলো–তার স্বামী। এই উপাসনা চলে স্বামী সেবার মাধ্যমে। স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে হিন্দু সতী নারী স্বামীর চিতায় সহমরণ করবে। স্বামী নিরপেক্ষ তার কোন জীবন সত্ত্বা নেই।

শিব লিঙ্গ পূজা

বৃটিশ সরকার কর্তৃক সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণ বিধবাদের পূজা হল–শিবলিঙ্গ। স্বামী ছাড়া তাদের পূজ্য কেউ নেই বিধায় হিন্দু বিধবাদের শিব লিঙ্গের পূজা করতে হয়।

www.nagorikpathagar.org

বিক্রয়কৃত অথবা পরিত্যক্ত স্ত্রীতে স্বামীর অধিকার

হিন্দু ধর্ম শাস্ত্র অনুযায়ী স্ত্রীগণের উপর স্বামীর অধিকার সীমাহীন এবং প্রবল। স্ত্রীকে বিক্রয় করে দিলে অথবা পরিত্যাগ করলেও স্ত্রীর উপর স্বামীর স্বামীত্বের অধিকার বিলুপ্ত বা বিচ্ছিন্ন হয় না এবং হ্রাস পায় না। পরিত্যক্ত বা বিক্রয় করে দেয়া স্ত্রীর উপরও স্বামী তার স্বামীত্বের যৌন অধিকার শাস্ত্র মতে প্রয়োগ করতে পারে।

মণু সংহিতা মতে, স্বামী কর্তৃক বিক্রয় বা পরিত্যাগে স্বামীর পতিত্ব বা স্ত্রীর ভার্য্যাত্ব সম্বন্ধ লোপ পায় না। ব্রহ্মার ইহাই বিধান। এ সংক্রান্ত মণু সংহিতার শ্লোকটি হল–ন নিষ্ক্রয়বিসর্গাভ্যাং ভর্ত্তৃর্ভার্য্যা। বিমুচ্যতে এবং ধর্ম্মং বিজানীমঃ প্রাক্ প্রজাপতি নির্ম্মিতম।-(মণু সংহিতা, অধ্যায়-৯, শ্লোক-১৬)।

স্কন্দ পূরাণ মতে নারী

স্কন্দ পূরাণে নারীর অধিকার সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা এবং শ্লোক আছে। স্কন্দ পুরাণ মতে নারীর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বা দোষ অনেকগুলো। এর মধ্যে আছে– (১) নির্দ্দয়ত্ব, (২) বিদ্রোহ, (৩) কুটিলতা, (৪) অশৌচ, (৫) নির্ঘৃনত্ব।

নির্দ্দয়ত্ব অর্থ হল– নারী নির্দয়, কঠোর এবং পাথরের মত। তাদের মধ্যে স্বামীর নির্দেশ লঙ্ঘন এবং বিদ্রোহের ভাব আছে। তারা জটিল, কুটিল। তাদের মুখে এক– হৃদয় ভিন্নরূপ। তাদেরকে বুঝা কঠিন।

নারী অপবিত্র এবং অশৌচ। তাদের মধ্যে নির্ঘৃনত্ব আছে। তারা নির্লজ্জ, বেহায়া এবং যে কোন পাপ কর্মে ঘৃণাহীন।

এ সংক্রান্ত স্কন্দ পুরাণের শ্লোকটি হল–"নির্দ্দয়ত্বং তথা–দ্রোহং কুটিলত্বং বিশেষত। অশৌচং নির্ঘৃনত্বঞ্চ স্ত্রীনাং দোষাঃ স্বভাবজাঃ।-(স্কন্দ পুরাণ, নাগর খণ্ড, শ্লোক-৬০, পৃষ্ঠা-৪১৫৩)।

অন্তর্বিষ ও পিয়ুষ

স্কন্দ পুরাণে নারীর অন্তকরণে আছে অন্তর্বিষ বা হলাহল। তবে তাদের বহির্ভাগ গুঞ্জাফলের মত মনোরম এবং সম আকৃতির। এ বিষয় সর্ব দৈব শাস্ত্রে উল্লেখিত আছে। স্কন্দ পূরাণ মতে ৬১ নং শ্লোকে বলা হয়েছে–অন্তর্বিষঃ ময়-হ্যেতা-বহির্ভাগে মনোরমাঃ। গুঞ্জফল সমাকার ঘোষিত সর্বদৈবহি।

স্কন্দ পুরাণ মতে নারীর অধরে রয়েছে পিযূষ বা অমৃত। তাই নারীর অধর বা নিম্ন ওষ্ঠ আস্বাদন করতে হবে। নারীর হৃদয়ে হলাহল রয়েছে–তাই নারীর উপর দৈহিক অত্যাচার করতে হবে। হৃদয় পীড়ন করতে হবে।-(স্কন্দ পুরাণ, নাগর খণ্ড, শ্লোক-৬১)।

www.nagorikpathagar.org

বিধবা

বিধবাদের প্রতি কি ধরণের আচরণ করতে হবে ? তারও বিধান মণু সংহিতায় আছে। স্বামী হারা হয়ে তারা শিব লিঙ্গ পূজা করলে তাদের আধ্যাত্মিকতা লাভ হয়।

শিবলিঙ্গ পূজারী বা শিবলিঙ্গ সেবিকাকে হরণ এবং স্পর্শ করা যাবে না। যদি কেউ শিবলিঙ্গ সেবিকা দাসীকে হরণ করে, তবে তাদেরকে চিরকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

মাতৃগমন

কামার্ত হলে কেউ মাতৃগমন করতে পারবে। স্বীয় মাতার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হতে পারবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই শিব লিঙ্গ সেবিকা গমন করতে পারবে না। এ বিধান রয়েছে পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি খণ্ডের ৯১ নম্বর শ্লোকে, পৃষ্ঠা- ১৭১৪।

উপরোক্ত শ্লোক ও নির্দেশ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, কোন শিব লিঙ্গ পূজারী মাতৃগমন করতে পারবে। মাতার সাথে যৌনতায় লিপ্ত হতে পারবে। কিন্তু শিব লিঙ্গ সেবিকাদের গমন করা যাবে না। অর্থাৎ তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হতে পারবে না।

স্কন্দপুরাণ মতে, কোন দাসী অগম্যা নন এবং স্বীয় মাতাও অগম্যা নন। অর্থাৎ মাতার সাথে যৌনতায় লিপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু শিব লিঙ্গ সেবিকা গমন করতে পারবে না। কিন্তু মাতৃগমনের মাধ্যমে কামত্তেজনা চরিতার্থ করতে পারবে।

৩৩
হিন্দু নারীর ধর্মীয় অধিকার

মনুর বিধান মতে বেদ পাঠ করা অথবা বেদের পাঠ শ্রবণ করার কোন অধিকার হিন্দু নারীর বা শুদ্রদের নেই। বেদ সম্পর্কীয় কোন উৎসাহ বা প্রাসঙ্গিকতা হিন্দু নারীর থাকতে পারে না।

মনু রচিত "ধর্ম শাস্ত্রমন্ত্র" অনুসারে নারীদের জন্য বেদ পাঠ করা নিষিদ্ধ। এমনকি অন্যের পাঠ করা বেদ এর শ্লোক শ্রবণ করা পর্যন্ত নিষিদ্ধ এবং শাস্তি যোগ্য অপরাধ।

এ যুগেও নারীদেরকে বেদ পাঠে প্রকাশ্যভাবে বাধা দেয়া হয়। পুরী এর শংকরাচার্য স্বামী নিচালন্দ ১৬ই জানুয়ারী ১৯৯৪ তারিখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে জনৈক নারীর বেদ পাঠ বন্ধ করে দিয়েছিলেন (Dalit Voice: 1-15 February, 1994).

বেদের শ্লোক পাঠের সময় এবং প্রার্থনার সময় হিন্দুনারীদের পক্ষ হয়ে কোন প্রার্থনা করা যায় না। পুরুষের এবং পুত্রের জন্য বেদের শ্লোক পাঠ করে প্রার্থনা

www.nagorikpathagar.org

করা যায়। কন্যা এবং নারীর কল্যাণের জন্য বেদের শ্লোক পাঠ করে কিছু বলা বা প্রার্থনা করা যায় না।

মহিলাদের পরিত্রাণের জন্য বেদের বাণী উচ্চারণ করে কিছু করা এবং বলা যাবে না। বেদের শ্লোকের মর্মবাণী পর্যালোচনা করে অনুভব করা যায় না যে, আর্যদের নারীর পূণ্য অথবা পবিত্রতা সম্পর্কে কোন উচ্চ ধারণা ছিল (Wilkins, 1975, p- 180, 188).

হিন্দু নারীর ধর্মীয় অধিকার

স্বামীর অনুমতি ও সম্মতি ছাড়া স্ত্রীর ধর্মীয় অধিকারও নেই। মনুর বিধান মতে হিন্দু নারীর স্বামীর অনুমতি ভিন্ন কোন পূজা, অর্চনা এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান অথবা ধর্মীয় উপবাসের কোন অধিকার নেই।

হিন্দুনারীগণ স্বরসতী পূজা করতে পারেন না অথবা পূজায় অংশগ্রহণ করতে পারেন না যদিও দেবী স্বরস্বতী নিজেও একজন নারী (Wilkins, 1975, p-80).

হিন্দু নারী তীর্থ যাত্রা করতে পারেন এবং তীর্থে ভ্রমণ করতে পারেন। কিন্তু পবিত্র তীর্থ স্থানে অথবা মন্দিরে তারা পূজা করবে স্বামীর নামে। স্বাধীনভাবে বা স্বামী নিরপেক্ষভাবে দেবতার পূজা করার অধিকার হিন্দু নারীর নেই।

স্ত্রী যতটুকু স্বামীকে দেবতা হিসাবে সম্মান করবেন, স্বর্গে তার মর্যাদা ও সম্মান সে অনুপাতে হবে। যদি কোন বিশ্বস্ত স্ত্রী স্বর্গে স্বামীর প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা অথবা মর্যাদা পেতে চান– তবে স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করার অধিকার স্ত্রী ভোগ করবে না। এমনকি তার স্বামীর মৃত্যুর পরেও না (Wilkins, 1975, p-181).

হিন্দু ধর্ম মতে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও নারীর কোন অধিকার নেই। মনু রচিত ধর্মশাস্ত্র মতে কোন নারী নিজের পরিচয়ে ঈশ্বরের কাছে কোন কিছু কামনা করতে পারে না। তার পরিচয় হবে স্বামীর পরিচয়।

কোন নারী নিজের পরিচয়ে কোন কিছু দান করলেও তা দান হিসাবে গণ্য হবে না। কারণ, স্বামীর আওতা বহির্ভূত কোন সম্পদ তার নেই। ভিক্ষুককে দান করতে হলেও স্বামীর পরিচয়ে অথবা পক্ষ হয়ে দান করতে হবে।

নারীগণ সাধারণত অধিকতর ধর্মপরায়ণ হয়। নারীর সকল ধর্ম, কর্ম, দান, উপবাস– সব কিছুই স্বামীর নামে করতে হবে (Wilkins, পূর্বোক্ত, p- 181).

কোন কোন হিন্দু ধর্মীয় বিধিমালায় নারীর চুড়ান্ত পরিত্রাণের কোন বিধান নেই এবং স্বর্গীয় আনন্দ তারা পাবে না। নারীদের স্বর্গে যাওয়ার পদ্ধতি হল এক জন্মে পুরুষ হিসাবে জন্ম গ্রহণ করা (Wilkins, 1975, p- 80).

www.nagorikpathagar.org

৩৪
হিন্দু নারীর আর্থ-সামাজিক অধিকার

হিন্দু ধর্মে মহিলাদের স্থান অত্যন্ত সীমিত এবং নারী হলেন পুরুষের দাসীসম। তাদের সামাজিক মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার বিষয় বিবেচনা করলে মনে হয় পুরুষের জন্য বা পুরুষের সেবার জন্য নারীর জন্ম। তাদের সামাজিক মান মর্যাদা অন্যান্য ধর্মের সাথে তুলনায় অত্যন্ত নিম্ন স্তরের।

স্বকীয়তা বনাম নির্ভরশীলতা

মনু তাঁর ধর্ম শাস্ত্রে লিখেছেন, "কোন বালিকা অথবা যুবতী অথবা বৃদ্ধা স্বীয় ইচ্ছায় কোন কিছুই করতে পারবে না– তার বাসস্থানে অথবা অন্যত্র"।

বাল্যকালে কন্যা তার পিতার ওপর নির্ভরশীল। বিবাহের পর স্বামীর ওপর এবং স্বামীর মৃত্যুর পর নারী পুত্রদের ওপর নির্ভরশীল। কোন নারীর স্বাধীনতা বা স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি নেই (মনু ঃ ধর্ম শাস্ত্র, অধ্যায়-৫, পৃ. ১৬২-৬৩, Wilkins, Modern Hinduism, London- 1975, p- 180).

মনু হলেন আদি মানব এবং হিন্দুইজমের আইন প্রণেতা ও বিধানদাতা। মনুর বিধান প্রতিফলিত হয়েছে মনু রচিত "ধর্ম শাস্ত্রে"এবং "মনু স্মৃতিতে"।

যদি কোন নারীর সন্তান না থাকে, তবে তাকে নির্ভরশীল হতে হবে স্বামীর নিকটবর্তী আত্মীয়ের ওপর। যদি কোন নারীর স্বামী পক্ষীয় কোন আত্মীয় না থাকে, তবে সে নির্ভর করবে তার পিতার ওপর। পিতার অবর্তমানে এবং পিতার কোন আত্মীয় না থাকলে সে নির্ভর করবে রাষ্ট্রের উপর (Wilkins, Modern Hinduism, p- 19).

মালিকানার অধিকার

হিন্দু ধর্মে নারীর সম্পত্তির মালিকানার কোন অধিকার নেই। নারী অর্থ রোজগার করতে পারে। কিন্তু অর্জিত অর্থ বা ক্রয়কৃত অর্থ সম্পত্তির মালিক তারা হতে পারবে না। বিবাহিত স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্ত্রীর নিজস্ব আয় এবং সম্পত্তির মালিক হবে তার স্বামী।

অবিবাহিত নারীর আয়ের বা সম্পত্তির মালিক তার পিতা এবং বিধবা হলে সম্পত্তির মালিক হবে তার পুত্র। বিধবা নারীর সন্তান না হলে ঐ সম্পত্তির মালিক হবে স্বামীর পর্যায়ক্রমিক পুরুষ আত্মীয়গণ।

সম্পত্তির মালিকানা

মনুর ধর্মশাস্ত্র মতে তিন ব্যক্তি কোন সম্পত্তির মালিক হতে পারে না। এ তিন ব্যক্তি হচ্ছে (১) দাস, (২) স্ত্রী (৩) পুত্র। যদি কোন দাস অথবা বিবাহিতা স্ত্রী অথবা

www.nagorikpathagar.org

পুত্র কোন সম্পত্তি অর্জন করে, তবে তার মালিক হবে যথাক্রমে দাস-দাসীর প্রভু, স্ত্রীর স্বামী অথবা সন্তানের পিতা। কারণ, শেষোক্ত ব্যক্তি তাদের মালিক।

স্বাধীনতা

হিন্দু ধর্মীয় বিধান মতে সমাজে নারীর কোন স্বাধীনতা নেই। এ ধর্মীয় বিধান আছে ভগবান মনু প্রণীত গ্রন্থে। এ ঐশ্বরিক ধর্মীয় বিধান মতে কোন বালিকার অথবা যুবতীর অথবা বৃদ্ধা নারীর নিজস্ব বাসস্থানের মালিক হওয়ার এবং স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছা মত কোন কাজের অধিকার নেই।

শিশুকালে, কৈশোরে এবং বিবাহের পূর্বে নারীকে চলতে হবে পিতার নির্দেশ অনুসারে। যৌবনে তার প্রভুর (স্বামীর) নির্দেশানুসারে। প্রভুর (স্বামীর) মৃত্যুর পর তার পুত্রদের ইচ্ছানুসারে। একজন নারী কখনো এবং অবশ্যই স্বাধীনভাবে চলবে না। (Wilkins, 1975, p- 185).

মনুর ধর্ম শাস্ত্র মতে আট প্রকার বিবাহ বৈধ। এ মধ্যে একটি হচ্ছে– রাক্ষস বিবাহ যা অপহরণ এবং জোর পূর্বক বিবাহ (Willkins, Modern Hinduism, London, 1995, p- 185).

মনুর নারী সংক্রান্ত এবং ধর্মশাস্ত্রে উল্লেখিত কিছু কিছু বিধান নিম্নরূপঃ একজন পুরুষের করণীয় কর্তব্য হলো এমন প্রতাপ-প্রভাবের মধ্যে নারীকে রাখা যেন সে নিজের ইচ্ছায় করণীয় কাজের ক্ষমতা এবং প্রবণতা হারিয়ে ফেলে।

যদি কোন নারী স্বামী অপেক্ষা উন্নত জাতের অথবা বংশের কন্যাও হয় এবং যদি স্ত্রীকে তার নিজের ইচ্ছা মত চলার অধিকার দেয়া হয়, সে বিপদগামী হবে।

কোন নারীকে কখনো বিশ্বস্ত মনে করা যাবে না। তাকে পাহারায় রাখতে হবে। কোন নারীর উপর আস্থা রাখা যাবে না। যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীর উপর আস্থাশীল হয়, তবে অবশ্যই তাকে এর পরিণতিতে ভিক্ষুক হিসাবে পথে পথে চলাফেরা করতে হবে এবং পথভ্রষ্ট হয়ে বিচরণ করতে হবে।

বহু বিবাহ

হিন্দু ধর্মে বহু বিবাহ শুধু মাত্র বৈধ নয়, কত জন স্ত্রী একজন পুরুষের থাকতে পারে, তার কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। সীমা নেই উপ-পত্নীর সংখ্যারও। ভগবান বিষ্ণুর অবতার শ্রী কৃষ্ণের সাথে একদিনে ১৬,০০০ নারীর গণ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল (BR Ambedkar, p-25, Riddle of Rama & Krishna, Bangalore, 1988).

শ্রীকৃষ্ণের সর্বমোট স্ত্রী সংখ্যা ছিল ১৬ হাজার ১০৮ জন। বিষ্ণুর অপর অবতার রামচন্দ্র এবং তার পিতা রাজা দশরথেরও বহু পত্নী আরো বহু সংখ্যক উপ-পত্নি ছিল।

www.nagorikpathagar.org

বিবাহ বিচ্ছেদ

পুরুষের স্ত্রী পরিত্যাগের অধিকার মনু প্রদত্ত ধর্ম শাস্ত্রে স্বীকৃত। কিন্তু স্ত্রীর স্বামী পরিত্যাগের কোন অধিকার নেই। স্বামী যত নিষ্ঠুর বা বর্বরই হোন না কেন, তাকে দেবতা হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং স্বামীর বর্বরতা নারীকে সতী হিসাবে সহ্য করতে হবে।

বিবাহের পর ৭ বছরের মধ্যে কোন পুত্র সন্তান না হলে স্বামী তার স্ত্রী পরিত্যাগ করতে পারবে এবং অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে।

যদি কোন স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে কটু কথা বলে–ঐরূপ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা যাবে। যদি কোন স্ত্রী মদ্যপান করে অথবা তার প্রভুর (স্বামী) প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে অথবা দুষ্ট বুদ্ধিপ্রবণ হয় অথবা স্বামীর সম্পত্তি নষ্ট করে, তবে যে কোন সময় স্বামী তাকে পরিত্যাগ করতে পারবে (Wilkins, 1975, p- 181, 183, 185). যদি কোন স্ত্রী স্বামীর পূর্বে আহার করে এরূপ স্ত্রীকে গৃহ থেকে বহিস্কার করতে হবে।

স্ত্রী নির্যাতন

মনুর বিধান মতে স্বামী নিষ্ঠুর এবং অবিশ্বস্ত হলেও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় না। স্বামী যদি বৈবাহিক সম্পর্ক সংক্রান্ত বিধি বিধান পালন না করে, অথবা পর স্ত্রীর প্রতি আকর্ষিত হয় অথবা সকল মানবীয় গুণ রহিত হয়, তবুও তাকে ঈশ্বর এবং দেবতা হিসাবে গণ্য করতে হবে।

স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে তার স্ত্রী সতী হিসাবে সহমরণে না গেলে সারা জীবনে বৈধব্য ধর্ম অবলম্বন ও পালন করতে হবে।

সকল মানুষেরই অত্যাচার নির্যাতনের প্রতিকারের জন্য বিচারের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মনুর বিধানে নির্যাতিত স্ত্রীর নিষ্ঠুর স্বামীর হাত থেকে পরিত্রাণের কোন পদ্ধতি নেই।

স্বাধীন ভারতে হিন্দু নারীর ধর্মত্যাগের প্রবণতা রোধকল্পে স্ত্রীর অধিকার সংক্রান্ত আইন পাশ করতে হয়েছে। মনুর বিধান অনুসরণ করে স্বামীর নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র পদ্ধতি হচ্ছে সম্ভবত ধর্ম ত্যাগ করা অথবা পালিয়ে যাওয়া।

স্বামীর অনুমতি ভিন্ন স্ত্রী কখনো তার বাড়ীর বাইরে যাবে না। স্ত্রী কখনো অপরিচিত লোকের সাথে আলাপ আলোচনায় লিপ্ত হবে না। স্ত্রী কখনো মুখের উপরে ঘোমটা না টেনে হাঁটবে না এবং হাসবে না। স্ত্রী কখনো দরজায় দাঁড়াবে না। স্ত্রী কখনো জানালা দিয়ে বাহিরে তাকাবে না (Wilkins, 1975, p- 185, 186).

www.nagorikpathagar.org

মনুর ধর্মশাস্ত্র মতে, নারীদের বহুরূপ আচরণগত বিধিমালা বর্ণিত আছে। এর অনেকগুলোই ইংরেজী Code of Hindu Laws, 1776-এ উল্লেখিত হয়েছে।

স্বামী সংসারে নারীর অবস্থান

W. J. Wilkins তাঁর রচিত Modern Hinduism, London, 1975 এ উল্লেখে কিছু কিছু বিধান নিম্নরূপ ঃ

(১) যে স্ত্রী স্বামীর পূর্বে আহার করবে তাকে অবশ্যই গৃহ থেকে বিতাড়িত করতে হবে।

(২) কোন নারী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত গৃহের বাইরে যাবে না।

(৩) কোন নারী তার মুখের উপরে লম্বা ঘোমটা না টেনে হাসবে না।

(৪) কোন নারী গৃহের দরজার সম্মুখে অবশ্যই দাঁড়াবে না।

(৫) কোন নারী গৃহের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাবে না।

(৬) স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দিবানিশা এমন শাসনের মধ্যে রাখতে হবে যেন তার নিজস্ব কোনো ইচ্ছা শক্তি অথবা কর্মস্পৃহা না থাকে।

(৮) যদি উচ্চ বর্ণ বংশোদ্ভুত হওয়ার কারণে কোনো নারী স্বাধীন ভাবে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কোন কর্ম সম্পাদন করে, সে নারকী হবে।

(৯) স্বামী কর্তৃক কোন নারীকে নির্ভরযোগ্য গণ্য করা যাবে না।

(১০) কোনো নারীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যাবে না।

(১১) যদি কোনো পুরুষ কোন নারীকে বিশ্বাস করে, তবে তাকে ভিক্ষুকে পরিণত হয়ে রাস্তায় রাস্তায় বিচরণ করতে হবে।

দেবদাসী প্রথা

সতীদাহ করা হয় সতীত্বের পবিত্রতা এবং সতীত্বের প্রামান্য অনুষ্ঠান হিসাবে। কিন্তু দেবদাসী প্রথাটি সতীত্বের সম্পর্ণ বিপরীত। কারণ দেবদাসীগণকে পুরোহিতদের যৌন চাহিদা পূরণ করতে হয়। তদুপরি বিত্তশালীদের যৌন সেবায় নিয়োজিত হতে হয়। এজন্য তীর্থ যাত্রীগণ অর্থ ব্যয় করেন পুরোহিতদের মাধ্যমে।

তরুণ বয়সে বিধবা হয়ে অনেককে জৈবিক প্রয়োজনে মন্দিরের সেবাদাসী অথবা দেবদাসী হতে হয় অথবা নিয়মিতভাবে অনৈতিক জীবন যাপন করতে হয়। দক্ষিণ ভারতে কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ করে তুলব ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু বিধবাদের ধর্মীয় বিধি হিসাবে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করা যথাযথ (C. Oman, p-195).

উইলকিনস সাহেব একজন হিন্দু বিধবার ঈশ্বরের কাছে করুণ মিনতি উল্লেখ করেছেন। প্রার্থনাটি নিম্নরূপ ঃ "হে প্রভু! এভাবে নিদারুণ দহনজ্বালা সহ্য করার

www.nagorikpathagar.org

জন্য তুমি কেন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছ ! জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দুঃখই আমাদের নিয়তি!

"স্বামীর জীবদ্দশায় আমরা স্বামীদের দাসী। তাঁদের মৃত্যুর পর আমাদের অবস্থা আরো করুণ। কিন্তু, এ জীবনে স্বামীগণ যা ইচ্ছা তাই তারা উপভোগ করতে পারেন এবং মৃত্যুর পরেও তাঁদের জন্য স্বর্গের সকল বিনোদনের ব্যবস্থা আছে। এটা কি ধরণের বিচার।" (Wilkins, 1975, p-196).

৩৫
বিধবা ও বাল্যবিবাহ

হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ। স্বামীর মৃত্যুর পরও বিধবাগণ পূর্ব স্বামীর স্ত্রী হিসাবে গণ্য হন। তাই অন্য কারো সাথে বিবাহ বিধি সম্মত নয়।

যারা কোন বিধবাকে বিবাহ করে– তারা সমাজচ্যুত হিসাবে গন্য হয়। মনু রচিত ধর্ম শাস্ত্রে বলা হয় যে– যে ব্যক্তি দু'বার বিবাহিত কোন নারীর স্বামী, তাকে সচেতনভাবে জাতিচ্যুত করতে হবে। কারণ, দ্বিতীয় স্বামীর বিবাহিত বিধবা এবং বিধবার গর্ভজাত সন্তান অবৈধ এবং জাতিচ্যুত, যদিও ঐ সন্তান হয় বিধবার নব বিবাহিত স্বামীর ঔরসজাত।

বিধবা গঞ্জনা

স্বামীর সাথে সতীদাহে মৃত্যু বরণ না করলে বিধবা স্ত্রীকে করুণ জীবন-যাপন করতে হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে তার মস্তক মুন্ডন করতে হয় এবং সকল প্রকার অলংকার পরিধান করা বিধবার জন্য নিষিদ্ধ।

বিধবা তার বিধবা পূর্বকালীন নিয়মিত শয্যায় শয়ন করতে পারে না। তাকে মাদুর বিছিয়ে ভূমি শয্যায় শয়ন করতে হয়। তদুপরি তাদের আহার হয় দৈনিক এক বেলা।

কু-লক্ষণা হিসাবে পরিবারে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে বা বিবাহ শাদীতে বিধিমত বিধবা উপস্থিত থাকতে পারে না। বিধবাদের কুলক্ষণা এবং অপবিত্রা গণ্য করা হয়। (Oman, p- 193).

বিধবা মহিলাদের শুধু যে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়, তা নয়। বরং তাদের উপস্থিতি কোন শুভ অনুষ্ঠানে পাপ হিসাবে গণ্য হয়। তাদের ছায়াও অপবিত্র গণ্য করা হয়। (Oman, J.C. p-193).

১৮৫৬ সালে বৃটিশ সরকার কর্তৃক ১৫ নং আইনের মাধ্যমে বিধবা বিবাহ আইনসঙ্গত ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ধর্মীয় বিধান অনুসারে তা নিষিদ্ধ থেকে যায়।

www.nagorikpathagar.org

পিতৃহীন বিধবা

বিধবাদের মধ্যে সবচেয়ে করুণ এবং মর্মান্তিক অবস্থা হল পিতৃ মাতৃহীন বিধবাদের। নিজের সংসারেও তাদেরকে সন্তানদের বা পুত্রদের স্ত্রীদের সেবিকা হিসাবে অবস্থান নিতে হয়।

যদি বিধবাদের পিতৃ গৃহে চলে আসতে হয়, তারা পরিণতি হয় ভ্রাতৃবধুদের দাসী বা সেবিকাতে।

যদি কোন গৃহে বিধবা থাকে– ঐ গৃহে ভৃত্যার প্রয়োজন আছে, তা অনুভব করা অনেক ক্ষেত্রেই হয় না। (Oman, p- 218).

কোন হিন্দু নারীর পক্ষে তার প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য ব্যক্তিকে স্বামী হিসাবে উল্লেখ করা অবৈধ এবং কলুষিত। এরূপ নারী তার প্রয়াত প্রভু বা স্বামীর সাথে সম্পর্কচ্যুত। (Wilkins, 1975, p- 211).

যদিও মনুর বিধান মতে বিধবা বিবাহ বৈধ নয়, কিন্তু বিপত্নীক এর অন্য স্ত্রী গ্রহণ এবং বিবাহ বিধিসম্মত। তিনি স্ত্রীর মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিবাহ করতে পারেন এবং স্ত্রীর সংখ্যাও সীমিত নয়।

মনুর ধর্মানুসারে স্বামীর মৃত্যুর পর কোন নারীকে অন্য কোন পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করার সম্মতি দেয়া নিষিদ্ধ। যারা তা করবে, তারা অনন্তকাল ধরে নরকে দাহ হবে।

এ নিষ্ঠুর পরিণতি হতে একবার জীবন্ত দাহ হওয়াই বুদ্ধিমান ও সুবিবেচনার কাজ। বিধবাদের ওপর বর্বরোচিত আচরণের একটি পরিণতি তাদের আত্মহত্যা।

সতীদাহ

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বাংলা প্রেসিডেন্সিতে সরকারী হিসাব মতে ৮৩৯ টি সতীদাহ ঘটনার উল্লেখ আছে (S. R. Sharma, The Making of Modern India, Bombay, 1951, p- 478).

পাঞ্জাবের মহা রাজা রনজিৎ সিংহের ১৭৩৯ সালে দাহ কালে সতীদাহ অনুষ্ঠিত হয়। এতে তার ৪ জন স্ত্রী এবং ৭ জন মহিলা দাসীকে রনজিৎ সিংহের চিতায় তার মৃতদেহ দাহ করার সময় দাহ করা হয়। (John Campbell, পূর্বোক্ত p- 192),

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার আইনের মাধ্যমে মৃত স্বামীর চিতায় জীবন্ত স্ত্রীকে দাহ করা নিষিদ্ধ করেন। যে সমস্ত নারীকে স্বেচ্ছায় বা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জীবন্ত দাহ করা হয়, তাদেরকে সতী নামে আখ্যায়িত করা হয়। সতী হিসেবে জীবন্ত দাহ হওয়া হিন্দু ধর্মগ্রন্থ মতে স্বামী হারা স্ত্রীর অবশ্য করণীয় কর্তব্য হিসেবে গণ। (Wilkins, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২২).

www.nagorikpathagar.org

হিন্দুশাস্ত্রে বাল্য বিবাহ

হিন্দুশাস্ত্র মতে বালিকা বিবাহ বাধ্যতামূলক। এরও বিধান দেয়া আছে মনু প্রণীত মূল পবিত্র গ্রন্থ "ধর্মশাস্ত্রে"। মনুর বিধি মতে ৭ বছর বয়সের মধ্যে বালিকার বিবাহ সম্পাদন করতে হবে। তা না করা ধর্মীয় বিধান বিরোধী।

৮ বছর বয়সেই বালিকা "গৌরী" হিসাবে বিবেচিত হবে। শিবের স্ত্রী ছিলেন ৮ বছর বয়স্কা এবং এ ৮ বছর বয়স বিবাহের জন্য উৎকৃষ্ট। ৯ বছর বয়সে বালিকা রুহিনী হিসাবে বিবেচিত। চন্দ্র দেবতা (আকাশের চন্দ্র) দেবতার স্ত্রী রুহিনী ছিলেন ৯ বছর বয়স্কা।

১০ বছর বয়সেই কোন অবিবাহিতা বালিকা উপেক্ষিতা হিসাবে বিবেচিত। বিবাহের জন্য হিন্দুশাস্ত্র মতে আদর্শ বয়স হচ্ছে ৭-৯ বছর। যদি কোন পিতা স্বীয় কন্যাকে ১১ বছর বয়সের পূর্বে বিবাহ না দিতে পারে, তবে ঐ কিশোরীর নিজের পছন্দ মত স্বামী গ্রহণের অধিকার থাকবে।

আদি মানব মনু প্রণীত ধর্ম শাস্ত্র মতে মেয়েদেরকে সাত বছর বয়সেই বিবাহ দিতে হবে এবং এ বিধি লঙ্ঘন করা ধর্ম বিরুদ্ধ। (Willkins, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫).

বৈশালি বিবেচিত হয়– ঐ বালিকা যার বিবাহের পূর্বে রজস্রাব (ঋতু) হয়ে যায়। এরূপ অবিবাহিত বালিকার সাথে কোন ব্যক্তির যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হলে তা অপরাধ হিসাবে গণ্য নয়। বরং সেই হবে বালিকার স্বামী হওয়ার অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি।

পরবর্তীতে বৃটিশ আমলে শিশু বিবাহ বিরোধী আইন পাশ হয়। এতে নারীদের বিবাহের সম্মতির সর্বনিম্ন বয়স রাখা হয় ১২। ভারতের হিন্দু সম্প্রদায় এ আইনের তীব্র বিরোধিতা করেন। (John Compbell Oman, The Brahmans, Theists and Muslims of India, Delhi- 1973, p- 185-186)।

বৃটিশ সরকার ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে আইন করে বাল্য বিবাহ রহিত করেন। এ আইন হিন্দু মুসলিম কর্তৃক সমালোচিত হয়। মুসলিম আইনে বাল্য বিবাহ নিরুৎসাহিত করা হয়। কিন্তু অবৈধ বিবাহ হিসাবে তা গণ্য নয়।

www.nagorikpathagar.org

১১তম অধ্যায়

৩৬

দেবদাসী প্রথা

দবদাসীগণ হলেন দেবতাদের দাসী। তারা মন্দিরে দেবদেবীদের পুরোহিতদের সেবা এবং মন্দিরের সেবায় নিয়োজিত। পবিত্র দেবদাসী প্রথার মাধ্যমে হিন্দু যুবতী এবং বালিকাদেরকে দেবতাদের সাথে বিবাহ দিয়ে দেয়া হয়। দেবতাদের জন্য উৎসর্গকৃত এ নারী এবং বালিকাগণ ধর্মীয় শাস্ত্রে উৎসর্গকৃত গণ্য করা হয়। (John Cambell Oman, The Brahmans, Theists and Muslims of India, p- 300, Delhi, 1973., মুরতাহিম বিল্লাহ ফজলী- ১২০).

দেবতার উদ্দেশ্য উৎসর্গকৃত এ বালিকাগণ পূজারীদের আনন্দ বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এ প্রথায় কোন প্রকার রাখঢাক ছিল না। দেবদাসী পূজা অর্চনায় প্রধান মন্ত্র ছিল নিম্নরূপঃ বেশ্যা দর্শনম পূণ্যম, পাপ নাশনম অর্থাৎ মন্দিরের বেশ্যা দর্শন করলেই পূন্য হয় এবং পাপ বিনাশ হয়ে যায় (তীর্থ, পৃষ্ঠা- ১৯৪, ফজলী- ১২০)।

দেবদাসীদের সেবার মধ্যে আছে পুরোহিতদের এবং পূজারীদের সঙ্গে দেবদাসীদের যৌনকর্ম এবং লীলা। মন্দিরের দেবদাসী প্রথা মন্দির কেন্দ্রীক বেশ্যাবৃত্তি।

দক্ষিণ ভারতে দেবদাসীদেরকে দেবতার কন্যা হিসাবে গণ্য করা হয়। বহু পিতাই দেবতার জন্য একটি কন্যা উৎসর্গ করা অতি পূণ্য কাজ হিসাবে বিবেচনা করতেন।

যে সমস্ত বালিকাদেরকে দেবতার উদ্দেশ্য উৎসর্গ করে মন্দিরের পুরোহিতদের কাছে অর্পণ করা হত, তাদেরকে পুরোহিতগণ লেখাপড়া, নৃত্য-কলা, সঙ্গীত-চর্চায় শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দিতেন। কিভাবে মনি মুক্তা, অলংকার দেহে ধারণ করতে হয় এবং পোশাক পরিচ্ছদ আকর্ষণীয়ভাবে পরিধান করতে হয়– এর উপর দেবদাসীগণকে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো।

দেবদাসীগণের তের বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাদেরকে দেবতা শুভ্র মানিয়ার সাথে বিবাহ দিয়ে দেয়া হত। এ অনুষ্ঠানে দেবতা শুভ্র মানিয়া উপস্থিত থাকতেন না। তার প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত থাকত দেবতার পাথর মূর্তি।

দেবতা শুভ্রা মানিয়ার সাথে বিবাহ সম্পাদনের পরই বর কনের মিলনের অনুষ্ঠান হত। এতে মন্দিরের ভক্তগণ অংশগ্রহণ করতেন। তাদের মধ্যে কনের নিকটতম আত্মীয় স্বজনও অন্তর্ভূক্ত হতে পারতেন। এ প্রথার মাধ্যমে মন্দিরের আয় বৃদ্ধির সদর দরজা খোলা হয়ে যেত (ধর্মতীর্থ, পৃষ্ঠা-১২৭, ফজলী- ১২১)।

www.nagorikpathagar.org

বৃটিশ সরকার এ প্রথা আইন করে বন্ধ করে দেন, যেমন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল সতীদাহ প্রথা এবং প্রবর্তন করা হয়েছিল বিধবা বিবাহ প্রথা। সরকারের পক্ষ থেকে এ প্রথা ছিল বেআইনী। কিন্তু, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এটা ছিল বিধি সম্মত এবং পূণ্য কর্ম। তাই ভারতের বহু স্থানে এ প্রথা ঢাক ঢোল পিটাবার পরিবর্তে নীরবে চলতে থাকে। (Trumble-246, Fazli 121).

৩৭
সতীদাহ ও নরবলী

সতীদাহ প্রথা

হিন্দুধর্মে স্বামী হল স্ত্রীর কাছে দেবতা স্বরূপ। স্বামীর সেবার জন্যই স্ত্রীর সৃষ্টি। স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে সেবার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়। স্ত্রী সংসারে অপ্রয়োজনীয় গণ্য হয়। বিভিন্ন ধর্মীয় কারণে স্ত্রীকে স্বামীর চিতায় জীবন্ত দাহ করা হয়।

শিশু সন্তানদের জন্যে মাতৃ মৃত্যু বেদনাদায়ক তো বটেই বরং, বহু সমস্যা সঙ্কুল। সতীদাহের ফলে স্ত্রীদের নির্বাণ বা মুখ্য লাভ হবে। তারা স্বর্গবতী হবেন। এ প্রথা আদিকাল থেকে চলছিল।

বাঙ্গালী সামাজিক রাজনৈতিক নেতা রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে বৃটিশ গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক এর সময়ে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহ নিষিদ্ধকরণ আইন পাশ হয়। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও হিন্দু সমাজ সতীদাহকে হিন্দু ধর্মে সরকারী হস্তক্ষেপ হিসাবে গণ্য করেন।

ধর্মীয় অনুশাসন হিসাবে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু, তা জন সমাদৃত ছিল না। স্বাধীন ভারতেও সতীদাহ নিষিদ্ধকরণ আইন বাতিল করে সতীদাহ বৈধ করা হয়নি। তবে স্বেচ্ছায় অথবা সতীদের ইচ্ছার বিরূদ্ধে এখনো কিছু কিছু সতীদাহ ঘটে থাকে।

নরবলী প্রথা

বৃটিশের আগমনের পূর্বে ভারতে নরবলী প্রথা প্রচলিত ছিল। যেখানে কালি মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল সেখানে এর চাহিদা ছিল বেশী। দেব-দেবীদের মধ্যে রক্ত এবং মাংসের চাহিদা মহাদেবী কালির সবচেয়ে বেশী। মহাকালী দেবী সমগ্র ভারতে উপাস্য দেবী এবং মহাদেবতা শীব এর স্ত্রী।

হিন্দু ধর্মীয় বেশ কিছু সম্প্রদাায়ের মধ্যে কালীপূজার চাহিদা আছে। থগী পূজা অসম্পূর্ণ থেকে যায় নরবলী ছাড়া। দেবী দুর্গা এবং কালির অনুসারীদের কেউ কেউ নরবলী প্রথার গোড়া সমর্থক।

www.nagorikpathagar.org

মহারাষ্ট্র প্রদেশে বিরাট দুর্গ বা প্রতিষ্ঠানের কাছে "মাহারীন" মন্দির স্থাপনের প্রথা আছে। মহারাষ্ট্র প্রদেশে মাহা হল একটি অতি নিম্ন বর্ণের দলিত জাত। সাধারণত একজন মাহা বর্ণের নারী ক্রয় করে তাকে বলী দেয়া হত এবং এ বলীর মাধ্যমে সে উন্নীত হত দেবত্বে। এ পবিত্র মন্দিরে পূজা অর্চনা হত। (Sandeela, p- 65-66).

বৃটিশদেরকে ভারতের নরবলী প্রথা নিষিদ্ধ করণে বহু কষ্টকর পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল। গভর্ণর জেনারেল বেন্টিংক এ বিষয়ে সাহায্য পেয়েছিলেন স্যার উইলিয়াম স্লীম্যান (Sir. William Sleeman) এর। ১৮৩১-৩৭ সনের মধ্যে নরবলী প্রথার হাজার হাজার সমর্থককে গ্রেফতার করা হয় এবং মৃত্যু দন্ড দেয়া হয়।

উড়িষ্যাতে খন্দ জাতীয় লোকদের মধ্যে মেরীয়া (Meriah) পূজা নামে নরবলী প্রথা ছিল। ভারতের গভর্ণর জেনারেল স্যার হেনরী হারডিঞ্জ এবং মেজর জেনারেল জন ক্যাম্বেল ১৮৪৭-৫৪ এর মধ্যে এ নরবলী প্রথা বিলোপে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। (S.R. Sharma, The Making of Modern India, p- 478-79, Bombay, 1951).

যদিও নরবলী প্রথা সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু ভারতের বহু স্থানে নরবলী প্রথা প্রচলিত ছিল। কোন একটি দুর্গ, সেতু অথবা বিরাট ভবন নির্মাণ কালে নরবলী দেয়া হলে তা দৈত্যদের প্রভাব মুক্ত থাকে বলে বিশ্বাস করা হত।

এখনো বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নরবলী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মধ্য প্রদেশের একটি গ্রামে দেওয়ালী পূজা উপলক্ষে নরবলীর খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। (Muslim India, p- 45, January, 1996).

৩৮

মৃতদেহ সৎকার

হিন্দু ধর্মে জন্ম মৃত্যুকে অপবিত্র মনে করা হয়। প্রসবের সময় এবং পর প্রসূতীকে বাসগৃহ থেকে পৃথক এবং দূরে একটি গৃহে বা কক্ষে রাখা হয়। যারা তার সেবা করেন অথবা কক্ষে গমন করেন, তারা পবিত্রতা সূচক স্নান না করে নিজ গৃহে প্রবেশ করেন না।

অনুরূপভাবে মৃত্যুকেও হিন্দু ধর্ম মতে অপবিত্র মনে করা হয়। মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে ঘর থেকে বের করে এনে তুলসী তলায় অথবা বৃক্ষতলায় রাখা হয়। কোন ব্যক্তির মৃত্যু প্রক্রিয়ায় শুধু যে মৃত ব্যক্তি অপবিত্র হয়ে যান– তা নয়, মৃত ব্যক্তির পুত্রগণও অপবিত্র বিবেচিত হন।

www.nagorikpathagar.org

তাদের এ অপবিত্রতা বিরাজ করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত। এ সময় চলাফেরাকালে তাদেরকে একটি ছোট মাদুর সাথে রাখতে হয়। কারণ, অপবিত্র দেহ নিয়ে কারো বিছানায় বা আসনে বা চেয়ারে বসা ধর্মসঙ্গত নয়। তাদেরকে নিজের সাথে বহন করা মাদুরে বসতে হয়।

মৃত্যুর পর ৪০ দিন পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির পুত্রগণ চুল দাড়ি কাটতে পারেন না। ৪০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর ধর্মীয় পদ্ধতিতে চুল দাড়ি কেটে পবিত্রতাসূচক স্নানের পরেই তারা স্বাভাবিকভাবে পোশাক পরিধান করতে পারেন এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেন।

নদী তীরে মৃত্যু

গঙ্গা তীরে মৃত্যু বরণ করা হিন্দুদের জন্য একটি মহা সৌভাগ্য। কিন্তু এ সৌভাগ্য বহু লোকের হয় না। যখনই কোন একটি রোগীর অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে ডাক্তারগণ মনে করেন– তার জন্য চিকিৎসা ফলপ্রসু হবে না, অথবা তার আত্মীয় স্বজনও তাই মনে করেন, তখন রোগীর সাথে কি ধরনের আচরণ করা হয় ?

তখন, চিকিৎসক বা পরামর্শ দাতারা তাদের ধর্মীয় কর্তব্য মনে করেন–সে রোগীর আত্মীয়দেরকে বলা যে, রোগীকে নদীর তীরে নিয়ে যাওয়ার সময় এসে গেছে।

হিন্দুগণ মনে করেন যে, এ অবস্থায় তার আরোগ্যের চেষ্টা না করে তাকে নদীর তীরে নিয়ে যাওয়াই তাদের কর্তব্য। তখন এ লক্ষ্যে প্রস্তুতি নেয়া হয়। দরিদ্র পরিবারে মৃত্যু পথযাত্রীর বিছানা বা খাটের উপরে অপ্রয়োজনীয় বস্ত্র, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নোংরা বস্ত্রটি বিছানো হয়। কারণ এটি জ্বালিয়ে ফেলা হবে, তারপর তাকে নদীর ঘাটে আনা হয়। মৃত্যু না আসা পর্যন্ত তাকে তার নিজের বাসগৃহ থেকে অনেক নিম্ন মানের ক্ষুদ্র নোংরা কুটিরে ঢুকানো হয়।

যদি কোন বড় নদীর তীরে বিখ্যাত দাহ ঘাটে ঘর বা বিল্ডিং পাওয়া যায়, তাতে দেখা যাবে মৃত্যু পথ যাত্রীদের আরও অনেককে ওখানে রাখা হয়েছে। তখন তাকে বহনকারী খাট থেকে তারই অনুরূপ হতভাগাদের মধ্যে অন্য একটি নোংরা খাটে অথবা মেঝেতে রাখা হয়। এখানে শোনা যায় রোগীদের আর্ত চীৎকার।

মৃত্যুর পূর্বে এরূপ পরিবেশ তাকে তার অন্তিম অবস্থার কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। তার অবস্থা যখনই একটু খারাপের দিকে যায়, তখনই তাকে বাসগৃহের নিকটস্থ তুলসী গাছ তলায় অথবা নদীর তীরে আনা হয় এবং তার শরীরের অর্ধেক পানিতে ডুবানো হয়।

www.nagorikpathagar.org

যারা হিন্দু নন এবং অন্তিম অবস্থা কালে মৃত্যু যাত্রীদের অবস্থা দেখেন– তাদের ধারণা হয় ঐ রোগীটিকে নদীর তীরে এ পরিবেশে না এনে তার নিজের বাড়িতে অথবা হাসপাতালে রাখা হলে সে হয়তো এ যাত্রা বেঁচেও যেত।

কারো কারো মতে এটা একটা অমানবিক আচরণ। অন্তিম মুহূর্তে মৃত্যু পথযাত্রী রোগীদের সাথে এ ধরনের আরচণ অকল্পনীয়। (Wilkins, p- 380, 1975).

দাহকরণ

মৃত্যুর পূর্বে এ নির্যাতন, অবহেলাসূচক অবস্থার পর মৃত দেহটি চিতা ঘাটে নেয়া হয় এবং দাহ করণের ব্যবস্থা দ্রুত সম্পন্ন করা হয়। মৃত দেহটি একটি নতুন কাপড় দিয়ে ঢাকা হয়। মৃত দেহের নিচে থাকে জ্বালানী কাঠ এবং কিছু চন্দন কাঠ রাখা হয়, যদি মৃত ব্যক্তি বিত্তশালী হয়। মৃত দেহে কিছুটা ঘি দেয়া হয় যাতে দাহ করা কালে গন্ধ কম হয়।

মৃতের পুত্র অথবা নিকটবর্তী আত্মীয় তার পুরানো জামাকাপড় পরিবর্তন করে নতুন শ্বেত বর্ণের বস্ত্র পরিধান করেন। এ বস্ত্রের এক কোণে বাঁধা হয় একটি লোহার চাবি। উদ্দেশ্য ভূত প্রেতকে দূরে রাখা। এরপর মৃতদেহের মুখে আগুন দেয়া হয়। কিন্তু নাভিটি পুড়তে সময় লাগে। কোন কোন ক্ষেত্রে নাভিটি তুলে পানিতে ফেলে দেয়া হয়।

মৃতদেহ দাহ করার সময় মৃত দেহটি বাঁকা হয়ে যায়। মনে হয় মৃত দেহ আগুনের কারণে উঠে বসতে চাচ্ছে। অগ্নি শয্যার সাথে পৃষ্ঠদেশ না লেগে থাকলে চাপিয়ে তার পিঠ আগুনের লেলিহান শিখার সঙ্গে লাগিয়ে রাখা হয়।

যদি কেউ নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, মৃত্যুর পর তাকে চিতায় আনা হয়। মৃত দেহ দাহ করার এই প্রথা আধুনিক নাগরিকদের মতে স্বাস্থ্য হানিকর এবং অবৈজ্ঞানিক। এতে পরিবেশ নষ্ট হয়।

চিতার নিকটে যারা বাস করেন তারা দুর্গন্ধ, ধোঁয়া এবং বায়ু দূষণের অভিযোগ করেন। তদুপরি একজন মৃত ব্যক্তিকে দাহ করতে যে পরিমাণ কাঠের প্রয়োজন হয়, তাও কম নয়।

বোম্বে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের চিফ ইঞ্জিনিয়ার টি ভি মালী এর মতে- প্রতিটি মৃত দেহ দাহ করতে ৪০০ কেজি কাঠ লাগে। মুম্বাই শহর এলাকায় প্রতি বছরে যে পরিমাণ কাঠ প্রয়োজন হয়, তাতে ১০ হেক্টর বন ভূমি বৃক্ষ শূন্য হয়।

মৃত দেহ দাহ করা হলে মাংস পুড়ে যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাড়গুলো পুড়ে। কিন্তু ভাঙ্গা দাঁতের স্থলে যে সোনার দাঁত লাগানো হয় ঐ সোনা পোড়ে না। বেনারসে সাধারণত দূরে রেখে বিত্তশালীদের মৃত দেহ দাহ করা হয়। পোড়া মৃত দেহের

www.nagorikpathagar.org

ছাই থেকে এ সোনা সংগ্রহ উদ্ধারের জন্য বিশেষ শ্রেণীর বালকদের চেষ্টার অন্ত নেই।

মৃতদেহ সমাধিস্ত করণ

হিন্দু নারী পুরুষের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা বা দাহকরণ ধর্মীয় বিধি বা প্রচলিত প্রথা। দরিদ্রদের জন্য মৃতদেহ দাহ করা তুলনামূলকভাবে ব্যয় বহুল। তবে হিন্দুদের মধ্যে মৃতদেহ দাহ করার পরিবর্তে কবরস্থ বা সমাধিত করার বিধানও হিন্দুধর্মে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নয়।

এই পদ্ধতিটি কবর দেয়ার মত নয়। মুসলিমদের কবর অপেক্ষা হিন্দুদের সমাধি গভীরতর করা হয়। মুসলিমদের কবরে যেভাবে মৃতদেহকে লম্বাভাবে শায়িত করা হয়, হিন্দু সমাধিতে তা করা হয় না।

হিন্দু সমাধিতে মৃতদেহের পা দুটি আসন পেতে বসার ভঙ্গীতে ক্রস করে মৃত দেহকে বসিয়ে রেখে মাটি চাপা দেয়া হয়। মৃত ব্যক্তি বিত্তশালী হলে তার সমাধির উপরে পাকা স্তুপ নির্মাণ করা হয়। এ স্তুপ দূর থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত– বেনারস হল ভারতের পবিত্রতম নগরী। এটা সর্বোৎকৃষ্ট স্থান মৃতদেহ দাহ করার জন্য। অথবা অন্য কোথাও দাহ করা মৃত দেহের ছাই গঙ্গা নদীতে নিক্ষেপের জন্য। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বেনারসে দাহের জন্য মৃত দেহ বহন করার যানবাহন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ করে বাস কোম্পানীর এটি একটি জমজমাট ব্যবসা।

মহাত্মা গান্ধী নিহত হয়েছেন ১৯৪৮ সালে নাথুরাম গর্ডস এর গুলিতে। তাকে দাহ করা হয় দিল্লীতে। তখন তার দাহকৃত দেহের কিছু ছাই গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হয়। ৫০ বছর পর ১৯৯৭ এর ৩০ শে জানুয়ারী এম কে গান্ধীর প্রপৌত্র অরুণ গান্ধী তার সংরক্ষিত ছাই এর কিছু অংশ গঙ্গা নদীতে নিক্ষেপ করেন।

মৃতদেহের ছাই গঙ্গা নদীতে নিক্ষেপ করা হলে আত্মার মুক্তি ঘটে। এ ধারণা সারা বিশ্ব ব্যাপী হিন্দু ধর্ম অনুসারীদের। বিদেশে বসবাসকারী হিন্দুগণ এমনকি অহিন্দুদের কেউ কেউ এরূপ ধারণা পোষণ করেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, বিশেষ করে জাপান এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থান থেকেও পোড়া মৃতদেহের ছাই বেনারসে আনা হয়– গঙ্গা নদীতে নিক্ষেপের জন্য।

ভারতের সকল স্থান থেকে ডাকযোগে মৃতদেহের ছাই এর এনভেলাপ বেনারসে পাঠানো হয় গঙ্গা নদীতে নিক্ষেপের জন্য। বিদেশীদের যারা বেনারসে ছাই নিয়ে আসেন, তারা ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সাহায্য গ্রহণ করেন– মৃতের আত্মা সৎকারের জন্য মন্ত্র পাঠ করতে। এ জন্যে পাঁচশত ডলার বা অন্য অঙ্কের সেলামি পুরোহিতদেরকে দিতে হয়।

www.nagorikpathagar.org

১২তম অধ্যায়

৩৯

হিন্দু ধর্ম

আর্যপূর্ব ভারত উপমহাদেশের আদিবাসীগণ ছিলেন মূলত দ্রাবিড় জাতীয়। তাদের গাত্রবর্ণ ছিল হালকা কাল বর্ণ থেকে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। দ্রাবিড় জাতীয় ভারতীয়গণ আর্যদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কেউ কেউ পূর্ব ভারতে, ইন্দোনেশিয়ার বালী দ্বীপে এবং শ্রীলংকায়ও বসতি স্থাপন করেন।

দ্রাবিড় সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয় সিন্ধু প্রদেশের মহেন-জোদারো এবং পাঞ্জাবের হরপ্পাতে। দ্রাবিড়দের সমকালীন সভ্যতা ছিল মিশরে। খৃষ্টের জন্মের চার হাজার বছর পূর্বে ভারতে নগরভিত্তিক সভ্যতা গড়ে উঠে।

দ্রাবিড়দের ধর্ম সম্বন্ধে তেমন কিছু সুস্পষ্ট পাওয়া যায় না। তবে, তাদের মধ্যে মূর্তি পূজার প্রচলন ছিল মনে করা হয়। লৌহ ও প্রস্তর নির্মিত কিছু কিছু মূর্তি থেকে মূর্তিপূজার বিষয়টি অনুমান করা যায়।

দ্রাবিড়দের মধ্যে প্রচলিত ভাষা সংক্রান্ত ধাতু নির্মিত যে অক্ষর পাওয়া গেছে, তা থেকে ভাষা আবিষ্কার করা এখনো সম্ভব হয়নি।

আর্যদের ভারতে প্রবেশ

খৃষ্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্বে ইন্দো-ইউরোপিয়ান আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করা শুরু করেন। যদিও আর্যগণ প্রাচীন ভারতবাসীদেরকে তাদের রচনায় বর্বর, অনার্য এবং দস্যু নামে অবিহিত করেন, তবুও তারা কৃষ্ণবর্ণীয় দ্রাবিড়দের দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হন।

পরাৎপর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আর্য-ধর্মীয় সম্রাট হলেও তার ইতিহাস দ্রাবিড় থেকেই শুরু হয়েছে বলা হয়। পরাৎপর শব্দের অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ। হিন্দু ধর্মে শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরম স্রষ্টা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব কৃষ্ণের সৃষ্ট দেবতা।

আর্যগণ ফর্সা, গৌর বর্ণীয়। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গৌর বর্ণীয় নন, বরং কৃষ্ণ বর্ণীয়। আর্যদের মধ্যে অন্যদেরকে উপেক্ষা ও ঘৃণা করার স্বভাব রয়েছে। স্রষ্টার ধারণা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে আছে। কিন্তু তাদের দেবতা বা ঈশ্বর শ্রী কৃষ্ণ বর্ণীয় নন।

আর্যগণ ইরান অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেন। ইরানীয়ানগণও নিজেদেরকে আর্য বা এরিয়ান বলে দাবী করেন। ইরানী আর্যদের গাত্রবর্ণ

www.nagorikpathagar.org

ইউরোপীয়ানদের মত। তারা নিজেদেরকে ভারতীয় থেকে জন্মগত বা বংশগতভাবে উন্নততর মনে করেন।

যেমন উত্তর ভারতীয় আর্য হিন্দুগণ দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়, তামিল বা অন্য বর্ণের হিন্দুদের থেকে নিজেদেরকে উন্নততর হিন্দু মনে করেন। পরবর্তীকালে ইরানী আর্যগণ, ভারত উপমহাদেশকে বলতেন হিন্দ এবং এ হিন্দের অধিবাসীদেরকে বলতেন হিন্দু।

আর্যধর্ম

হিন্দুধর্ম ভারতে আসে আর্যদের সাথে। হিন্দুধর্ম আর্য ধর্ম নামেও খ্যাত। অঞ্চল ভেদে আর্যধর্ম স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। অগ্নি দেবতা হলেন প্রাচীন ইরানী আর্যধর্মের ঈশ্বর। পার্শি ধর্মাবলম্বীগণ এখনো দেবতা জ্ঞানে অগ্নি পূজা করে। বৃষ্টি বা জল অগ্নি নির্বাপন করতে পারে। তাই হয়ত হিন্দুগণ বরুণ বা জল দেবতার পূজা করে।

সূর্যের সাথে অগ্নির সম্পর্ক রয়েছে। উত্তাপে জল শুকিয়ে যায়। প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তা নির্ণয় করা কষ্টকর। তাই একাধিক প্রাকৃতিক শক্তির পূজা প্রবর্তিত হয়েছে। আর্যদের পূর্বে ভারতের অধিবাসী ছিলেন দাবিড়গণ এবং আদিবাসীগণ।

দেশ থেকে বিতাড়িত আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায়–ইতিহাস এ ব্যাপারে নীরব না হলেও অনিশ্চিত। কারো কারো মতে ২০,০০০ বছর পূর্বে আর্যগণ ভারতে আসে। কারো মতে খৃষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর পূর্বে।

অনেকের ধারণা, আর্যদের প্রাচীন বাসস্থান ছিল ইউরোপের হাঙ্গেরীয় পার্বত্য অঞ্চলে। কেউ কেউ মনে করেন, মধ্য এশিয়ার বিরাট মালভূমিতে অথবা ভূমধ্য সাগরের তীরে ছিল প্রাচীন আর্যদের বাসভূমি।

কারো কারো মতে, মেরু অঞ্চলে প্রাচীন আর্য বাসস্থান ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, আর্যগণ ভারতেরই আদিবাসী। ("স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা; প্রথম সংস্করণ, ৫ম খন্ড, পৃঃ ১৯০: ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ২০৯-২১০)।

সাধারণভাবে গৃহীত সত্য এটাই–আর্যগণ ভারতের বাহির থেকে এসে প্রথমে সপ্ত সিন্দু অথবা পঞ্চ নদীর তীর পাঞ্জাবে বসবাস শুরু করেন এবং ক্রমশঃ ভারতের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়েন।

অঞ্চল হিসাবে ভারত থেকে মানব বসতির অনুকূল উন্নততর ভূমি বিশ্বে কোথাও নেই। আর্যগণের ভারত দখলের পর এ অঞ্চলের নাম হয় আর্যাবর্ত। তবে বিন্ধ পর্বতের দক্ষিণাংশ দাক্ষিণাত্য নামেই অভিহিত হতে থাকে। আর্যাবর্ত এবং

www.nagorikpathagar.org

দাক্ষিণাত্যের হিন্দু দেবদেবী, বিশ্বাস, আচার, আচরণ, পূজা, উপাসনা ইত্যাদির মধ্যে কিছুটা মত পার্থক্য দেখা যায়।

হিন্দু শব্দের অর্থ

হিন্দু শব্দটি সংস্কৃত অথবা ভারতীয় আর্য ভাষার শব্দ নয়। এটা ফার্সী ভাষার শব্দ। ফার্সী ভাষায় এ শব্দের অর্থ বিবর্ণ বা কাল। গৌর বর্ণ আর্যগণ কৃষ্ণ বর্ণীয় ভারতীয় দ্রাবিড়দেরকে হিন্দু বা কৃষ্ণ বর্ণীয় নামে আখ্যায়িত করত।

আর্যদের সাথে পর্যাপ্ত সংখ্যক নারী ছিল না। তাই তাদেরকে দ্রাবিড় নারীদেরকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে হয়। তাদের বংশধরগণ শুধু গৌরবর্ণীয় হয়নি, কেউ হয়েছে মাতৃবর্ণীয়, কেউ কেউ পিতৃ-মাতৃবর্ণীয়। শঙ্কর জাতীয় ভারতীয়রা প্রথম হিন্দু নামে পরিচিত হতে থাকেন।

ইরানিয়ান এবং আরবদের দৃষ্টিতে ভারতের সিন্ধু নদীর নাম হিন্দ। সিন্ধু অববাহিকার অধিবাসীদের নাম হিন্দু এবং হিন্দুগণ যে দেশে বাস করে সে দেশের নাম হিন্দুস্থান।

হিন্দু শব্দটির ব্যাপক এবং বহুল ব্যবহার বর্তমান হিন্দুদের পূর্বে মুসলিমগণই শুরু করে। তাঁরা সিন্ধু নদীর পূর্ব তীরকে বলত হিন্দ এবং অমুসলিম অধিবাসীদেরকে বলত হিন্দু। হিন্দু শব্দটি সংস্কৃত ভাষার শব্দ নয়।

হিন্দুস্তান, হিন্দুস্তানী শব্দমালা আর্যদের মধ্যে নয়, বরং মুসলিমদের মধ্যেই বহুল ব্যবহার হত। প্রাচীন হিন্দু ব্রাহ্মণগণ নিজেদেরকে হিন্দু অপেক্ষা আর্য সন্তান বলে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ এবং গৌরব বোধ করতেন। এরও সঙ্গত কারণ রয়েছে।

জাতিভেদ প্রথা

হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন মত, পথ এবং জাতি গোষ্ঠি আছে। সকলের মধ্যে প্রযোজ্য একটি স্বাধীন প্রথা হল জাতিভেদ প্রথা। সকল হিন্দু চারটি প্রধান জাতিতে বিভক্ত। এগুলো হল– ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈষ্ণব এবং শুদ্র।

হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণগণ হলেন সর্বোচ্চ স্তরের জাতি। একমাত্র তারাই পূজা, অর্চনা, আরাধনায় পৌরহিত্য করতে পারেন। অপর সকল হিন্দু জাতের আনুগত্য এবং শ্রদ্ধা তাঁদের প্রাপ্য। পূজার সময় একমাত্র পুরোহিত দেবতা সন্নিধ্যানে থাকতে পারেন। তাই মন্দিরের আকার মসজিদের মত প্রশস্ত বা বৃহৎ নয়।

তবে মন্দির অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার হলেও মসজিদ অপেক্ষা উচ্চ হতে পারে। মসজিদের ইমাম যে কোন ব্যক্তি হতে পারেন, যদি তিনি শুদ্ধ ভাবে কুরআনের সূরা, কিরাত বা অংশ শুদ্ধভাবে পড়তে পারেন। যে কোন নও-মুসলিম বা আর্থিক

www.nagorikpathagar.org

এবং সামাজিকভাবে সর্বনিম্ন স্তরের ব্যক্তি ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করে মসজিদে ইমামতি করতে পারেন। এ জন্য তাকে বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হতে হবে না।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র

ক্ষত্রিয়গণ যোদ্ধা জাতি। তারা সেনাবাহিনীর অন্তর্ভূক্ত হবেন এবং রাজ্যের শাসন দায়িত্বে থাকবেন। রাজা হলে বংশানুক্রমে অথবা সামরিক শক্তি বলে রাজ্য শাসনের ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারেন।

বৈশ্যগণ ব্যবসায়ী শ্রেণী। তাদের কাজ হল দেশের ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প কল কারখানা, ইত্যাদির মালিক হওয়া এবং পরিচালনা করা। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ স্বীয় কর্মফলের পরিণতিতে পুনর্জন্মে বৈশ্য এমন কি শুদ্র হিসাবে জন্মগ্রহণ করতে পারেন।

অন্য দিকে শুদ্র তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে পুরস্কার হিসাবে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হিসাবে পুর্নজন্ম গ্রহণ করতে পারেন। প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক জন্ম তার পূর্ব জীবনে কৃতকর্মের পরীক্ষার ফল বা কর্মফল। এ জন্য জন্মগত কারণে অসহিষ্ণু হওয়ার সুযোগ হিন্দুধর্ম মতে নেই।

জাতিভেদ প্রথা বা জন্মভেদ প্রথা শুধু মানুষ প্রজাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যদি কোন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় এর আচরণ অমানবিক হয় বা পশুসুলভ হয়, তবে তিনি পরবর্তী জীবনে পশু-পাখি এবং পোকা-মাকড় হিসাবে জন্ম গ্রহণ করতে পারেন। এমন বিধান হিন্দু ধর্মে উল্লেখ রয়েছে।

ধর্মীয় বৈচিত্র

হিন্দু ধর্ম কোন বিশেষ ব্যক্তি কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম নয়। যেমন– বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক ছিলেন গৌতম বুদ্ধ। খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্মের প্রচারক ছিলেন যিশু খৃষ্ট বা ঈসা (আঃ) এবং মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)।

হিন্দু ধর্মের কোন নির্দিষ্ট প্রচারক বা উদ্ভাবক না থাকার ফলে হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস ও দর্শনে– পূজা, আচার, ইত্যাদিতে বৈচিত্র অতি প্রচন্ড। অনেক ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী এবং স্ববিরোধিতা পূর্ণ। সাধারণ মানুষের হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস ও ঋষিদের বিশ্বাস এবং আচরণের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত ব্যাপক।

ধর্মীয় কল্পনা, ভাবনা পরবর্তী স্তরে যুক্তি তর্কের পোশাকে সৌন্দর্যকৃত হয় দর্শন চিন্তার মাধ্যমে। ধর্মীয় ঋষি এবং ধর্মীয় দার্শনিকগণ সমচিন্তার অনুসারী। হিন্দু দার্শনিকগণ আর্য ধর্মকে হিন্দু ধর্মীয় পোশাক ও কল্পনায় বিকশিত করেন।

সর্বগ্রাসীতা

হিন্দুধর্মের মধ্যে বিশ্বাস ও আচরণে পার্থক্য ও স্ববিরোধিতা থাকলেও– এটা একটি আগ্রাসী ধর্ম এবং দর্শন। ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণের মধ্যে সমতা এবং

www.nagorikpathagar.org

ঐক্য না থাকলেও যারা মুসলিম, খৃষ্টান বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নয়– তাদের সকলকেই হিন্দু ধর্ম শুদ্র হিসেবে আত্মীয়করণ করে নেয়।

হিন্দুধর্মের অঞ্চল ভিত্তিক পার্থক্য অত্যধিক। সমগ্র ভারতে এক ঈশ্বর বা এক দেবতার পূজারী তারা নয়। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মধ্যে যে কোন এক বা একাধিক দেবতাদেরকেও অনুসরন করে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভূক্ত হওয়া সহজসাধ্য।

বৈদিক ধর্ম

হিন্দু শব্দটি শুরুতে মুসলিমদের দেয়া বলা যেতে পারে। হিন্দু শব্দ দ্বারা বুঝাত হিন্দ মুলুক বা হিন্দুস্থানের অধিবাসী। পরিবর্তীকালে এ শব্দটি খৃষ্টান, ইংরেজ ও ইউরোপীয়ানদের দ্বারা ব্যবহৃত এবং ইংরেজ রাজত্বকালে বহুল প্রচলিত। তাই, হিন্দুদের নিজস্ব ধর্মেও নিজস্ব লক্ষ্য আবিষ্কার ও প্রবর্তনের চেষ্টা করা হয়েছে। সাফল্যও অর্জিত হয়েছে এবং এ চেষ্টার দু'টি সাফল্য হলো– দুটি শব্দ আবিষ্কার। এ শব্দ দু'টি হচ্ছে বৈদিক ধর্ম এবং সনাতন ধর্ম। হিন্দুদের প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থের নাম হল বেদ। বেদ ভিত্তিক যে ধর্ম তাই হল বৈদিক ধর্ম।

৪০
হিন্দু শব্দের উৎস

হিন্দু শব্দটি ভারতীয় আর্য ভাষার বা সংস্কৃত ভাষার শব্দ নয়। ফার্সী ভাষায় এ শব্দের অর্থ বিবর্ণ বা কাল। গৌরবর্ণীয় আর্য্যগণ কৃষ্ণবর্ণীয় ভারতীয় দ্রাবিড়দেরকে তুচ্ছার্থক অর্থে হিন্দু বা কৃষ্ণবর্ণীয় নামে আখ্যায়িত করতেন।

আর্যদের সাথে পর্যাপ্ত সংখ্যক নারী ছিল না। তাই তাদেরকে দ্রাবিড় নারীদের স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে হয়। তাদের বংশধরগণ শুধু গৌরবর্ণীয় হয়নি, কেউ হয়েছে মাতৃবর্ণীয়, কেউ কেউ পিতৃ-মাতৃবর্ণীয়। শঙ্কর জাতীয় ভারতীয়গণ হিন্দু নামে পরিচিত হতে থাকেন।

মুসলিমদের ভারত উপমহাদেশের আগমনের পূর্বে কোন হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থে হিন্দু শব্দটি দেখা যায় না বা এ শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। (Encyclopaidia of Religions and Ethics Vo. 6, p. 690).

হিন্দু শব্দটির ব্যাপক এবং বহুল ব্যবহার আর্য ও ইরানীয়ান হিন্দুদের পূর্বে মুসলিমগণই শুরু করেন। তাঁরা সিন্ধু নদীর পূর্ব তীরকে তথা ভারতকে বলত হিন্দ এবং সিন্ধু নদীর অববাহিকার অধিবাসীদের বলত হিন্দু।

হিন্দুগণ যে দেশে বাস করে সে দেশকে ইরানীয়ানগণ বলত হিন্দুস্থান। হিন্দুস্তান, হিন্দুস্থান, হিন্দুস্তানী শব্দমালা হিন্দু আর্যদের মধ্যে নয়, বরং মুসলিম আর্যদের মধ্যেই বহুল ব্যবহার হত।

www.nagorikpathagar.org

প্রাচীন হিন্দু ব্রাহ্মণগণ নিজেদেরকে হিন্দু অপেক্ষা আর্য সন্তান বলে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ এবং গৌরব বোধ করতেন। এর সঙ্গত কারণও আছে।

ইরানী ও আরবগণের কাছে হিন্দু শব্দটির উৎস হল–সিন্ধু নদী। সিন্ধু নদীকে ইউরোপীয়ানগণ বলত ইন্দাজ। ইন্দাজ তীরবর্তী এলাকাকে ইউরোপীয়ান বলত ইন্ডিয়া এবং ইনন্ডিয়ার অধিবাসীগণ ইউরোপের দৃষ্টিতে ছিল ইন্ডিয়ান।

ভারতীয় আর্যভূমির পশ্চিম সীমান্তে ছিল সিন্ধু নদ। সিন্ধু নদের অপর দিক ছিল ইরানীদের দখলে। আর্যগণ 'স' স্বরটি উচ্চারণ করতেন 'হ' স্বর এর মত করে। সিন্ধু শব্দটি ইরানীগণ উচ্চারণ করতেন হিন্দু।

সিন্ধু নদীটির নাম সুস্পষ্টভাবে সিন্ধু ছিল না। এ নদী ইন্দু, হিন্দু ইত্যাদি নামেও অবিহিত হত। হিন্দুইজম বা হিন্দু ধর্ম শব্দটি ভারতীয়দের ধর্ম হিসাবে পরিচিত ছিল না।

হিন্দু শব্দটি ফার্সি ভাষায় ব্যবহৃত একটি শব্দ। এর অর্থ কৃষ্ণ, অন্ধকার, অস্পষ্ট (লুগাতে সাঈদি, সাঈদী রচিত অভিধান), পৃ. ৬৩৩, কানপুর, ১৯৩৬; ফিরোজ আল লুগাত, পৃ. ৬১৫)। বাধ্য না হলে কি কেউ নিজেকে কাল, কৃষ্ণকার, অন্ধকার, এ জাতীয় বিশেষণে বিশেষিত হতে চাইবে ?

মুসলিমদের আগমনের পূর্বে হিন্দু শব্দটি ভারতে কোন সাধারণ সর্বজন অনূসৃত ধর্মের নাম বা ধর্মানুসারীদের নাম ছিল না।

সপ্তম শতাব্দী থেকে আরব এবং ইরানী মুসলিমগণ ভারতে প্রবেশ করতে থাকেন। মুসলিমদের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণীয়দের প্রতি ঘৃণা বা উপেক্ষা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত না থাকলেও প্রয়োজনে দ্রাবিড়দের মধ্য থেকে স্ত্রী গ্রহণে তারা ছিলেন অপেক্ষাকৃত উদার প্রকৃতির।

আর্যদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ সমূহে হিন্দু শব্দটি লক্ষণীয় নয়। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, ইত্যাদি হিন্দুদের প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থ। হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থ বা উপাখ্যান হল রামায়ণ এবং মহাভারত। রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ, পুরাণ এবং বেদ গ্রন্থ সমূহে হিন্দু শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। Encyclopaedia of Religions and Ethics, New York, 1967, p-699)

মুসলিমদের ভারতে আগমনের পূর্বে হিন্দু শব্দটি ভারতীয় সাহিত্যে বা জনকণ্ঠে ব্যবহৃত হওয়ার নযির নেই। (H.G. Rawlinson, Intercourse Between India and the Western World, p-20, Cambridge, 1926)।

উচ্চ-নাসা ইরানী আর্যদের কাছে ভারতীয় আর্যগণ পরিচিত হন হিন্দু নামে। পরবর্তীতে ভারতীয় আর্যগণ ইরানীদের দেয়া হিন্দু শব্দটি নিজেদের পরিচিতি হিসেবে গ্রহণ করেন। (স্বামী নির্বেদানন্দ, হিন্দু ধর্ম, রামকৃষ্ণ মিশন, Students Home, কলিকাতা, ২০০৫)।

www.nagorikpathagar.org

বর্তমানে ইরানে নুন্যতম সংখ্যক হিন্দুধর্মাবলম্বী আছে। তারা নিজেদেরকে হিন্দু অপেক্ষা এরিয়ান বা আর্য এবং তাদের ধর্মকে আর্য ধর্ম নামে পরিচয় দিতে পুলক অনুভব করেন। তাদের কাছে আর্য শব্দটি প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং গৌরবের প্রতীক।

মুসলিম বিজয়ের ফলে ভারতের অমুসলিমদের সকলের জন্য "হিন্দু" নামের একটি সার্বিক সাধারণ শব্দ পাওয়া গেল। সকল ভারতবাসীকে বুঝাবার জন্য সর্বজন গৃহিত একটি শব্দ আবিষ্কার হল। (Swami Dharma Theertha, History of Hindu Imperialism, p-111, Madras, 1992)।

আরবে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব হয় সপ্তম শতাব্দীতে। পন্ডিত জওহর লাল নেহেরুর মতে– "হিন্দু শব্দটির উৎস খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর তান্ত্রিক পুস্তক পর্যন্ত টেনে নেয়া যায়। তখন এ শব্দটি কোন ধর্ম সম্পর্কে ব্যবহার হত না। বরং হিন্দু শব্দটি দ্বারা বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীকেই বোঝানো হত। ধর্মের অর্থে হিন্দু শব্দটির ব্যবহার আরো অনেক পরের ঘটনা (Jawaharlal Nehru, The Discovery of India, p-74, New Delhi, 1983)।

পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মতে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে হিন্দু শব্দটি দ্বারা অতীতে কোন ধর্ম বুঝানো হত না। তবে হিন্দু শব্দটি ভারতীয়দের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সিন্দু নদের অববাহিকার অধিবাসীদেরকে পরবর্তীতে হিন্দু বলা শুরু হয়। (J.L. Nehru : The Discovery of India, p. 74-75)।

বৃটিশগণও হিন্দু শব্দটি দ্বারা ভারতের মুসলিম এবং খৃষ্টান ব্যতীত অন্যদেরকে বুঝাতেন এবং সেভাবেই তাদের সরকারী নির্দেশনামা জারী হত। এ প্রক্রিয়ায় মুসলিম ও খৃষ্টান ব্যতীত ভারতবাসীর জন্য একটি কমন ধর্মীয় নাম "হিন্দু" পাওয়া গেল এবং সকল ভারতবাসীর ঐক্য ও সংহতির একটি ভিত রচিত হল।

শুধু প্রাচীনকালে নয়, বৃটিশদের ভারত দখলের পরও ভারতীয় স্থান, অঞ্চল, নগরী, ব্যক্তি, ইত্যাদিকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসককুল যে ভাবে উচ্চারণ করতেন, স্থানীয় অধিবাসীগণও নিজেদের পরিচয় সেভাবে দিতেন। যেমন– ঠাকুর হয়ে যায় ট্যাগোর, চট্টপাধ্যায় হয়ে যায় চ্যাটারজী, নওয়াব হয়ে যায় নবাব, মজুমদার হয়ে যায় মজমাদার। কলিকাতা হয় ক্যালকাটা, দিল্লী হয়ে যায় ডেল্‌হি, ভারত হয় ইন্ডিয়া, চেন্নাই হয়ে যায় মেডরাজ, আযোধ্যা হয়ে যায় আউদ, ঢাকা হয়ে যায় ঢ্যাক্কা (Dacca) ইত্যাদি।

ভারতবাসীর ধর্মকে খ্রষ্টানগণ ভারতের হিন্দু অধিবাসীদের ধর্ম বা হিন্দুইজম নামে আখ্যা দিত। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ভারতে ইংরেজদের আগমন শুরু হয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কোন ইংরেজ লেখকের মতে ইংরেজ শাসকগণ কর্তৃক

www.nagorikpathagar.org

স্বীকৃত হিন্দু ধর্ম বা হিন্দুইজম নামে কোন ধর্মের অস্তিত্ব ছিল না। (Benson Landis, World Religions, p-49, New York)।

বৃটিশ লেখকগণ কর্তৃক হিন্দুইজম শব্দটি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ব্যবহার হয়েছে– এমন তথ্য পাওয়া যায় না। হিন্দু ধর্মীয় দার্শনিক স্বামী বিবেক আনন্দ হিন্দুদেরকে "বেদ-তত্ত্ববাদী" হিসাবে উল্লেখ করতেন এবং তার অনুসারীগণও তাদের পরিচয় সেভাবে দিতেন।

ভারতবাসীদের প্রতি বৃটিশদের বহু অবদান ছিল। এ অবদানগুলোর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে– শত শত, এমন কি হাজার হাজার বিভিন্ন সংস্কৃতি, জীবনধারা, বিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুভূতি সম্পন্ন ভারতবাসীদেরকে এক নামে পরিচিত করা।

হিন্দুদের ধর্মকে ইংরেজিতে বলা হয় হিন্দুইজম। এর সংস্কৃত করা হয়েছে হিন্দুত্ব। অর্থাৎ হিন্দুদের ধর্ম বা হিন্দু মতবাদ। ভারতীয় সনাতন ধর্ম বা বৈদিক ধর্মের অনুসারীগণ যখন হিন্দু নামে অবিহিত হতে শুরু করলেন– তখনি ইংরেজী ভাষায় হিন্দুদের ধর্মকে হিন্দুইজম নামে পাশ্চাত্যের লেখকগণ লেখা শুরু করেন এবং তা ইংরেজীতে হিন্দুইজম নাম পরিচিত হওয়া শুরু হয় (New Encyclopaidia of Britanica, p. 581)

মুনি-ঋষি

যে কোন হিন্দুর পক্ষে সুদীর্ঘকাল তপস্যা করে বিভিন্ন স্তরের মুনি ঋষি হওয়া সম্ভব। তার পক্ষে ধর্মীয় চিন্তার স্বাধীনতার আলোকে একটি বিশেষ হিন্দু ধর্মীয় গোষ্ঠী গঠন করা সহজতর। এ বিশ্বাসগুলো হতে পারে অতি প্রাচীন, সেকেলে, অন্য দিকে সর্বাধুনিক।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রবর্তক গদাবর চীটার্জী, দয়ানন্দ সরস্বত, শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, কেশবচন্দ্র সেন, প্রমুখ হিন্দু ধর্মের সমালোচক ও সংস্কারক হয়ে তারা প্রথমত জাত হারিয়েছেন। কিন্তু সংস্কারক হিসাবে জাতে উঠেছেন।

জন্মগত হিন্দু

হিন্দুগণ হিন্দু হতে পারেন জন্মগত ভাবে। ইসলাম বা খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করেও কোন খৃষ্টান বা মুসলিম ঘোষণা দিয়ে শুদ্র হিসেবে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে পারেন। হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ, ধর্ম পরিত্যাগ বা ধর্ম পরিগ্রহণ নেই, তবে শুদ্ধিকরণ আছে।

কোন কোন উদার শাস্ত্রবিদদের মতে সকল মানুষই জন্মগতভাবে হিন্দু। স্বীয় উদ্যোগে অথবা পূর্ব পুরুষদের কারণে কেউ খৃষ্টান বা মুসলিম হয়ে থাকলে নির্ধারিত আচার অনুষ্ঠান পালন করে শুদ্ধ হয়ে সর্বনিম্ন স্তরের হিন্দু হয়ে সনাতন ধর্মে প্রবেশ

www.nagorikpathagar.org

করতে পারেন। এ আচরণের মধ্যে একটি হচ্ছে গোবর ভক্ষণ। গরু হিন্দু ধর্মে দেবতা হিসাবে গণ্য। হিন্দু ধর্মে গোবর এবং গোমূত্র পবিত্রতার প্রতীক।

শুদ্ধিকরণের সময় প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে গোবর এবং গোমূত্র পান করতে হয়। কোন ব্যক্তি জন্মগতভাবে হিন্দু অথবা হিন্দু নয়। শুদ্ধ আচার অবলম্বন করে শুদ্ধ স্তরের হিন্দু হওয়া যায়। নীতিগতভাবে ধর্মান্তরিত হয়ে হিন্দু হওয়া যায় না।

ভারতের বাইরে হিন্দু রাষ্ট্র নেই বললেই চলে। ইন্দোনেশিয়ার বালি রাজ্যের অধিবাসীগণ হিন্দু। দেশ হিসাবে ভারত ছাড়া একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র হচ্ছে নেপাল। বর্তমানে হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রে ছড়িয়ে আছেন। যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ইত্যাদি রাজ্যে বিপুল সংখ্যক হিন্দু বসবাস করেন।

৪১
সনাতন ধর্ম ও একেশ্বরবাদ

হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন যে, তারা একটি প্রাচীন সভ্য জাতি এবং তাদের ধর্ম অতি প্রাচীন ধর্ম। এতে কোন সন্দেহ নেই। অতি প্রাচীন অর্থ বুঝাতে বিকল্প শব্দ ব্যবহার হয় "চিরন্তন"। "শাশ্বত" এবং "সনাতন"। এ শব্দগুলোর অর্থ চিরকালব্যাপী অবিনশ্বর, যার শুরু নেহ শেষ নেই।

এ সনাতন শব্দটির অন্য অর্থ হচ্ছে– যা স্বাভাবিক এবং মানব জীবনে শুরু থেকে চলে আসছে। বহু আধুনিক হিন্দু ধর্ম-তাত্ত্বিক এবং চিন্তাবিদ হিন্দুধর্মকে "সনাতন ধর্ম" বলেই উল্লেখ করে থাকেন। এ ধর্মের মূল অর্থে এবং বিশ্বাসে বিবর্তন রয়েছে।

বৈদিক ও সনাতন ধর্ম

হিন্দু ধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলা হয়। ধর্ম হিসাবে হিন্দু নামটি পরবর্তীকালের। এ হিন্দু নামটি হিন্দুগণ গ্রহণ করেননি। এ নাম তাদেরকে দিয়েছে মূলত মুসলিমগণ।

ভারতের প্রাচীন নাম ছিল বিবিধ। ইউরোপীয়গণ সিন্ধু নদীকে বলত ইন্ডাজ এবং সিন্ধু নদীর তীরবর্তী এবং পরবর্তী এলাকাকে বলত ইন্ডিয়া। এখনও ভারতের বিশ্ব স্বীকৃত নাম ইন্ডিয়া। হিন্দু শব্দটিও এসেছে সিন্ধু নদী থেকে।

একেশ্বরবাদ

হিন্দুদের আদি, সনাতন এবং প্রাচীন ধর্মে একেশ্বরবাদের ধারণা রয়েছে। "ঈশ্বর একম ইভা দ্বিতীয়ম।" "ঈশ্বর এক। তাঁর দ্বিতীয় নেই।" এরূপ তত্ব হিন্দু ধর্মে বিদ্যমান। অথচ, তারা সাড়ে ৩৩ কোটি দেবতারও পূজা করে থাকেন। ঋগবেদ এর শ্লোকে বলা হয়, ঈশ্বর এক। তাঁর নাম মিত্র, বরুন। তিনি মহাস্বর্গীয় পক্ষ বিশিষ্ট ও গতিশীল। তিনি এক, তিনি অগ্নী, তিনি যম, তিনি মস্তক-স্বরূপ (ঋগবেদ ১, সুক্ত ১৬৪, শ্লোক ১০-১১)।

www.nagorikpathagar.org

হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয় এবং চিরন্তন। তিনি পবিত্র। এ পর্যন্ত ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু হিন্দুগণ ঈশ্বরের একত্ববাদ অতিক্রম করে বহুত্ববাদে পৌঁছে যান। এখানেই শুরু হয় হিন্দু ধর্মের সাথে ইসলামের মত পার্থক্য।

ঈশ্বর সম্পর্কে হিন্দুদের বক্তব্য হলো, ঈশ্বর অতি বড় এবং মহান। তাঁর গুণ বা সিফাত বর্ণনা (যিক্‌র্) কীর্তন করে শেষ করা যায় না। এক এক দেবতা ঈশ্বরের এক এক রূপে আংশিক প্রকাশ। যদি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কল্পনা করে গুণাবলী (সিফাত) সম্পন্ন জীব বা বস্তুর মত বলে ঈশ্বরের গুণ পৃথক পৃথকভাবে প্রকাশ না করা হয়, তা হলে তাঁর সিফাত অর্থাৎ গুণাবলী প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার রূপ, গুণাবলী, চরিত্র ভিন্নতর।

ঈশ্বর সম্বন্ধে ভারতের হিন্দুদের যে ধারণা, মক্কার কাফির মুশরিকের ধারণাও সেরূপই ছিল। আল্লাহু শব্দটি কুরআনেই প্রথম ব্যবহার করা হয়নি। মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এর পিতার নাম ছিল আবদ-আল্লাহু। অর্থাৎ আল্লাহু এর দাস। এ নাম আদুল্লাহ্ স্বরে উচ্চারিত এবং লিখিত হয়।

আল্লাহু শব্দটি মক্কার কাফির মুশরিকদের জানা ছিল। তারা মূর্তি পূজা করত। কিন্তু তাদেরকে যদি এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হত– তারা অবশ্যই বলত– কেন? আল্লাহুই তো সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তা সত্ত্বেও তারা মূর্তি পূজা করত (মুরতাহিম বিল্লাহ ফজলী, Islam & Hinduism A Comparative Sudy, পৃঃ ৯২; আল-কুরআন, ৩৯ ঃ ৩)।

বৈদিক যুগের দেবতা ঈশ্বর

সময় ও কালের বিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ ও পরিবেশও বদলায়। বৈদিক যুগে যে দেবদেবীর পূজা হত, পরবর্তীতে তা পরিবর্তিত হয়। বৈদিক যুগে ক্ষমতাধর এবং পূজনীয় দেবদেবীদের মধ্যে ছিলেন ইন্দ্র, রুদ্র, অগ্নি, প্রজাপতি, মিত্র, বরুণ, সবিতা-সূর্য প্রমুখ। তাঁরা এখন রয়েছেন বর্তমানে পূজিত দেবমন্ডলের অন্তরালে।

৩৩ কোটি দেব-দেবী ও ঈষ্ট দেবতা

হিন্দু ধর্মে দেব-দেবীর সংখ্যা তেত্রিশ কোটি অর্থাৎ তিনশত ত্রিশ মিলিয়ন (John Hardon, Religions of the World, Vol V-p-62)। তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর সকলকে পূজা করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই একজন দেবতাকে ঈষ্ট দেবতা বা নিজস্ব পৃষ্ঠপোষক দেবতা হিসাবে মেনে নিয়ে নিয়মিত পূজা করতে হয়।

পূজারীগণকে তাদের পছন্দমত পূজনীয় দেবতা নির্ধারণ করতে হয়। পূজনীয় দেবতা নির্ধারিত হলেও অন্য দেবতাকে প্রত্যাখ্যান করা হয় না। প্রধান দেবতা

www.nagorikpathagar.org

হলেন স্রষ্টা হিসাবে ব্রহ্মা। পালনকর্তা হিসেবে বিষ্ণু এবং ধ্বংসের দেবতারূপে শিব।

সনাতন হিন্দু ধর্মে একটি আগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গি আছে। তারা তাদের ধর্মের মধ্যে ভারতের সকল ধর্মকে আত্মস্থ করার চেষ্টা করেন এবং অনেকটুকু সফলও হয়েছেন। সনাতন হিন্দু ধর্মে তারা অন্যান্য ধর্মকেও অন্তর্ভূক্ত এবং নিজেদের সঙ্গে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন।

পৌত্তলিক ধর্ম

হিন্দু ধর্মকে একটি পৌত্তলিক প্রতিমা পূজক ধর্ম বলা হয়। এ ধর্মে দেব-দেবীর স্বীকৃতি আছে। আছে ঈশ্বরেরও স্বীকৃতি। তবে প্রত্যক্ষ প্রার্থনা করা হয় দেব-দেবীর নিকট। সরাসরি ঈশ্বরের নিকট নয়। দেব-দেবী হলো ঈশ্বর ও পূজারীর মধ্য স্বত্ত্বা। তাই পূজারীর পূজা সবটুকু ঈশ্বর পর্যন্ত পৌঁছে না। দেবতাদের বেড়াজালে আটকে পড়ে থাকে।

খৃষ্টান ধর্মেও একজন মধ্য স্বত্ত্বা আছেন। তিনি হলেন জিসাস খ্রাইষ্ট। খৃষ্টানগণ মনে করেন যীশু খৃষ্ট হল ঈশ্বরের একমাত্র ঔরসজাত পুত্র। পুত্রকে খুশি করলে বা মোক্তার ধরলে পিতা সন্তুষ্ট হতে পারেন।

সমস্যা হল–যদিও যীশু খৃষ্ট ঈশ্বরের পুত্র, যীশু খৃষ্টকে ক্রুসে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়। ক্রুসে বিদ্ধ হওয়ার মধ্যে ছিল চরম ব্যথা। তিনি যদি ঈশ্বরের পুত্রই হন, ঈশ্বর কেন তাকে রক্ষা করলেন না? পুত্রের ব্যথায় যে পিতা ব্যথিত হন না তিনি কেমন পিতা? যা হোক এটা একটা বিশ্বাসের বিষয়।

ইসলাম ধর্মে যে কোন মানুষের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক সরাসরি এবং প্রত্যক্ষ। মানুষ স্রষ্টার পুত্র নন। স্রষ্টার বান্দা, দাস। বান্দা আহ্, উহ্ বললেও প্রভু তা অবহিত হন। অন্য দিকে পুত্রকে ইয়াহুদদের প্ররোচনায় রোমান সৈন্যরা শুলে চড়াল, কিন্তু পিতা বাঁধা দিলেন না।

মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আল্লাহ্র পুত্র নন। তিনি আল্লাহ্র দাস এবং আল্লাহ্র নির্বাচিত (মুস্তফা) এবং প্রেরিত রাসূল। তিনি আল্লাহ্র বান্দাদের জন্য আল্লাহ্র নিয়োজিত শিক্ষক এবং আল্লাহ্র ধর্ম প্রচারক। আল্লাহ এর হাবীব বা হাবিবুল্লাহ। হাবীব শব্দের অর্থ বন্ধু। এ ধরনের সম্পর্ক হয় স্বাভাবিক। মানুষের সাথে আল্লাহ্র সম্পর্কটা জটিল এবং দর্শনের বেড়াজালে আবদ্ধ না করে সহজ, সরল রাখাই মানবতার কল্যাণ– ইসলাম এটা বিশ্বাস করে।

www.nagorikpathagar.org

১৩তম অধ্যায়

৪২

হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ বেদ

প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের নিজস্ব ধর্ম গ্রন্থ রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান ধর্ম গ্রন্থ ত্রিপিটক। খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ ইঞ্জিল বা বাইবেল নতুন নিয়ম। ইয়াহুদদের ধর্ম গ্রন্থ যবুর এবং তৌরাত বা পুরাতন নিয়ম। মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন। হিন্দুধর্মের সবচয়ে মৌলিক তত্ত্ব ভিত্তিক ও পবিত্র গ্রন্থসমূহ হল বেদ।

হিন্দু ধর্মের গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রাচীনতম ধর্মীয় গ্রন্থ বেদসমূহ। যেমন– ঋগবেদ, অথর্ববেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, ইত্যাদি। এই বেদ গ্রন্থগুলো এতো পবিত্র যে, শুদ্র জাতীয় মানুষের পক্ষে বেদ গ্রন্থ পাঠ করা দূরের কথা– স্পর্শ করাও অনুমোদিত নয়। বেদ গ্রন্থসমূহ পাঠ করতেন এবং চর্চা করেন শুধুমাত্র ব্রাহ্মণগণ। তাও উচ্চ স্তরের ব্রাহ্মণগণ বেদগ্রন্থ পাঠ এবং ব্যাখ্যা করতে পারেন।

হিন্দু ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কীয় গ্রন্থ সংখ্যা বহু। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত এবং হিন্দু সমাজের সর্বজন স্বীকৃত ধর্ম গ্রন্থ সমূহের মধ্যে আছে–(১) বেদ গ্রন্থ সমূহ (২) উপনিষদ গ্রন্থ সমূহ, (৩) ভগবত গীতা, (৪) পুরাণ গ্রন্থ সমূহ, (৫) মহাভারত, (৬) রামায়ণ, ইত্যাদি।

বেদ গ্রন্থ সমূহের বিষয়বস্তু হল ধর্মীয় বিশ্বাস, আমল বা করনীয় কর্ম। বেদ ধর্ম গ্রন্থে যে সমস্ত তথ্য বর্ণনা ও বিশ্লেষণ রয়েছে–তা মনে করা হয় চিরন্তন সত্য। এর শুরু নেই, শেষ নেই। বেদ গ্রন্থগুলো ছন্দ বদ্ধ শ্লোক বা মন্ত্রের সংকলন। হিন্দুদের মতে মন্ত্রের কথাগুলো হচ্ছে ঈশ্বর থেকে প্রাপ্ত। মন্ত্র হলো–ধর্মীয় কথা যা ছন্দ আকারে রচিত এবং যা ছন্দ বা সূরের মাধ্যমে গঠিত এবং পঠিত হয়।

সংহিতা

মন্ত্র পাঠ করার পর যে সমস্ত আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় কাজগুলো করা হয় তারই বিশদ ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে ৪টি বেদ গ্রন্থে। ৪টি বেদ এর মিলিত নাম সংহিতা। সংহিতা শব্দের অর্থ যা সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। আদি পুরুষ মনু কর্তৃক সংগ্রহিত সংহিতা হলো মনুসংহিতা।

শ্রুতি ও স্মৃতি

বেদ হল দেবতাদের নিজেদের মধ্যে আলোচিত তথ্য এবং যা মানুষের নিকট এসেছে। যা মানব কর্ণে শ্রুত হয়েছে। তারপর স্মৃতিতে রাখা হয়েছে এবং "স্মৃতি" হতে স্মরণ করা হয়েছে। যা শ্রুত হয়েছে তা শ্রুতি। যা স্মৃতিতে রাখা হয়েছে তা স্মৃতি গ্রন্থ।

www.nagorikpathagar.org

বেদ শব্দের অর্থ তত্ত্ব জ্ঞান। এ তত্ত্ব জ্ঞান সর্ব প্রথম ঈশ্বর এবং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত। পরম ঈশ্বরের পরবর্তী সৃষ্টি হলেন পরম ব্রহ্ম। (দ্রষ্টব্য এ পুস্তকের "গীতা ও পুরাণে সৃষ্টি প্রক্রিয়া" শীর্ষক প্রবন্ধ)। ব্রহ্ম থেকে এ তত্ত্ব জ্ঞান আসে– বনে আগুন লাগলে যেভাবে ধোয়া বেরিয়ে আসে সেভাবে। বেদের অপর নাম শ্রুতি। শ্রুতি অর্থ যা শুনা হয়েছে।

বেদের ছন্দ বদ্ধ শ্লোকগুলো শ্রোতারা শুনে শুনে মনে রাখতেন এবং প্রচার করতেন। তাই বেদের পদাবলীর নাম হয় শ্রুতি।

বেদ এর মূল তত্ত্বের গভীরতা ও অর্থ বোধির বাইরে। শ্রুতি হল এমন তত্ত্ব যা স্রষ্টার কাছ থেকে কর্ণে শ্রুত হয়েছে এবং যা শ্রুতলিপি হয়েছে বা শুনে শুনে লেখা হয়েছে। প্রকৃত কথায় বেদ হল হিন্দুদের ধর্ম শাস্ত্র যা মৌলিক তত্ত্ব কথা হিসেবে বিবেচিত।

বেদ রচয়িতা

বেদের মন্ত্রসমূহ সম্পর্কে বেদ শাস্ত্র রচয়িতা ও পাঠকদের একটি ধারণা নিম্নরূপ। বেদ হল ঈশ্বরের কাছে মানুষের প্রার্থনার সময় পঠিত মন্ত্র বা মন্ত্র পাঠ। যদিও এগুলোর রচয়িতা হিসাবে ঋষিগণকে ধরা হয়, তাহলে বিশ্বাস করা হয় যে, ঋষিগণ বেদ রচনা করেননি। মানুষও বেদ রচনা করেন না। বেদ হল ঐশ্বরিক গ্রন্থ। কেবল মাত্র মানুষের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের বাণী ঋষিগণের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে বা উচ্চারিত হয়েছে।

রচনার বহুকাল পর লিখন

লেখার কৌশল মানব সভ্যতার শুরুতে ছিল না। লেখার কৌশল আবিষ্কার হওয়ার সাথে সাথেই বেদ লিখিত হয়নি। তা লিখিত হয়েছে লেখার পদ্ধতি আবিষ্কারের বহু শতাব্দী পর। লেখার পদ্ধতি আবিষ্কারের পরেও কি কারণে বেদ লেখা হয়নি ? এর কারণ ছিল সংস্কার জাত।

যারা মুখে মুখে নীতি কথা বলতেন, তারা হয়তো এগুলোর রচয়িতা বা উৎস হিসাবে স্বীকৃত হতে চাইতেন। এসব শ্লোক বা পদ্যগুলো লিখিত হয়ে গেলে অনেকের পক্ষে মুখস্থ করা বা প্রচার করা সহজ হত। তাই নীতি কথাগুলো রচয়িতারা তাদের স্বকল্পিত ফতোয়া জারী করেন যে, যারা ধর্মের ভেদ হিসাবে বিবেচিত বেদ এর পংক্তিগুলো লিখবেন, তারা হবেন নরকবাসী। এ সংস্কারের কারণেই হয়তো বেদ বাণী বহু শতাব্দী পর্যন্ত লিখিত হয়নি (Wilkins, Hindu Mythology, p-8)।

বেদের রচনাকাল

বেদ কখন রচিত হয়– এই প্রশ্নের সঠিক জবাব অজানা। তবে এগুলো যে মানব ইতিহাসের অতি প্রাচীন রচনা, তা অনুমান করা যায়। চারটি প্রধান বেদ

www.nagorikpathagar.org

লেখা বা রচনা করা হয়েছে খৃষ্টপূর্ব ৬ শতক হতে ৩০০০ এর মধ্যে। তবে বিশেষ ধারণা করা হয় যে, খৃষ্টপূর্ব ৬ শতকে বেদ রচনা করা হয়েছে।

ভগবান বুদ্ধের ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম। ভগবান বুদ্ধের জীবনকাল ধরা হয় ৫৬৩ থেকে ৪৮৩ খৃষ্টপূর্ব পর্যন্ত। স্মৃতি গ্রন্থগুলো খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ বছর থেকে খৃষ্টপূর্ব ১৬০০ বছর সময়ের মধ্যে রচনা হয়েছে অথবা সংগৃহীত হয়েছে।

বেদের ভাষা

হিন্দু ধর্ম গ্রন্থগুলো প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সংস্কৃত ভাষা ভারত উপ মহাদেশের বহু ভাষা এবং শত শত উপভাষার উৎস। এই ভাষাটি বর্তমানে অপ্রচলিত। অপ্রচলিত হলেও এই ভাষার ব্যাকরণ ও বিধিমালা এত গুঢ় নীতিমালা ভিত্তিক যে, এই ভাষাটি অপ্রচলিত হলেও অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও জীবিত থাকবে।

হিন্দু ধর্ম বা আর্য ধর্মের ভাষাগত ধারক এবং বাহক সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ মৌলিক হলেও এর মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দীতে বহু পরিবর্তন এসেছে। সংযোগ হয়েছে এবং বিকৃতি ঘটেছে। বেদ গ্রন্থসমূহ হিন্দী এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুদিত হচ্ছে।

এমন কোন হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থ পাওয়া যায় না– যাতে পুরোহিতগণ তাদের বিশ্বাস, প্রত্যয়, মেধা ও প্রজ্ঞার প্রভাব সংযোজিত করেননি বা তাদের প্রতিভা দীপ্ত কল্পনা শক্তির প্রলেপ দেননি। হিন্দু ধর্মে বহু মহাঋষির আবির্ভাব হয়েছে। তাদের মূল্যবান বচন এবং মর্মার্থে গ্রন্থগুলো বিভিন্ন ভাষা রীতিতে সংকলিত হয়েছে।

সম্পাদনা ও সংকলন

জার্মান প্রাচ্যবিদ ও বিশারদ ম্যাক্স মুলার (Max-Muller) সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি ঋগবেদের শ্লোকগুলো ছয়টি খন্ডে সম্পদনা ও সংকলন করেন (ঋগবেদ, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১০; Fazli, Hinduism & Islam, p- 50)।

বেদ গ্রন্থ সমূহের মূল হচ্ছে পৌর কাহিনী সংক্রান্ত। এ পৌর কাহিনীগুলোর সমালোচকদের মতে কোন লিখিত ইতিহাস নেই। অজানা এবং জানার বাহিরের বিষয়াদি পৌর কাহিনীর ভিত্তি।

অতীব প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থ সমূহ উপকথা, রূপকথা, অলীকতা, লোক কাহিনী, নীতি বাক্য, সাধু জীবন কথা ও কল্পনা কাহিনীতে পরিপূর্ণ। এর ফলে ও পরিণতিতে সংস্কৃত ধর্ম কাহিনীর পুস্তক গুলোতে ঐতিহাসিক নির্ভরশীলতা ও সংযোগ আবিষ্কারে অতি উৎসাহী গবেষকগণ গলদকর্ম এবং ব্যর্থ হন (স্বামী ধর্ম তীর্থ, History of Hindu Imperialism, পৃ. ১১৬)।

www.nagorikpathagar.org

বেদ পাঠের নিষিদ্ধতা

বেদ এতই পবিত্র গ্রন্থ হিসাবে পরিচিত যে, নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের বেদ গ্রন্থ পাঠ বা স্পর্শ করার অধিকার ছিল না। কারণ, তারা জন্মগতভাবে অপবিত্র। যাদের বেদ গ্রন্থ পাঠ এবং চর্চা করার অধিকার ছিল– তারা ছিলেন উচ্চ বর্ণের বামুন হিন্দুগণ। বিশেষ করে আর্য হিন্দুগণ।

শুদ্র বা দলিত বা অন্য কোন অনার্যদের পক্ষে বেদ পড়া বা শোনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। শুধু অনার্য নয়, আর্য নারীদের জন্যও বেদের বাণী পাঠ করা বা শোনা নিষিদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়। এ শাস্তি ছিল– যারা বেদের বাণী শুনবেন তাদের কর্ণ কুহরে গলিত সীসা বা গলিত টিনের উষ্ণ তরল পদার্থ ঢেলে দেয়া এবং এ পদ্ধতিতে তাদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা।

বেদের শ্লোকগুলোর রচনাকারী অনেকে হলেও এগুলোকে ব্রাহ্মণদের গোষ্ঠিগত ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক সম্পত্তি মনে করা হয়। আর্যদের প্রভাবে অনার্যগণ বেদ গ্রন্থাবলী পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকেন।

৪৩

বেদ এর শ্রেণী বিভাগ

বেদ এর সংখ্যা বহু। শ্রেণীবিভাগও বহু। তবে বুঝার সুবিধার জন্য বেদকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ চারটি বেদ গ্রন্থ হচ্ছে (১) ঋগবেদ, (২) যজুর্বেদ, (৩) সামবেদ, (৪) অথর্ববেদ।

ঋগবেদ হল ১০২৮ ধর্মীয় শ্লোকের সংগ্রহ। এ শ্লোকগুলো ব্যবহার হতো আর্যদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। যজুর্বেদ হল পুরোহিতগণ কর্তৃক পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করার নীতিমালা। সামবেদ ঋগবেদেরই অন্য সংস্করণ। এতে ঋগবেদের শ্লোকগুলো ভিন্নভাবে সংকলিত হয়েছে।

অথর্ববেদে আছে মন্ত্র, ধাঁধা ও মুগ্ধ করণ সংক্রান্ত বিষয়াদি (PDR, p-344)। অথর্ববেদের কোন কোন বিষয় ইসলামী চিন্তাধারায় নিকটবর্তী। একম ইভা দ্বিতীয়ম–অর্থাৎ 'এক ব্যতীত দ্বিতীয় নেই' ভাবধারা ইসলাম ধর্মের তাওহীদ আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ঋগবেদ

ঋগবেদ হল দেবতা বন্দনা গ্রন্থ। এতে দেবতাদের গুণাবলী বা মহত্ত্বের বর্ণনা করা হয় এবং ছন্দের আকারে দেবতাদের গুণকীর্তন করা হয়। এই ছন্দবদ্ধ কবিতাগুলো সুশৃঙ্খল এবং ধর্মীয় ভাবাপন্ন। ঋগবেদ এর মন্ত্রগুলোর সাথে পরবর্তী বেদ এর বেশ কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। এতে ঈশ্বরের প্রশংসা ছাড়াও রয়েছে ধর্মীয় ব্যক্তিদের বর্ণনা। এগুলোর মধ্যে আছে ধর্ম সম্বন্ধে বাস্তব বিষয়ের তাৎপর্যের ব্যাখ্যা।

www.nagorikpathagar.org

ঋগবেদের যুগে দেবতা ছিলেন ইন্দ্র, অগ্নি, প্রজাপতি, ব্রহ্ম, ও বিষ্ণু। মানবতার যুগের আবির্ভাবের পূর্ব যুগ ছিল ঈশ্বরত্বর বা দেবতাদের যুগ। বৈদিক যুগে ঈশ্বরত্বের সাথে মানবত্ব এবং হিন্দুত্বের যুগের সূচনা হয়। ঈশ্বরত্ব যুগের মহান প্রতীক হলেন শ্রীকৃষ্ণ এবং পান্ডবগণ।

হিন্দু ধর্মে দেবদেবীর সংখ্যা সাড়ে ৩৩ কোটি। এ তেত্রিশ কোটির নাম কোথাও লেখা নেই এবং লেখা সম্ভবও নয়। ঋগবেদে "দুটি স্থানে" তিন হাজার তিনশত উনচল্লিশ জন (৩,৩৩৯) দেব দেবীর কথা বলা হয়েছে। ঋগবেদ, মন্ডল-৮, সুক্ত-৩০, ঋগ নং-২)। অন্যত্র তেত্রিশ জন দেব দেবীর নাম উল্লেখ রয়েছে। তবে প্রধান ঈশ্বর যে একজন–এ ধারণাও আছে। দেবদেবীর সংখ্যা ৩৩ থেকে হয়ত পূজারীদের অতি উৎসাহের ফলে সাড়ে ৩৩ কোটিতে পৌছে গেছে।

সামবেদ

সামবেদের মধ্যে ঋগবেদের শ্লোকগুলো এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে যা অধিকতর ছন্দবদ্ধ এবং সুর সংযোগে গীত হয়। এর মধ্যে আছে প্রায় এক হাজারের বেশী (১০২৮) ধর্মীয় মন্ত্র অথবা শ্লোক এবং ঋগবেদেও আছে সমসংখ্যক শ্লোক। এগুলো দশটি ভাগে বা গ্রন্থে বিভক্ত। এগুলোতে আছে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ এবং দেবলোকের বর্ণনা।

এ বর্ণনার অধিকাংশ হল ঈশ্বরের প্রশংসা এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা। এ প্রার্থনা করা হয় দেবতাদের কাছে।

যজুর্বেদ

যজুর্বেদে সংকলিত শ্লোকগুলোর মধ্যে শুধু দেবতাদের কাছে প্রার্থনা রয়েছে–তা নয়। অন্যান্য উপদেবতার পূজা সংক্রান্ত বিষয়ও আছে।

অথর্ব বেদ

অথর্ববেদের শ্লোকগুলো শুধু দেবতার উদ্দেশ্য নয়। খুব ক্ষতিকর উপদেবতা সংক্রান্ত বিষয়ও আছে। অথর্ব বেদের মধ্যে ক্ষতিকর যাদু সংক্রান্ত বিষয় স্থান পেয়েছে। যেমন একজন স্ত্রী তার সতীনকে কিভাবে হত্যা করতে পারে অথবা একজন ব্রাহ্মণ কিভাবে একজন অভিজাত ব্যক্তিকে তার অন্যায়ের জন্য শাস্তি দিতে পারেন এরূপ মন্ত্র বা শ্লোকও রয়েছে। অথর্ববেদটি হল ধর্মীয় যাজক বা পুরোহিদের জানার বিষয় এবং বাস্তবায়নের বিষয়।

বেদ গ্রন্থাবলীর রচয়িতা

বিভিন্ন সময়ে প্রণীত ধর্মীয় শ্লোকগুলো এক একটি বেদের অন্তর্ভূক্ত হিসাবে সংকলিত হয়েছে। যারা এ ধর্মীয় ধারণাগুলো কবিতা, শ্লোক আকারে প্রণয়ন করেছেন, তারা অবশ্যই ছিলেন চিন্তাবিদ ও মহাজ্ঞানী।

www.nagorikpathagar.org

বিভিন্ন মরমী কবি বা সাধকের চিন্তাধারা ও ছন্দবদ্ধ বাক্যগুলো ঋষিগণ তাদের অনুসারীদেরকে শিক্ষা দিতেন। এসব পদাবলী বা শ্লোকগুলো লিখিত আকারে রচিত হয়নি। লেখার প্রচলন ও সুবিধা তখনো ততটুকু হয়নি। বাউল কবিদের মত চিন্তাবিদেরা তাদের চিন্তা ছন্দবন্ধরূপে আবৃত্তি করে শ্রোতাদের শোনাতেন। ধর্মীয় বাক্যসমূহ কবিতার ছন্দের আকারের কারণে মনে রাখা সহজ হত।

কালক্রমে নীতিকথামূলক বাক্যাবলী দীর্ঘকাল মুনি ঋষি এবং তাদের ভক্তদের মর্মে ও কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে তা ছন্দাকারে লিখিত রূপ লাভ করে।

হিন্দুধর্ম গ্রন্থের একক রচয়িতা কেউ নন। কোন যুগে এগুলো লেখা হয়েছে তাও সুস্পষ্ট জানা যায় না। বেদ গ্রন্থগুলো ধর্ম শাস্ত্র সংক্রান্ত। কিন্তু এগুলো যে ঈশ্বর প্রদত্ত–তা ধর্মগ্রন্থে নিশ্চিত নয়। কারণ, এর তত্ত্বের মধ্যে আছে স্ববিরোধিতা। বহু বিষয় পৌরাণিক কাহিনীমূলক এবং রহস্য ঘেরা। অনেক ক্ষেত্রে অযৌক্তিক এবং পরস্পর বিরোধী তত্ত্বে পরিপূর্ণ। বিনা যুক্তিতে গ্রহণ করতে হলে– তা সহজ বা গ্রহণীয় হতে পারে।

৪৪

বেদের রচয়িতা ও সংকলন

বেদের কাহিনী এবং এর শ্লোকগুলো এক প্রকারের নয়। বিভিন্ন সময়ে বেদের কাহিনী সংকলিত হয়েছে।

আধুনিককালে ঋগবেদের একুশটি সংকলন হয়েছে। যজুর্বেদের হয়েছে বিয়াল্লিশটি সংকলন। সামবেদ এবং অথর্ববেদ এর বারটি করে সংকলন হয়েছে। একটি সংকলন থেকে পরেরটি উন্নততর এবং গুনগত মানে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

ঋগবেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ– এ চারটি হল হিন্দু ধর্মের মৌলিক এবং মূল্যবান ধর্মগ্রন্থ। ঋগবেদ হল সর্ব প্রাচীন। ঋগ শব্দের অর্থ ছন্দ বা শ্লোগান। এগুলো হল ভারতের সর্ব প্রাচীন রচনা এবং সংগ্রহ। ঋগ শব্দটি ঋক বানানেও লেখা হয়।

যারা বেদের যে সংকলনটি অনুসরণ করেন, সেটাকেই প্রকৃত বা আসল সংকলন মনে করেন। বেদের ৪টি সংকলনের মধ্যে সর্বাধিক আলোচিত, পঠিত ও সত্য বলে গৃহীত সংকলন হল ঋগবেদ।

বেদ গ্রন্থগুলোর কোনটিই এক ব্যক্তির রচনা নয়, একই সময়ে এবং এক সাথেও রচিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে প্রণীত ধর্মীয় শ্লোকগুলো এক একটি বেদের অন্তর্ভুক্ত করে সংকলিত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

বেদের সংকলক

বেদের স্বীকৃত প্রথম সংকলক কে ? বেদের প্রথম সর্বজন অথবা বহুজন স্বীকৃত সংকলক ছিলেন বিখ্যাত ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসজী। তিনি ধর্মীয় তত্ত্ব এবং তথ্য সংক্রান্ত প্রচলিত শ্লোকগুলো সংগ্রহ, সংকলন এবং সম্পাদনা করে বিশেষ রূপ দান করেন। তাই তিনি পরিচিতি হন বেদব্যাসজী এ উপ খ্যাতিতে।

ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শুধু বেদেরই সংকলক ছিলেন না, তিনি মহাভারত ও পুরাণ এবং উপ পুরাণগুলোরও রচনাকারী এবং সম্পাদক হিসাবে খ্যাত। বেদের ভাষা ছিল সংস্কৃত।

জার্মান প্রাচ্যবিদ ও বেদ বিশারদ ম্যাক্স মুলার (Max-Muller) সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি ঋগবেদের শ্লোকগুলো ছয়টি খন্ডে সম্পাদনা ও সংকলন করেন। (খন্ড ৫; p-10, Hinduism and Islam, Fazli, p-50)।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন

বেদের রচয়িতা কৃষ্ণদৈপায়ন কে ছিলেন ? কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মাতার নাম মৎস গন্ধা। তার সাথে ঋষি পরাশুরের অবৈধ যৌন সম্পর্ক ছিল। ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ছিলেন স্বাধ্বী নারী সত্যবতী ও বিখ্যাত ঋষি পরাশুরের অবৈধ সন্তান।

বিচিত্র বীর্য নামে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের এক অর্ধ-ভ্রাতা ছিলেন। তাদের মাতা ছিলেন সত্যবতী। বিচিত্র বীর্যের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তার ছিল দু'জন বিধবা স্ত্রী। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মাতা মৎস গন্ধা তাঁর পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে আদেশ করেন যে, তিনি যেন তার দুই বিধবা ভ্রাতৃবধু আমবিকা এবং আমবালিকার সাথে যৌন মিলনে মিলিত হন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবং আমবিকার মিলনের ফলে জন্ম হয় তাদের পুত্র ধৃত রাষ্ট্র। ধৃত রাষ্ট্র ছিলেন অন্ধ। তার অন্ধ হওয়ার কারণও বর্ণিত হয়েছে।

ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এর চেহারা ছিল কুৎসিত ও রুচিহীন। আমবিকা তাঁর শ্বাশুড়ি মৎস গন্ধার নির্দেশে পরলোকগত স্বামী বিচিত্র বীর্যের অর্ধ-ভ্রাতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের সাথে অবৈধ যৌন মিলনে মিলিত হতেন। কিন্তু যৌনকর্ম সময়ে আমবিকা কুৎসিৎ কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের দিকে তাকাতেন না।

আমবিকা চোখ বন্ধ করে অন্ধের মত থাকতেন। এর ফলে আমবিকা এবং কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের অবৈধ সন্তান ধৃত রাষ্ট্র হয় অন্ধ।

মাতা মৎস গন্ধার নির্দেশে ভ্রাতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তার অর্ধ ভ্রাতা বিচিত্র বীর্যের অপর স্ত্রী আমবালিকার সাথেও পুত্র সন্তান প্রাপ্তির জন্য অবৈধ মিলনে মিলিত হতেন। এ অবৈধ মিলনের ফলে জন্ম হয় বিচিত্র বীর্যের অপর ক্ষেত্র সন্তান আমবালিকার পুত্র পান্ডু এর।

www.nagorikpathagar.org

পান্ডু তার অর্ধ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের মত অন্ধ হননি। বরং হয়েছিলেন বিবর্ণ এবং ম্লান। এর কারণ ছিল। কুৎসিত ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সাথে অবৈধ মিলনের সময় তার অর্ধ ভ্রাতৃবধু আমবালিকা চোখ বন্ধ করে রাখতেন না। কিন্তু কুৎসিত দ্বৈপায়নের ভয়ে তার চেহারা বিবর্ণ এবং ম্লান হয়ে যেত। এর ফলেই তাদের সন্ত ান পান্ডুর চেহারা হয় বিবর্ণ, ম্লান এবং ফ্যাকাশে।

বেদ রচয়িতা ঋষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের আর একটি পুত্র ছিল। তার নাম বিদুর। সে ছিল পরিবারের একটি দাসীর গর্ভজাত (সুধীর চন্দ্র সরকার, পৌরাণিক অভিধান, পৃঃ ১২৬-২৭, কলিকাতা ১৩২৯ বাং)।

হিন্দুধর্ম মতে যদি কোন ব্যক্তি পুত্র সন্তান না রেখে মৃত্যু মুখে পতিত হন, তবে, তিনি স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবেন না। এ কারণে পুত্রহীন পিতারা তাদের স্ত্রীকে অন্য পুরুষদের সাথে যৌন মিলনে উৎসাহিত করতেন। এ মিলনের ফলে তাদের স্ত্রীরূপ ক্ষেত্রে অপরের ঔরসে জন্ম গ্রহণকারী যৌনতা পাপ নয় এবং পবিত্র লীলা।

এতে যে সন্তান হত তাদেরকে মূল পিতার ক্ষেত্রজ সন্তান এবং যার ঔরসে এ ক্ষেত্রজ সন্তানের জন্ম হতো, তার অর্থাৎ বীর্যদানকারীর ঔরস সন্তান হিসেবে এ ক্ষেত্রজ সন্তান বিবেচিত হতেন। বিশ্বেশ্বর মহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ১৬১০৮ জন স্ত্রীর সাথে লীলা পবিত্র কৃষ্ণলীলা নামে শাস্ত্রে অবিহিত।

ঋগবেদে একম ইভা দ্বিতীয়ম

ঋগবেদের সর্বশেষ অংশে আছে সৃষ্টিতত্ত্ব এবং এক স্রষ্টার পূজা বা আরাধনা সংক্রান্ত বিষয়। এ অংশটি খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ এর দিকে রচিত। ইসলামের তাওহীদ বা হিন্দু ধর্মের 'একম ইভা দ্বিতীয়ম' অর্থাৎ একত্ববাদের অনেক কথাই ঋগবেদের এ অংশে লক্ষ্য করা যায়।

একেশ্বরবাদ এবং তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর পূজার মধ্যে সমন্বয়ক প্রচেষ্টা হিন্দু ধর্মে ছিল। কিন্তু, তা পরবর্তী তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে হারিয়ে গেছে (ঋগবেদ অধ্যায়- ১০, শ্লোক- ১২১)।

www.nagorikpathagar.org

১৪তম অধ্যায়

৪৫

ঋগবেদ

ভারতীয় সর্বপ্রধান এবং প্রাথমিক ধর্মগ্রন্থ হল– ঋগবেদ। ঋগ এবং মন্ত্র সমার্থক শব্দ। এ মন্ত্রগুলো কবিতার ছন্দের আকারে রচিত। ঋক, শ্লোক, মন্ত্র এবং ঋগ ইত্যাদি সমার্থক শব্দ। এগুলোর অর্থ হল– স্তুতি (Hymn), স্তোত্র, স্তবগান, স্তবকীর্তণ, ইত্যাদি।

প্রাচীনকালে যারা ছন্দ মিলিয়ে কথা বলতেন তাদেরকে শিক্ষিত এবং জ্ঞানী মনে করা হত। কবিতা ছিল ভাব প্রকাশের প্রাচীনতম পদ্ধতি। ছন্দের মিলে কবিতা হয়। কিন্তু তা জ্ঞানগর্ভ নাও হতে পারে। মন্ত্র বা শ্লোক একাধিক বাক্যে হতে পারে। অন্তত দু'টি বাক্য না হলে ছন্দের মিল হয় না।

ঋগ, সুক্ত, মন্ডল

দু'টি লাইন বা বাক্য নিয়ে হয় একটি শ্লোক বা মন্ত্র বা ঋক অথবা ঋগ। কয়েকটি ঋগ বা মন্ত্র নিয়ে হয় একটি সুক্ত বা কবিতা। ঋগবেদে সুক্ত বা কবিতা সংখ্যা হল ১০২৮। কয়েকটি সুক্ত নিয়ে হয় একটি মন্ডল বা অধ্যায়।

ঋগবেদের সাথে আল্-কুরআনের মিল প্রচন্ড। ঋগবেদ পাঠ করলে মনে হবে একই উৎস থেকে দু'টির আবির্ভাব হয়েছে। আদি বৈদিক ধর্ম এবং ইসলামের মধ্যে মর্মার্থ, চেতনা এবং ভাব প্রকাশে মিল পর্যাপ্ত পরিমাণে।

সাড়ে ৩৩ কোটি দেবতা

আল্-কুরআনে এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তা'য়ালার ৯৯টি গুণবাচক নাম উল্লেখ আছে। ঋগবেদে একটি ঋকে ৩৩ টি গুণের নাম বলা হয়েছে। এই ৩৩ গুণ বা গুণ বাচক শব্দ থেকে ঈশ্বরের সংখ্যা ৩৩ সংখ্যায় পরিণত হয়েছে। এভাবে ঈশ্বরের সংখ্যা হয়েছে তেত্রিশ। এ ৩৩টি গুণই পরবর্তীতে ৩৩ কোটিতে হয়তো সম্প্রসারিত হতে পারে। এটা অতি ক্ষুদ্র একটি তিলকে তালে পরিণত করার মত। ৩৩ জন দেবতার উল্লেখ আছে ঋগবেদের ৮ম মন্ডলের ৩০ নম্বর সুক্ত এর ২ নম্বর ঋগে।

ঋগবেদের ঐ ঋগে বলা হয়েছে, হে শত্রুনাশক ঈশ্বর বা দেবগণ! তোমাদের ৩৩ জনের স্তবগীতি প্রশংসিত হয়। সকলেরই আদি মানব মণু হলেন পূজনীয় ভক্তিভাজন। এখানে মণু হলেন মনুষ্যের আদি পুরুষ। দেবগণ মণুর বংশধরদের পূজনীয়।

www.nagorikpathagar.org

ত্রিত্ববাদ

ঋগবেদের এ দেবগণ বা ঈশ্বরগণ কারা ? ঈশ্বরের সংখ্যা এখন লক্ষ লক্ষ বা ৩৩ কোটি। খৃস্টধর্মে ঈশ্বর একজন। তাঁর পুত্র একজন। ঈশ্বরের পুত্র থাকলে স্ত্রীও থাকার কথা। God এর **Goddess** বা ঈশ্বরী শব্দ আছে। কিন্তু, তিনি God-এ স্ত্রী কিনা সুস্পষ্ট নয়।

খৃষ্ট ধর্মের ত্রিত্ববাদে মেরীকে ঈশ্বর যীশুর মাতা ধরা হয়। তবে যিশুর মাতা ত্রিত্ববাদের তিনজনের একজন নন। পবিত্র আত্মা (Holy Ghost) বা পবিত্র দেবদূতকে তিন জনের একজন ধরা হয়। খৃষ্টধর্মে পুত্র ঈশ্বর যিশু আছেন, পিতা ঈশ্বর God-father আছেন। কিন্তু মাতা ঈশ্বরী Goddess নেই। তার স্থান দখল করে নিয়েছেন দেবদূত জিব্রাইল বা Gabriel. দৈবদূতগণ ব্যাকরণের শাব্দিক অর্থে স্ত্রী লিঙ্গ। কিন্তু তারা দেব দূতী নন।

ইসলাম ধর্মে ঈশ্বর বা আল্লাহ্ একজন। তাঁর দ্বিতীয় নেই। সন্তান নেই। স্ত্রী নেই। সৃষ্ট মানুষ কোটি কোটি। দেবদূত বা ফিরিস্তা বা মালাক এর সংখ্যা সীমাহীন। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি। ইসলাম ধর্মের লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি ফিরিস্তা, মালাক বা দেবদূত অনেকেই অন্য ধর্মের দেবদেবী হিসেবে উন্নীত হয়ে গেছেন মনে হয়।

গ্রহ, নক্ষত্র ও ঈশ্বর

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ হিন্দু ধর্মের দেবতাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। তাদের মতে ভারতীয়গণ প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ– তথা গ্রহ, নক্ষত্র, উপগ্রহকে ঈশ্বর বা দেবতা মনে করেন। অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য, বৃহস্পতি, বুধ, মঙ্গল, ইত্যাদি সকলেই হিন্দু ধর্মের দেবতা এবং ঈশ্বর।

হিন্দু ধর্মের পাশ্চাত্য ধর্ম বিশ্লেষকদের মতে, হিন্দুগণ প্রথম গ্রহ, উপগ্রহগুলোকে ঈশ্বর মনে করতেন। এসব ঈশ্বর সংখ্যা ৩৩ কোটি নয়। আরো বহু কোটি বা সীমাহীন। তারা ঈশ্বরের সংখ্যা সীমাহীন থেকে সর্বেশ্বর এক ঈশ্বরে এসেছেন।

সর্বেশ্বরবাদ

কোনো কোনো ধর্মাবলম্বীগণ এক ঈশ্বর থেকে বহু ঈশ্বরে পৌঁছেছেন। এ ঈশ্বর তত্ত্বের একটি চরমতম বিকাশ হল– সর্বেশ্বরবাদ অর্থাৎ সব কিছুই ঈশ্বর।

সাগর, মহাসাগর, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, ইত্যাদি তো ঈশ্বর বটেই। যে কোন প্রাণী এমন কি ক্ষুদ্র, পোকা-মাকড়ও ঈশ্বর। শুধু প্রাণযুক্ত বীজ বা সেল নয়, প্রাণহীন অণু-পরমাণুও ঈশ্বর। এটা হলো– ঈশ্বরত্ত্বের চরমতম বিকাশ। এদিক দিয়ে মুসলিমগণের ঈশ্বর বা আল্লাহ্ একমাত্র একজন।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামে শিরক

ইসলাম ধর্মে ঈশ্বর সংক্রান্ত ত্রিত্ববাদ বা তিনজনের প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরের সংখ্যা দু'জনে পৌঁছলেই ইসলাম ধর্ম শেষ। ইসলাম ধর্ম মতে, মানবতার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ হল–হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর মধ্যে। তিনিও প্রকৃত ঈশ্বর বা আল্লাহ্‌র কাছাকাছিও নন।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একজন ঈশ্বর হওয়া দূরের কথা–রাসূলুল্লাহ (সা.) হলেন আল্লাহ্‌ তায়ালার অতি ক্ষুদ্র আব্‌দ বা বান্দা বা সেবক। তবে স্রষ্টার সকল সৃষ্টির সেরা, সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম।

স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যেই রয়েছে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠত্ব। আদম জাতি স্রষ্টার প্রিয়তম সৃষ্টি। স্রষ্টাকে এক স্বীকার করে নিয়ে মানুষ পেয়েছে ঈশ্বরের পরের স্থানটি।

আধুনিক হিন্দুদের কেউ কেউ ধারণা করেন–মূল ঈশ্বর একজনই। বেদে যে দেবতার কথা বলা হয়েছে–তিনি একজনই। বহু যারা আছেন তারা একজনেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম। ঈশ্বরের গুণাবলী ৩৩ কোটি বা ৩৩ হাজার কোটি হতে পারে। যে কোন একটি নাম নিয়ে প্রকৃত হিন্দুগণ এক ঈশ্বরের পূজা করেন।

৪৬
উপনিষদ

উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, ইত্যাদি হিন্দু ধর্মের মূল অথবা মৌলিক ধর্ম গ্রন্থ নয়। এগুলো পরবর্তীকালের ঋষিদের রচনা। হিন্দু ধর্মের ঈশ্বর বা দেব-দেবী সম্পর্কে বিশ্বাসও মৌলিক বিশ্বাস নয়। অন্য বিষয়গুলো বাদ দিলেও ঈশ্বর সংক্রান্ত তত্ত্বের মধ্যেও বহু নতুন তত্ত্ব যুক্ত হয়েছে। মনোযোগ সহকারে যে কোন উপনিষদ পাঠ করলে একটির সাথে আরেকটির পার্থক্য ধরা পড়ে।

উপনিষদের সংখ্যা বহু। এর মধ্যে ১৩টি উপনিষদ অন্যগুলোর থেকে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। শঙ্করাচার্য অধিকাংশ উপনিষদের ব্যাখ্যা বা ভাষ্য রচনা করেছেন। এসব ভাষ্যগুলোকে বলা হয়- (১) ঈশ উপনিষদ,, (২) ছন্দোগ্য উপনিষদ, (৩) বৃহদারণ্যক উপনিষদ, (৪) ঐত্রিয় উপনিষদ, (৫) তৈত্রীয় উপনিষদ, (৬) প্রশ্ন উপনিষদ, (৭) কেনা উপনিষদ, (৮) কথা উপনিষদ, (৯) মুন্দক উপনিষদ, (১০) মান্ডুক্য উপনিষদ, (১১) কৌশিতকি উপনিষদ, (১২) মৈত্রী উপনিষদ, (১৩) শ্বেতষ্য উপনিষদ।

আকবরীয় উপনিষদ

মোঘল সম্রাট আকবরের আমলে রাজ দরবারে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র বিশেষ করে উপনিষদ চর্চা বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য উপনিষদ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে নতুন একটি

www.nagorikpathagar.org

উপনিষদ সংকলন করা হয়। এ উপনিষদের নামটি আল্লাহ্‌র নামের সাথে সঙ্গতি রেখে নাম দেয়া হয় অল্লোপনিষদ বা আল্লাহ্‌র উপনিষদ।

ক্ষত্রিয় রাজা ও সম্রাটগণ উপনিষদ চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। উপনিষদ চর্চার পৃষ্ঠপোষকতাকারী রাজন্যবর্গের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন– (১) অজাত শত্রু, (২) জানক, (৩) অশ্বপতি, (৪) প্রহনজেয়ালী, (৫) মুঘল সম্রাট আকবর। উপনিষদ পৃষ্ঠপোষকতাকারী রাজন্যবর্গ জনগণকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ করার জন্য উপনিষদ শিক্ষাকে ব্যবহার করতেন।

উপনিষদের একটি শিক্ষা দীর্ঘায়ু কামনা। ঈশ উপনিষদের একটি শিক্ষা হচ্ছে– ১০০ কর্ম বর্ষ বেঁচে থাকার সাধনা করা (ঈশ উপনিষদ, মন্ত্র-২)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন– যার জীবন দীর্ঘ এবং আমল নেক, তিনি উত্তম মানুষ।-(আবূ ঈসা তিরমিযী, সহীহ্; ঈমাম নাবাবী, রিয়াদুস্ সালেহীন, বাবুল মুজাহাদ, পৃষ্ঠা-৬৮)। এ বাণীর মর্মার্থের সঙ্গে উপনিষদের শিক্ষার কিছুটা মিল আছে।

উপনিষদের মধ্যে তাওহীদ বা একেশ্বরবাদের শিক্ষা রয়েছে। এক ঈশ্বরকে উপনিষদে বলা হয়েছে–(১) ব্রহ্ম, (২) পরম ব্রহ্ম, (৩) পরমাত্মা। উপনিষদে বলা হয়েছে– "দৃষ্টি অথবা দৈহিক ঈন্দ্রীয়জাত অনুভূতি, শব্দ, মন, ইত্যাদি দ্বারা ব্রহ্মকে অনুধাবন করা যায় না"।

ব্রহ্ম কিরূপ ? তা মানুষের বোধির উর্ধ্বে। ব্রহ্মাকে বর্ণনাও করা যায় না। জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত বিষয় থেকে ব্রহ্মা স্বতন্ত্র। এভাবেই আচার্যগণ উপনিষদে ব্রহ্মার বর্ণনা দিয়েছেন।-(কেন উপনিষদ, খন্ড-২, মন্ত্র-৩,৪)।

আল্-কুরআনে আল্লাহ্ সম্বন্ধে বলা হয়েছে– কোন কিছুই আল্লাহ্‌র সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।-(সূরা শুরা-৪২, আয়াত-১১)।

সূরা ইখলাসে বলা হয়েছে– তিনি (আল্লাহ্) এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। (আল্-কুরআন, সূরা ইখলাস-১১২ঃ৪)।

হযরত আবু বাক্‌র্ (রা.) আল্লাহ্‌র জ্ঞান সম্বন্ধে বলেছেন– আল্লাহ্‌কে জানা যায় না। এ জ্ঞানই হল– খাঁটি জ্ঞান।-(ঈমাম গাজ্জালী ঃ ইহ্‌ইয়াহ্-উল-উলূম আদ্‌দীন, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৬২)।

একই তত্ত্বটি "কেন উপনিষদে" বলা হয়েছে নিম্নোক্তভাবে। যে জানে যে সে ব্রহ্মকে জানে না তাঁর জ্ঞান সঠিক। যে মনে করে সে ব্রহ্মকে জানে প্রকৃতপক্ষে সে ব্রহ্মকে জানে না।

ব্রহ্ম এমন এক সত্ত্বা, যার সম্বন্ধে যারা নিজেদেরকে অবহিত মনে করেন তারা প্রকৃত ব্রহ্মাকে জানেন না। তারাই ব্রহ্মাকে জানেন, যারা মনে করেন যে, তারা

www.nagorikpathagar.org

ব্রহ্মাকে জানে না।-(কেন উপনিষদ, খন্ড-২, মন্ত্র-৩)। অর্থাৎ ব্রহ্মাকে পরিপূর্ণ জানা সম্ভব নয়।

"কেন উপনিষদে" মানুষকে আরো বলা হয়েছে– ব্রহ্মা ছাড়া অন্য কিছুকে পূজা করবে না। কোন কিছুকে যারা ব্রহ্ম পূজা করে, তারা সত্যিকার ব্রহ্ম পূজারী নয়। (কেন উপনিষদ, খন্ড-১, মন্ত্র-৭)।

ব্রহ্ম এমন এক শক্তি যা নয়ন দ্বারা দেখা যায় না। কিন্তু, ব্রহ্ম শক্তি মানুষকে দৃষ্টি শক্তি দান করেন। মানুষ যাকে ব্রহ্ম হিসাবে গণ্য করে এবং পূজা করে অবশ্যই তা ব্রহ্ম নয়। এর অর্থ হল– মানুষ এমন বহু বিষয় বা বস্তুকে ব্রহ্ম জ্ঞানে পূজা করে যেগুলো সত্যিকার ব্রহ্ম নয়। ব্রহ্মকে দেখা যায় না।

কোন ঈন্দ্রীয় দ্বারা ব্রহ্মকে অনুভব করা যায় না। ব্রহ্ম ঈন্দ্রীয় দ্বারা অনুভূত শক্তির অতীত। কিন্তু যে শক্তি দ্বারা কোন বস্তু সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান অর্জন করা যায়, ঐ শক্তি আসে ব্রহ্মা থেকে।

আল্-কুরআনে স্রষ্টা সম্বন্ধে বলা হয়েছে– দৃষ্টি স্রষ্টাকে অবধারণ করতে পারে না। কিন্তু তিনি অবধারণ করেন সকল দৃষ্টি। তিনি সুক্ষ্মদর্শী। তিনি সব কিছু পরিজ্ঞাত। -(আল্-কুরআন, সূরা আন'আম-৬, আয়াত-১০৩)।

সূফী-ঋষিদের উপনিষদ চর্চা

সূফী, ঋষি, দরবেশগণ মুসলিমদের স্বর্ণযুগে উপনিষদ চর্চায় খুবই উৎসাহী ছিলেন। শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকোকে হিন্দু ঋষিগণ কাদিরিয়া সূফী তরিকায় বিশ্বাসী মনে করেন। দারাশিকো উপনিষদ চর্চায় খুবই উৎসাহী ছিলেন (১৬১৫-১৬৫৯ খ্রী.)।

দারাশিকো সংস্কৃত ভাষায় রচিত ৫০টি উপনিষদ ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করান। পাশ্চাত্যের বৈদিক স্কলারগণ সংস্কৃত নয়, পারস্য ভাষার সাহায্যেই উপনিষদের সাথে পরিচিত হন।

বিখ্যাত বৈদিক গবেষক Max Muller তাঁর রচিত Sacred Books of the East গ্রন্থে দারাশিকোর উপনিষদ চর্চার বিষয় উল্লেখ করেছেন। তিনি দারাশিকোর পৃষ্ঠপোষকতায় ফার্সি ভাষায় অনুদিত উপনিষদ পাঠ করেন।

Max Muller বর্ণনা করেছেন যে, দারাশিকোর পৃষ্ঠপোষকতায় ফার্সি ভাষায় অনুদিত উপনিষদের একটি কপি French Resident & Gental দারাশিকোর পৃষ্ঠপোষকতায় হস্তগত করেন। তিনি এটি পান পারস্য সম্রাট ফুয়াদুদ্দৌলার প্রাসাদে। তিনি তা হস্তান্তর করেন ভ্রমণকারী Anguitle Duvran এর কাছে।

www.nagorikpathagar.org

অন্য বর্ণনায় দেখা যায়–Bernier সাহেব তা ইরান থেকে France এ নিয়ে যান এবং Duvran এর কাছে হস্তান্তর করেন। Duvran এ উপনিষদগুলো ফরাসী এবং ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। ল্যাটিন অনুবাদটি প্রকাশিত হয় দুই খন্ডে ১৮০১-১৮০২ খ্রী.। তিনি এ উপনিষদের নাম দেন Oupnekhat. (Sacred Books of the East, Vol-1, Introduction).

৪৭

পুরাণ

"পুরাণ" শিরোনামের গ্রন্থসমূহে হিন্দুধর্মের দেবতা, ঋষি ও গুণী জনের জীবন কাহিনী, পৌরাণিক কাহিনী, উপকথা, ইত্যাদি সংকলিত গ্রন্থ। হিন্দু ধর্মে প্রধান প্রধান পুরাণ কাহিনী হল আঠারটি। দ্বিতীয় পর্যায়ের পৌরাণিক কাহিনীও আঠারটি। (সুধীরচন্দ্র সরকার, পৌরাণিক অভিধান, কলিকাতা, ১৩৫২, বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৯৭-৩০১)।

পুরাণ গ্রন্থ সমূহে যাদের প্রশংসা ও বন্দনা সার্বজনীন– তারা হলেন মহান স্রষ্টা ব্রম্মা, বিশ্ব পালনকর্তা বিষ্ণু এবং মহাদেব শীব। এরা সর্ব ভারতে তথা সমগ্র বিশ্বে পূজনীয়। যারা সর্ব ভারতীয় দেবতা নন, স্থানীয়ভাবে পূজনীয় এমন বহু দেবতা রয়েছেন এবং তাদের প্রশংসা এবং সে অঞ্চলের স্তবগীতও বেশী করা হয়েছে।

প্রত্যেকটি পুরাণ বিশেষ বিশেষ দেবতার গুণাবলী বর্ণনা ও বন্দনায় সমৃদ্ধ। যেহেতু কোন কোন দেবতার প্রশংসা বেশী করা হয়েছে, সে কারণে অন্যদের সম্বন্ধে তুলনামূলক অবজ্ঞা অস্পষ্ট নয়। যার স্তবগীতি বেশী হয়েছে– তাদের অবতার বা প্রতিচ্ছায়ারূপ দেবতাদের বর্ণনা সে তুলনায় কম হয়েছে।

ধর্মগ্রন্থ হিসাবে পুরাণের স্থান বেদ এবং উপনিষদের পরবর্তী নিম্ন স্তরের। পবিত্রতার দিক দিয়ে বেদ এবং উপনিষদ পুরাণ অপেক্ষা উচ্চ স্তরের। পুরাণের বিষয় বস্তুহলো– দেবতাদের বংশ, তথ্য এবং ইতিহাস। এই গ্রন্থগুলো দেবতাদের ইতিহাস নয়। বরং, পৌরাণিক রহস্য কাহিনী, অতি কথামূলক পৌর শক্তি সম্পন্ন এবং অবাস্তব কাহিনী।

অনেকের ধারণা, অধিকাংশ পুরাণ এর রচয়িতা হল মহাজ্ঞানী কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসজী। তিনি শুধু বেদেরই রচয়িতা নন, মহাভারতেরও রচয়িতা।

পুরাণ কাহিনীগুলো প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে মধ্য এবং মোঘল যুগ হয়ে বিভিন্ন যুগে রচিত হয়েছে। তবে অধিকাংশ পুরাণ কাহিনীরই রচনা শুরু হয়েছে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব হতে (Wilkins, 1993, p-90)। এ পুরাণ কাহিনীর মধ্যেই দেবতাদের মূর্তি পূজার ঐতিহ্য দৃঢ়করণ করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

"পুরাণ" কাহিনীর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলো মহিলা এবং নিম্ন বর্ণের হিন্দুরাও পড়তে পারেন। কিন্তু বেদ তাদের পাঠ ও স্পর্শের অতীত। যেহেতু সকলেই পৌরাণিক কাহিনী জানতে এবং পড়তে পারেন, তাই এ কাহিনীগুলোর অবহিতি অত্যন্ত ব্যাপক।

তন্ত্র গ্রন্থ

সারা ভারতে মহাদেব শিব এবং শিব পরিবারের পূজাই বেশী করা হয়। তন্ত্র গ্রন্থগুলো হলো শিব এবং তার স্ত্রীদের ধর্ম, পূজা-পার্বন, নীতিমালা ও আলোচনা সংক্রান্ত।

পঞ্চবেদকে শাক্ত বেদ বলা হয় এবং পঞ্চবেদের অনুসারীদেরকেও শাক্ত বলা হয়। শাক্তগণ শিবের স্ত্রীদের পূজারী। এরা দেব প্রেম ও দেব বন্দনার মাধ্যমে ঐশ্বরিক ধ্যান ধারণার ও রহস্যের অনুসারী এবং অধিকারী হয়ে থাকেন। তন্ত্র গ্রন্থগুলো রচনাকাল ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বের।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহ

চার প্রকার বেদ ছাড়াও হিন্দু ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থের মধ্যে শতাধিক বেদের শতাধিক ভাষ্য গ্রন্থ হলো ব্রাহ্মণসমূহ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বেদের ব্যাখ্যা আছে। তদুপরি আছে পূজা, পার্বন উপলক্ষে অর্চনা ব্যবহার পদ্ধতি। প্রত্যেকটি বেদেরই ব্রাহ্মণ ভাষ্য রয়েছে।

মৌলিক ব্রাহ্মণের সংখ্যা মোট আট। সামবেদের ভাষ্য আছে তিনটি। ব্রাহ্মণ রচনার সাথে সাথে আবির্ভূত হয়েছে হিন্দু ব্রাহ্মণ পুরোহিত শ্রেণী– যারা পূজা অর্চনায় নেতৃত্ব দান করেন। আরও সৃষ্টি হয়েছে দেবতাদেরকে নিয়ে নানা গল্প উপাখ্যান, দেব সঙ্গীত ও অর্চনা সঙ্গীত।

আরণ্যক বেদ (অরণ্য গ্রন্থ)

ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বেদের ব্রাহ্মণ জাতীয় ভাষ্য ছিল পূজা পার্বণের অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক। এর প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় পবিত্র আরণ্যক গ্রন্থাবলী। ঋষিগণ জনবসতি থেকে দূরে অরণ্যের নীরবতায় আরণ্যক গ্রন্থগুলো গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করতেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পূজা-অর্চনার নিগুঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করা। এ আরণ্যক গ্রন্থগুলো ছিল বেদ গ্রন্থ ভিত্তিক। ঋগবেদের আরণ্যক ছিল দু'টি এবং অথর্ব বেদের আরণ্যক ছিল একটি।

বিশ্বাস ও কুসংস্কার

www.nagorikpathagar.org

হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ সমূহে এমন কিছু বিশ্বাস, বিধি বর্ণিত হয়েছে– তা যে কোন বিজ্ঞ ও চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে মনে হতে পারে অত্যন্ত অবাস্তব, কাল্পনিক এমন কি হাস্যাস্পদ। দেবতাদের সম্পর্কীয় এমন বহু গল্পের সমাবেশ ঘটেছে পুরাণ গ্রন্থে। হিন্দু ঋষি ও ধর্মবেত্তাগণ প্রাকৃতিক ঘটনা সমূহে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যার মাধ্যমে তাদের দেব দেবীগণের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

হিন্দুদের আদি এবং মৌলিক ধর্মগ্রন্থ হলো বেদ। এটাই হিন্দুধর্মের প্রধান উৎস। বেদ এত পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত যে, নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের বেদ গ্রন্থ পাঠ বা স্পর্শ করার অধিকার ছিল না। কারণ, তারা জন্মগতভাবে অপবিত্র। যাদের বেদগ্রন্থ পাঠ এবং চর্চা করার অধিকার ছিল– তারা হলেন উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ। বিশেষ করে আর্য হিন্দুগণ। বেদ গ্রন্থগুলো রচিত ছিল সংস্কৃত ভাষায়। হিন্দু ধর্মীয় বিষয় বেদ চর্চায় সীমিত ছিল না। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ যেমন– মহাভারত, গীতা, রামায়ণ, পুরাণ, আরণ্যক, তান্ত্রিক গ্রন্থগুলো প্রাধান্য পেয়ে আসছে।

www.nagorikpathagar.org

১৫তম অধ্যায়

৪৮

শ্রুতি, স্মৃতি ও বেদ

শ্রুতি

বেদ এর একটি নাম শ্রুতি। কারণ এটা প্রথমত লিখিত গ্রন্থ ছিল না। বেদ এর শিক্ষাসমূহ বেদ অনুসারীগণ একজন আরেকজন থেকে শ্রবণ করতেন। যে বিদ্যা শ্রবণের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল, তা শ্রুতি নামে পরিচিত হয়।

লেখার বিদ্যা এবং বিজ্ঞান আবিষ্কারের পূর্বে শ্রবণ করার পদ্ধতি উন্নয়ন হয়। এখনও মানব শিশু প্রথমত শ্রবণের মাধ্যমে তাদের শ্রুত বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ক্রমশ তারা লিখন ক্ষমতা অর্জন করে।

শুধুমাত্র শ্রবণের মাধ্যমে বিদ্যার্জনের অসুবিধা হল– শ্রুত বিষয় ভুলে যাওয়া। স্মৃতি মানব মন থেকে যত দ্রুত বিলীন হয়, লেখা বিষয় তত দ্রুত নষ্ট হয় না। বর্তমানে শব্দ এবং স্বর রেকর্ড করা বিদ্যার উন্নয়ন হয়েছে। এখনো পারস্পরিক চুক্তি শুধুমাত্র রেকর্ডকৃত নয় বরং লিখিত হয়ে থাকে।

শ্রুত বিদ্যা বা তথ্য বা জ্ঞান মানুষ যত দ্রুত ভুলে যায়, লিখিত বিদ্যা বা বিষয় তত দ্রুত বিস্মৃত এবং বিলীন হয় না। সবশেষে নাজেলকৃত ঐশ্বরিক গ্রন্থ সংরক্ষণের জন্য মুখস্থকরণ বিদ্যার সাথে সাথে লেখনের কাজও সম্পাদিত হয়।

আল-কুরআন শ্রবণ করে হিফয করা বা মুখস্থ করণের বিষয়টিতে মুসলিমগণ যত গুরুত্বারোপ করে থাকে–অন্য কোন ধর্মাবলম্বীগণ তাদের ধর্মীয় পুস্তক মূল ভাষায় মুখস্থ করণের উপর তত গুরুত্বারোপ করেন না।

তদুপরি আল-কুরআন হুবহু লিখে রাখার উপর মুসলিমদের সতর্কতা ছিল অত্যধিক। এ কারণে বিভিন্ন দেশে লিখিত কুরআনের মধ্যে একটি শব্দ বা অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় না।

স্মৃতি

ধর্মগ্রন্থ বেদ এর অপর একটি নাম হল স্মৃতি অর্থাৎ হিফযকৃত বা স্মৃতিতে সংরক্ষিত গ্রন্থ। স্মৃতি এমন গ্রন্থ যা হিফয বা মুখস্থ করে স্মৃতিতে রাখা হয়। বেদ লিখে রাখার বিদ্যা উন্নয়নের পূর্বে একজন থেকে অপর জনের শ্রুত বেদ বা শ্রুতি গ্রন্থ মুখস্থ করে স্মৃতিতে রাখা হত যেমন মুসলিমগণ সমগ্র কুরআন শ্রবণ করে বা পাঠ করে হিফজ করেন অর্থাৎ স্মৃতিতে রাখেন।

স্মৃতিতে সংরক্ষিত করার কারণে বেদ এর এক নাম হয় স্মৃতি। স্মৃতিতে যা থাকে, তা মানুষ অতি দ্রুত ভুলে যায়।

www.nagorikpathagar.org

আল কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গী সাথীগণ শ্রুত আল-কুরআন তাদের স্মৃতিতে মুখস্থ এবং হিফয করে রাখতেন।

এ হিফজ পদ্ধতি একটি বিজ্ঞান হিসেবে মুসলিম সমাজে উন্নীত হয়, যার কোন দ্বিতীয় উদাহরণ অন্য ধর্মে নেই। সমগ্র বিশ্বে শুধু শত শত বা হাজার হাজার কুরআন হিফযকারী আছেন তা নয়, যাদের স্মৃতিতে আল-কুরআন সংরক্ষিত আছে– এমন স্মৃতিতে সংরক্ষণকারী হাফিযের সংখ্যা মুসলিম বিশ্বে লক্ষ লক্ষ। বিশ্বের সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বজনীন শ্রুতি এবং স্মৃতি গ্রন্থ আল-কুরআন। বেদ এর কতজন শ্রুতিবিদ বা স্মৃতি ধারক সমগ্র ভারতে পাওয়া যাবে ! কুরআনের হাফিয পাওয়া যাবে লক্ষ লক্ষ।

৪৯

ঋগবেদে সূরা আর রাহমানের প্রতিধ্বনি

ঋগবেদের কিছু কিছু শ্লোকের বর্ণনা নিম্নরূপঃ তিনি কোন্ পরম ঈশ্বর যার উদ্দেশ্যে আমি পূজা অর্চনা করব? তিনি মহান ঈশ্বর যিনি আমাকে দিয়েছেন জীবন। যিনি দিয়েছেন শক্তি সামর্থ। ঈশ্বরের নির্দেশ সকল উজ্জ্বল দেবতাবৃন্দ অবনত মস্তকে পালন করেন। ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি হল অমরত্ব। তার ছায়া হল মৃত্যু।

একচ্ছত্র প্রভু

তিনি কোন ঈশ্বর, যার পূজা-অর্চনা আমি করব? তিনি ঐ ঈশ্বর যিনি নিজ শক্তি বলে সকল নিঃশ্বাস বিশিষ্ট প্রাণী ও আলোকিত বিশ্বের একচ্ছত্র মালিক বা প্রভু। তিনি বিশ্বের মানব এবং পশু তথা সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন।

তিনি কোন্ মহান ঈশ্বর যার পূজা-অর্চনা আমি করব? তিনি সেই পরম ঈশ্বর যার শক্তিতে সৃষ্টি হয়েছে তুষার ধবল পর্বতাবলী, সমুদ্র, মহাসমুদ্র, সুদীর্ঘ (রস) নদী। সকল দিক দিগন্ত সে মহা প্রভুর দুটি বাহুর মত।

ভূমন্ডল

তিনি কোন্ ঈশ্বর, যার পূজা অর্চনা আমি করব ? তিনি সে ঈশ্বর যার ইচ্ছায় এক মুহূর্তে সৃষ্টি হয়েছে মহাকাশ মন্ডল, ধরণীপুঞ্জ এবং তার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে ভূমন্ডল ও নভোমন্ডল। তিনি নভোমন্ডলে অন্তর্ভূক্ত করেছেন পরিমিত বায়ুমন্ডল।

নভোমন্ডল

তিনি কোন্ ঈশ্বর যার উদ্দেশ্যে আমরা পূজা অর্চনা করব? তিনি সে ঈশ্বর যার ইচ্ছায় নভোমন্ডল ও পৃথিবী দৃঢ়ভাবে আছে। উর্ধ্ব দিকে তাকিয়ে আছে ভীত প্রকম্পিত হৃদয়ে। যে নভোমন্ডলে সূর্য অধিকতর কিরণ বিতরণ করে।

www.nagorikpathagar.org

হিরণ্যগর্ভ

তিনি কোন্ ঈশ্বর যার উদ্দেশ্যে আমরা পূজা-অর্চনা করব? তিনি সে মহান ঈশ্বর যার ইচ্ছায় মহানদীসমূহ বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়। হিরণ্যগর্ভ দৃঢ়ভাবে স্থাপিত–যা থেকে বিকশিত হয় আলোকমালা এবং তা থেকে নিঃসৃত হয় দেবদেবীদের শ্বাস-প্রশ্বাস।

প্রাকৃতিক শক্তি দেবতা

তিনি কোন পরম ঈশ্বর যার উদ্দেশ্যে আমরা পূজা অর্চনা করব ? তিনি সে পরম ঈশ্বর যিনি স্বীয় শক্তি বলে সলীল সমুদ্র থেকে দৃষ্টিপাত করেন এবং সে সলীল মালায় আছে জীবানু শক্তি এবং যা থেকে সৃষ্টি হয় আলো। তিনি সে পরম ঈশ্বর যিনি সকল দেবদেবীর উপরে একমাত্র পরম ঈশ্বর।

সুবিচারক

তিনি কোন্ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যার উদ্দেশ্যে আমরা পূজা অর্চনা করব? তিনি সেই ঈশ্বর যার থেকে আমাদের কোন দুঃখ এবং ক্ষতি আসবে না। যিনি সৃজন করেছেন বিশ্ব চরাচর। তিনি সুবিচারক, যিনি সৃষ্টি করেছেন স্বর্গ মর্ত। যিনি সৃজন করেছেন উজ্জ্বল আকাশ এবং প্রবল জল প্রবাহ।

ঋগবেদের উপরোক্ত শ্লোক সমূহে (১০ম অধ্যায়, শ্লোক ১২১ থেকে) আল-কুরআনুল কারীমের সূরা আর-রাহমানের একটি বাক্যের সে বর্ণনাভঙ্গি "ফাবে আইয়ে আলায়ে রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান" (তোমাদের প্রভুর কোন অনুগ্রহ তোমরা অস্বীকার করবে?" আয়াতে বর্ণনা ভঙ্গির অনুরণ এবং প্রতিফলন রয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালার পথহারা হিন্দু বান্দাদেরকে পথ দেখাবার দায়িত্ব কাদের? এ বিষয়ে কি হাশরের ময়দানে কোন জিজ্ঞাসাবাদ হবে না ?

যেহেতু বেদ রচয়িতাবৃন্দ এবং রচনাকাল সীমিত বা নির্ধারিত নয়, তাই পরস্পর বিরোধী তথ্য বা তত্ত্বের সমাবেশ বেদ গ্রন্থগুলোতে রয়েছে। তবে, যারা এ তত্ত্ব ও তথ্যগুলো সংগ্রহ, সংকলন এবং বর্ণনাকারী–তারা স্ববিরোধী হলেও তারা ছিলেন মহা প্রতিভাধর। এ গ্রন্থগুলোতে হাজার হাজার যুক্তি ও তথ্য সংক্রান্ত ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা থাকলেও লক্ষ লক্ষ ধর্মীয় অনুসারী ও কোটি কোটি ভক্তবৃন্দের কাছে পবিত্র গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণীয় এবং তাদের দ্বারা পূজিত।

৫০

৯৯ গুণ বনাম ৯৯ নাম

আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী একজন ঈশ্বরের ১০০টি নাম বেদ গ্রন্থে আবিষ্কার করেছেন। একজন মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদ উল্লেখ করেছেন যে, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর হিসাব মতে, তাঁর রচিত বেদ ভাষ্যে ঈশ্বরের সংখ্যা ১০০ নয়, বরং ৯৯।

www.nagorikpathagar.org

তাঁর বেদ ভাষ্যে ঈশ্বরের সংখ্যা ১০০ হয়ে গেছে– কারণ, তিনি শিবের নামটি দু'বার উল্লেখ করেছেন দু'ই শব্দে।-(মাওলানা সৈয়দ হামীদ আলী, উর্দু গ্রন্থ "হিন্দু মত আওর তাওহীদ", (হিন্দুধর্ম এবং একত্ববাদ, পৃষ্ঠা-৬৭)।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এবং আরো অনেকে একই শক্তিকে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করেছেন। ঋগবেদের প্রথম মন্ডল বা অধ্যায়ের ১টি মন্ত্র হল– তাঁর নাম (১) ঈন্দ্র, (২) মিত্র, (৩) বরুণ এবং (৪) অগ্নি। তিনি গরুদও। তিনি বিদ্যুতের ন্যায় আকাশ ছিদ্র করে উড্ডীয়মান হন।-(ঋগবেদ, মন্ডল-১, সুক্ত-১৬৪, ঋক-৪৬)।

জ্ঞানীগণ একই সত্ত্বাকে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করেন। বিদ্যুতাগ্নী, যম, যাত্রীস্ব, প্রভুও প্রকৃত পক্ষে একজনই।-(T. Muhammad, "One God, One Creed, Discover Islam. Manama, Bahrain, page-29).

হিন্দুঋষিগণ বস্তুত এক ঈশ্বরকেই বহু শব্দে বা নামে প্রকাশ করেছেন। মানব কল্পিত ঐ সমস্ত শব্দ বা নামগুলোর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সবগুলো শব্দের অর্থ এক নয়। যেহেতু সবগুলো শব্দের অর্থ এক নয়, তাই ধরা হয়েছে ঈশ্বরও বহু। তারা ভিন্ন ভিন্ন গুণধারী এবং তাঁদের সংখ্যাও বহু।

ঋষি ও দার্শনিকের সাথে ঈশ্বরের স্তব, স্তুতি, আরাধনা, যিকর, হাম্‌দ, ইত্যাদিতে যোগ দিয়েছেন কবি সাহিত্যিকগণও। তাই ঈশ্বর সূচক শব্দের সংখ্যা বা নামের সংখ্যা যত বেড়েছে– ঈশ্বরের সংখ্যাও তত বেড়ে গেছে।

একটি বৈদিক ঋক বা মন্ত্র হল–একম, সত্যম, বহুধা কল্পয়ান্তি– অর্থাৎ এক সত্যকে বহুভাবে ঋষিগণ কল্পনা করে থাকেন।-(ঋগবেদ, মন্ডল-১০, সুক্ত-১১৪, ঋক নম্বর-৫)।

ঋগবেদে যে ঈশ্বরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে– তিনি বহু নন। কিন্তু তাঁর নাম বহু। এটাই যদি আসল কথা হয়, তাহলে ইসলাম ও হিন্দুধর্মে পার্থক্য কোথায়? বেদে বলা হয়েছে– "ও দেব নামধা এক ইভা"। (ঋগবেদ, মন্ডল-১০, সুক্ত-৮২, ঋক-৩)।

"নামধা এক ইভা" ঋকের অর্থ হলো– হে দেব তব নাম ধ্যান করি। তুমি এক ব্যতীত নও।-(ঋগবেদ, মন্ডল-১০, সুক্ত-৮২, ঋক-৩)।

কোন কোন ধর্মতত্ত্ববিদ হিন্দু এখন তাদের বিশ্লেষণে বলেছেন– ঋগবেদে কোন মনুষ্য দেবতার পূজার উল্লেখ করা হয়নি। ঋগবেদে এক ঈশ্বর তত্ত্বই প্রতিফলিত হয়েছে।-(V.V.K. Valat, Through the Rigveda, page-124).

www.nagorikpathagar.org

১৬তম অধ্যায়

৫১

ভগবত গীতা

ভগবত গীতা হিন্দুদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্মগ্রন্থ। এটা হিন্দু ধর্মের বাইবেল হিসাবে পরিচিত। ভগবত গীতা মহাভারতেরই অংশ। এর রচয়িতা হলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসজী।

গীতা মহাভারতেরই অংশ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের প্রতি সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাবলী গীতাতে সংকলিত হয়েছে। মহাভারত মানব রচিত হলেও গীতা ঈশ্বরপ্রদত্ত বাণী হিসাবেই প্রদত্ত এবং গৃহিত। সমাজে হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বাধিক সমাদৃত এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসাবে গীতা বিবেচিত।

গীতা গ্রন্থটির উপরে হিন্দু ধর্ম বিশেষজ্ঞগণ সবচেয়ে বেশী গবেষণা করেছেন। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন এবং ভাষ্য রচনা করেছেন। গীতার উপরে এবং গীতা সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা ও গবেষণা এবং গীতাচর্চা শুধু ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ এবং বিদগ্ধ ব্যক্তিরাই করেছেন, তা নয়। সাধারণ পাঠক এবং লেখকদের ধর্ম চর্চার জন্য গীতা অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ। ধর্মীয় নির্দেশনা হিসাবে গীতাই ধরা হয় নির্ভুল গ্রন্থ এবং বাস্তব জীবনের দিক নির্দেশনা।

গীতার মূল বিষয় বস্তু হচ্ছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মহাযোদ্ধা এবং মহাবীর অর্জুনকে প্রদত্ত উপদেশাবলী। গীতার সবচেয়ে বড় শিক্ষা এটাই যে– হক, সত্য, ন্যায় এবং ইনসাফের জন্য প্রয়োজনবোধে নিজের আত্মীয়, বংশীয় এবং অতি আপনজনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে এবং অস্ত্র ধারণ করতে হয়। এটা শুধু সংগত নয়, বরং অবশ্য করণীয় ধর্মীয় কর্তব্য। এ দায়িত্ব পালন না করা অথবা অবহেলা করা অথবা তা থেকে বিরত থাকা ধর্ম মতে মহাপাপ। এতে ঈশ্বরের অভিশাপে অভিশপ্ত হতে হয়। এটা গীতার একটি মহা শিক্ষা।

মহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর বিষ্ণুর অবতার হিসাবে অর্জুনকে বলেন–সমস্ত বিষয়ে অবগত না হলেও যা সত্য, যা ন্যায়, যা ধর্মীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক, তা করতে হবে। এর পরিণতি যাই হোক না কেন। এরূপ ক্ষেত্রে ঈশ্বরিক নির্দেশ পালন করাই মানুষের কর্তব্য। কর্তব্য পালন করতে হবে। ভাল-মন্দ, সঙ্গত, অসঙ্গত, ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা ও বিতর্ক ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দিতে হবে।

অধিকাংশ হিন্দুর কাছে হিন্দু ধর্মের মূলকথা রয়েছে গীতায়। এর নৈতিকতা ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের। গীতার প্রধান বাণী হল জীবন ও আত্মার পরিত্রাণ প্রাপ্তি। এজন্য যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হোক না কেন– উদ্দেশ্য ঠিক থাকলে সকল পথ ও পদ্ধতি বৈধ।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী মূল্যবোধে পেশাব দিয়ে উযু করে নামায পড়লে তা কবুল হবে না। উযুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করলে বিধি নিষেধ কিছুটা রক্ষা হয়। তারও সীমা আছে। যেমন অপবিত্র পায়খানার মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করলে তা শুদ্ধ হবে না। উযুর পদ্ধতিও সঠিক হতে হবে। এ ক্ষেত্রে 'ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াতের অর্থাৎ "নিয়তানুসারে কর্মের পুরষ্কার" নীতির অন্ধ বাস্তবায়ন হবে না। এটা ইসলামী-নীতি দর্শন।

গীতার মর্মবাণী অনুসারে যাই করা হোক না কেন-ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে। নর হত্যা করা বা ব্যভিচার করা হলেও যদি তা করা হয় ঈশ্বরের সন্তোষ এবং ঈশ্বর প্রাপ্তির লক্ষ্যে, তবে তা বিবেচিত হবে সঙ্গত।

গীতার এরূপ শিক্ষণীয় বিষয়গুলো বিভিন্ন ভাবে ব্যাখা করা হয় বা করা যায়। যে কোন কর্মই হোক না কেন- তার পরিণতিও নির্ভর করবে উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর। গীতাকে একটি ধর্মতত্ত্ব ভিত্তিক উপনিষদ হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

মহাভারতে শ্লোক সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। মহাভারতের বিষয়বস্তু হল যুদ্ধ সংক্রান্ত। যুদ্ধের কার্যকরণ সম্পর্কীয় তত্ত্ব প্রদান, ধর্মীয় আবেগ এবং অনুভূতি প্রকাশ।

এ ধরনের ক্ষুদ্র বৃহৎ অন্যান্য রচনার রচয়িতা হলেন পাশ্চাত্যে হোমার, গেটে, ভার্জিল। এসব রচনার উদ্দেশ্য হল ভক্তিযোগ অর্থাৎ মূল সত্ত্বার সঙ্গে একাত্মতা বোধ। গীতার মধ্যে এক ঈশ্বর তত্ত্ব এবং বহু ঈশ্বর তত্ত্বের মিশ্রণ ঘটেছে।

গীতার দর্শনের মধ্যে হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ প্রথার পরিপূর্ণ সমর্থন রয়েছে। ড. বাবা সাহেব বি.আর. আমবেদকর এর ধারণা হলো, অব্রাহ্মণ এবং অস্পৃশ্য দলিতদের শোষণকে যুক্তিগ্রাহ্য করার উদ্দেশ্যেই ব্রাহ্মণগণ গীতা রচনা করেছেন।

গীতা হল পান্ডুর পুত্র অর্জুন এবং তার বন্ধু ঈশ্বরের অবতার শ্রী কৃষ্ণের মধ্যে আলোচনা ও কথোপকথনের সংকলন। মহাভারতের যুদ্ধে ক্লান্ত অর্জুনের পরামর্শ দাতা, দার্শনিক ও রথচালক ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ।

৫২
ভগবত গীতার মর্ম কথা

গীতাতে আছে ৭,০০০ শ্লোক। এ শ্লোকগুলো ১৮ টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এটা ছিল কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধকালে মহাবীর অর্জুন এবং তার রথ সারথি বিষ্ণুর অবতার শ্রী কৃষ্ণের পারস্পরিক কথোপকথন।

গীতা রচনার উপক্রমণিকা ছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে অন্যতম প্রধান বীর অর্জুন তার পিতৃব্য পুত্রদের বিরুদ্ধে এবং তার বংশীয়দের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে

www.nagorikpathagar.org

অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু তাকে এ দায়িত্ব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণ। বাসুদেবের ঔরসে এবং তার স্ত্রী দেবকী এর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়।

হিন্দু ধর্মে প্রথমত ঈশ্বর কেন্দ্রিক তত্ত্বই প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু বিষ্ণুর অবতার হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং অন্যান্য কারণে বহু ঈশ্বরবাদ নির্ভর হয়ে গেছে হিন্দু ধর্মীয় দর্শন। ব্রহ্মাবৈবর্ত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ হলেন বিষ্ণু নারায়নের স্রষ্টা। সাধারণ ধর্মীয় বিশ্বাস হল শ্রীকৃষ্ণ হলেন বিষ্ণুর অষ্টম অবতার।

আত্মার বাহন

শ্রীকৃষ্ণের মতে আত্মার কোন মৃত্যু নেই। একবার জন্মের পরই আত্মা অমর হয়ে যায়। আমরা যাকে বলি মৃত্যু তা হলো আত্মার বাহন পরিবর্তন। আত্মা কোন বাহনে আছে–তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

মানুষ প্রতিদিনই পোশাক পরিবর্তন করে। এতে বদল করা পোশাকটি পরিত্যক্ত হয়। আত্মা কিরূপ দেহ ধারণ করবে, তা নির্ভর করবে আত্মার উপর। যুদ্ধে মারামারি, হত্যাকান্ড ইত্যাদির প্রয়োজন ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে। ন্যায় ও সত্যের স্বার্থে আত্মার বাহন পরিবর্তন করতে হবে।

দায়িত্ববোধ ও পুরষ্কার

কোন কাজ করতে হবে তা পুরস্কারের জন্য নয় বরং দায়িত্ব বোধের কারণে। দৃষ্টি থাকবে কর্মের প্রতি। কর্মফলের উপর নয়। যা কোন ব্যক্তিকে কর্মবিমুখ করে, তা কোন কারণই নয় (Vhagabat গীতা, পৃ. ৪৭)।

হিন্দু ধর্ম মতে মানুষের জীবন আবর্তিত হয় আধ্যাত্মিক অথবা দার্শনিক চিন্ত াধারা অনুসারে। পরবর্তীতে দার্শনিক চিন্তার ওপরে ভিত্তি করে বৌদ্ধধর্ম এবং জৈনধর্মের বিকাশ ঘটে।

আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব

ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রভুত্ব এবং গুরুত্ব নিয়ে মত পার্থক্য ঘটে। প্রত্যেকেই একে অপরের উপরে উৎকর্ষতা দাবী করেন। এ প্রসঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম এবং শিব ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। এ দু'টি চিন্তা-ধারার মধ্যে মত পার্থক্যের কারণেই পুরাণ গ্রন্থমালা রচিত হয় খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত (ভগবত গীতা, পৃষ্ঠা- ৬০)।

কর্তব্য পালন ও ত্যাগ

শ্রীকৃষ্ণ হলেন ভগবান বিষ্ণুর অষ্টম অবতার। নবম অবতার হলেন গৌতম বুদ্ধ। বাসুদেবের ঔরসে এবং তার পত্নী দেবকী দেবীর গর্ভে বৃন্দাবনে জন্ম গ্রহণ করেন ভগবান বিষ্ণুর অষ্টম অবতার হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ।

www.nagorikpathagar.org

দেবকী নন্দন কৃষ্ণের মতে জ্ঞান এবং কর্মহীনতার মধ্যে মুক্তি নেই। পরিত্রাণ রয়েছে নিঃস্বার্থ কর্তব্য পালন এবং ত্যাগের মধ্যে।

অবাধ যৌনতা

পুরাণ গ্রন্থাবলীতে কৃষ্ণের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সাথেই শ্রীকৃষ্ণ স্বাধীন, অবাধ এবং অনিয়ন্ত্রিত ব্যভিচারী জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেন।

তার যৌনতা থেকে স্বীয় মাতা এবং ভগ্নিগণও অব্যাহতি পায়নি। তাদেরকে বলপূর্বক নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করেন। তিনি তার পিতৃব্যকে হত্যা করে বালিকা রুক্মীকেও হস্তগত করেন। তার স্ত্রী এবং যৌন সঙ্গীদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার এবং সন্তান সংখ্যা তথৈবচ (ভগবত গীতা, পৃ. ৬০)।

নারীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ ছিল চরম এবং পরম। তার স্ত্রী সংখ্যা ছিল ১৬,১০৮ জন। তদুপরি তার লীলা ছিল বৃন্দাবনের এক হাজার দুগ্ধ দোহনকারী ও বিক্রয়কারী গোপিনীর সাথে।

ঈশ্বরের নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন

গোপিনীগণ উলঙ্গ হয়ে নদীতে স্নান করতেন। শ্রীকৃষ্ণ তাদের বস্ত্র হরণ করে বৃক্ষ ডালে আরোহন করতেন। স্নান শেষে বস্ত্রহারা গোপিনী নারীগণ তাদের যৌনাঙ্গ এক হস্তে আবৃত করে আরেক হস্ত শ্রীকৃষ্ণের দিকে তুলে বস্ত্রের জন্য তাদের আবেদন জানাতেন।

দার্শনিক শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদেরকে ধর্মের তত্ত্ববাণী শিক্ষা দিতেন। এ শিক্ষার মর্ম বাণী ছিল ভগবানের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন ভিন্ন ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

অর্ধেক মন ও চিন্তা ভগবানের দিকে এবং আরেক দৃষ্টি নিজের স্বার্থ এবং প্রয়োজনের দিকে থাকলে ঈশ্বরের প্রতি পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতা এবং আত্মসমর্পন হয় না।

গোপিনীগণকে তাদের সামান্য একটি বস্ত্র পেতে হলে এক হাত তুলে বস্ত্র চাইলে হবে না। দু' হাত উপরে তুলে পরিপূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পন করে চাইলেই বস্ত্র পাওয়া যাবে। এ রূপকের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদেরকে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন এর মাধ্যমে ঈশ্বর প্রাপ্তির তত্ত্বকথা শিক্ষা দেন।

ত্যাগের মাধ্যমেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। এই ত্যাগের বাস্তবায়ন হয় কর্মের মাধ্যমে। হত্যা, চৌর্য বৃত্তি, মিথ্যাচার, নেশা, মাদকতা, অনৈতিকতা, ইত্যাদি সব কিছুই প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে এবং সর্বপ্রকার পাপের ক্ষমা পাওয়া যেতে পারে, যদি ঈশ্বরের ক্ষমা এবং সন্তুষ্টি পূজারীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

৫৩

গীতা ও পুরাণে সৃষ্টি প্রক্রিয়া

ভগবত গীতা এবং পুরাণ মতে শ্রীকৃষ্ণ দেবই হিন্দু শাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বপ্রথম পরম আরাধ্য পরাৎপর পরমেশ্বর। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন সমস্ত ভূতই অষ্ট ভূত হতে সৃষ্ট হয়েছে। এ জগতের উৎপত্তি এবং প্রলয়ের একমাত্র কারণ আমিই (ভগবত গীতা, অধ্যায়-৭)।

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেন, যোগীদের মধ্যে যিনি আমাগত চিত্ত হয়ে কেবল আমাকেই আরাধনা করে থাকেন, তিনি সকল সৃষ্টি অপেক্ষা পরম শ্রেষ্ঠ (ভগবত গীতা, অধ্যায়-৬)।

জ্যোতির্ময়তা

"ব্রহ্মাবৈবর্ত পুরাণ" গ্রন্থে সৃষ্টির বিবরণ নিম্নরূপ। শুরুতে পরম ব্রহ্মা ছিলেন নিরাকার এবং জ্যোর্তিময়। সব কিছু ছিল শূন্য– শুধু জ্যোতি ছাড়া। পরম ব্রহ্মার কোন সংসার ছিল না। কোন সৃষ্টি ছিল না। নিরাকার পরম ব্রহ্মা ছিলেন শুধু মাত্র জ্যোতি।

জ্যোতি বা আলো থেকে মহা ব্রহ্মা আকার ধারণ করতে ইচ্ছা করলেন। সৃষ্টির কাজ শুরু হল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তিনটি পুরী বা দেব বাসস্থান নির্মিত হল। এ ৩টি বাসস্থান হল- ১। ব্রহ্মালোক গোলক ধাম ২। বিষ্ণু নিবাস বৈকুণ্ঠ এবং ৩। শিব নিবাস কৈলাস।

ব্রহ্মা পরম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

এরপর প্রথম সৃষ্টি মহা ব্রহ্মা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্র বিরাজিত জ্যোতির মধ্যে নিজের আকার (১ম সৃষ্টি) সৃষ্টি করলেন। তাঁর বর্ণ ছিল সুন্দর, শ্যামবর্ণ। তাঁর নয়ন হল পদ্মের মত। পরম ব্রহ্মার দ্বীপ্তি ছিল কোটি চন্দ্রের আভা সম (গয়ারাম-কৃত ভগবত গীতা; ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, ব্রহ্ম খন্ড)।

তখনো পরমেশ্বর ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের নিবাস গোলক ধামে ছিল। ভয়ঙ্কর অন্ধকার, নির্জন, বাতাস বিহীন। এ ভয়ঙ্কর অন্ধকারে রাত্রি দিন ছিল না। সমুদ্র নেই। সৈকত নেই। শিলা পাথর নেই। তৃণ নেই। শয্যা নেই। বৃক্ষ নেই। শুধু ছিল পরম আত্মা সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ একা।

দ্বিতীয় সৃষ্টি বিষ্ণু নারায়ণ

তখন পরমাত্মা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজ বাসস্থান গোলক ধামে বসে সৃষ্টি কর্ম শুরু করেন। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তার দেহের দক্ষিণ পার্শ্ব থেকে প্রথমেই তিনি আচম্বিতে হঠাৎ করে (২য় সৃষ্টি) বিষ্ণু নারায়ণকে সৃষ্টি করলেন। শ্রীকৃষ্ণের ডান পার্শ্ব থেকে আবির্ভূত হলেন (২য় সৃষ্টি) মহেশ্বর বিষ্ণু নারায়ন।

www.nagorikpathagar.org

বৈষ্ণবেতে বিষ্ণু অগ্রগণ্য। শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় বর্ণ তার। তার বদন (মুখ) পাঁচটি। দেহ দিগম্বর। কপালে ত্রিলোচন। এ পঞ্চমুখো মহেশ্বর বিষ্ণু নারায়ন সৃষ্টি হয়েই পরাৎপর পরমেশ্বর মহা প্রভু শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি শুরু করলেন।

জন্মমাত্রই বিষ্ণু নারায়ণ দেব তিনগুণে (সত্ত্ব, রজ, তম) গুণান্বিত হলেন। তদুপরি ১) শব্দ, ২) স্পর্শ, ৩) রূপ, ৪) রস, এবং ৫) গন্ধ–এ পঞ্চগুণ বা বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হলেন। এরপর নারায়ণ দেব দন্ডায়মান হয়ে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিবাদ শুরু করলেন।

কৃষ্ণ স্তুতিবাদ

স্তুতিবাদের ভাষা নিম্নরূপঃ হে প্রভু জনার্দন ! তোমার প্রশংসা স্তুতি করতে আমাকে নির্ভয় কর। জপতপের মূল তুমিই। তপস্বীর তপ প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতাও তোমার। হে পরমেশ্বর! তুমি ঘন শ্যাম বর্ণ আত্মা, নিষ্কাম। বিষ্ণু নারায়ণের স্তুতিবাদে সন্তুষ্ট হয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাকে বসতে আদেশ দিলেন। তিনি হলেন সৃষ্টির মধ্যে দ্বিতীয়।

তৃতীয় সৃষ্টি পরমেশ্বর ব্রহ্মা

অতপর সর্বশ্রেষ্ঠ পরাৎপর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নাভিপদ্ম হতে তৃতীয়ত আবির্ভূত হলেন (৩য় সৃষ্টি) পরমেশ্বর ব্রহ্মা। তার তেজপূর্ণ হস্তে ছিল কমনডুলু জল পাত্র। ব্রহ্মা থেকে সৃষ্ট হল ব্রহ্মান্ড (গয়ারামকৃত ভাগবত গীতার অনুবাদ, পৃঃ-৯)। পরম ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু নারায়নের পর মহেশ্বর শিব এর সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। অন্য বর্ণনায় তাই রয়েছে।

ব্রহ্মান্ড

ওপরে উল্লেখিত সৃষ্টি সংক্রান্ত বর্ণনা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের। চর্তুমুখ ব্রহ্মান্ড ব্রহ্মা সৃষ্টিমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার স্তবস্তুতি শুরু করেন। ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা (৩য় সৃষ্টি) ব্রহ্মান্ডকে সিংহাসনে বসতে আদেশ করলেন।

উপরোক্ত সৃষ্টি প্রক্রয়ার মহেশ্বর শিব এর সৃষ্টি সম্বন্ধে শাস্ত্র নীরব। অথচ হিন্দু শাস্ত্রে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু নারায়ন অপেক্ষা মহেশ্বর শিবের গুরুত্ব অধিকতর অনুভূত হয়।

চতুর্থ সৃষ্টি ধর্মদেব

এরপর পরাৎপর সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর (৪র্থ সৃষ্টি) শ্রীকৃষ্ণ বক্ষ থেকে চতুর্থ সৃষ্ট হল ধর্মদেব। তার বর্ণ শুক্ল, শিরে জটা। হৃদয় ধর্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ। ধর্মদেব যথাশক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্তবগীতি তপজপ করলেন। অতপর ধর্ম দেব সিংহাসনে বসতে আদিষ্ট হলেন।

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম সৃষ্টি সরস্বতী

ধর্মদেবের দেহ হতে আর্বিভূত হলেন এক মূর্তিমতি যুবতী (৫ম সৃষ্টি)। তিনি হবেন ধর্মদেবের সহধর্মিণী এবং পঞ্চম সৃষ্টি। তাঁর বর্ণ শুক্ল। হস্তে বীণা ও পুস্তক।

অন্য বর্ণনায় আছে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখাগ্র থেকে সৃষ্টি হয় এক কন্যা। শ্রীকৃষ্ণ মাধব কন্যার নাম দিলেন সরস্বতী। বদন পঙ্কজরূপ। নয়ন কুরঙ্গ রূপা। অঙ্গ অলংকার শোভিত। তার স্বরে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিনী। জন্ম মাত্রই সরস্বতী কৃষ্ণ স্তব শুরু করলেন।

তিনি শ্রীকৃষ্ণকে রাধানাথ এবং রামেশ্বর রূপে সম্বোধন করলেন। জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ সরস্বতির স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে সিংহাসনে উপবেশনের নির্দেশ দিলেন।

ষষ্ঠ সৃষ্টি লক্ষ্মী দেবী

এরপর পরৎপর পরমেশ্বর (৬ষ্ট সৃষ্টি) কৃষ্ণ দেহ হতে জন্ম গ্রহণ করে এক কন্যা। পরমা সুন্দরী রূপে-গুণে ধন্যা। তার মুখের আভা পূর্ণ চন্দ্ররূপ, পঞ্চক, দীপ্তিমান। দেহে পীত পরিধান। পংকজ লোচন নবীনা যৌবনা। বর্ণে তপ্ত স্বর্ণ আভা। অঙ্গে শোভা পায় রত্ন অলংকার। এ ঐশ্বর্য্য রূপিনী অধিষ্ঠাত্রী হলেন লক্ষী দেবী। জন্মমাত্রই শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করে সিংহাসনে বসতে আদিষ্ট হলেন।

সপ্তম সৃষ্টি দেবীদুর্গা

এরপর শ্রীকৃষ্ণ দেহ থেকে আবির্ভূত হলেন (৭ম সৃষ্টি) ত্রিগুণযুক্তা অধিষ্ঠাত্রী দুর্গা। বর্ণে তপ্ত-কাঞ্চনা। দেহে তার কোটি সূর্য আভা। প্রকৃতিতে শিবের মনোলোভা। আর্বিভাব মাত্রই দুর্গা দেবী স্তুতি স্তবের পর সিংহাসনে বসতে আদিষ্ট হলেন।

অষ্টম সৃষ্টি সাবিত্রী

অতপর শ্রীকৃষ্ণ মুখাগ্রহ থেকে আবির্ভূত হলেন (৮ম সৃষ্টি) পরমা সুন্দরী সাবিত্রী। অংগে তার অলঙ্কার। দেহের বর্ণ শুক্ল স্ফটিকের। কৃষ্ণ স্তবের পর দেবী সাবিত্রী পরম স্রষ্টা কৃষ্ণ কর্তৃক সিংহাসনে বসতে আদিষ্ট হলেন।

নবম সৃষ্টি মদন দেব

এরপর কৃষ্ণ মানস থেকে সৃষ্টি হলেন (৯ম সৃষ্টি) সমগ্র সৃষ্টির অন্যতম করণ কারণ কর্তা মদন। তার শুধাংশ আনন তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ।

দশম সৃষ্টি রতিদেবী

স্বীয় সৃষ্টির পরে মদনদেব সকলের মনে কাম শর নিক্ষেপ করেন। তাই তার নাম হলো মন্মথ। কামের বশেতে সৃষ্টি হল (১০ম সৃষ্টি) গুণবতী এক সতী, রূপবতী যুবতী রতিদেবী। তার পরম সুন্দর অঙ্গে দৃষ্টি মাত্র সকলেই হলেন আনন্দিত ও মোহিত।

www.nagorikpathagar.org

কামদেব ও রতিদেবী যৌথভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্তব স্তুতি করলেন এবং সিংহাসনে উপবিষ্ট হতে আদিষ্ট হলেন। এরপর কামদেব এবং রতিদেবী তাদের স্ব-মূর্তিতে আত্ম প্রকাশ করলেন।

পঞ্চ কামবাণ

বাসুদেব তাঁর পঞ্চ কাম বাণ- ১। স্তম্ভ, ২। জৃম্ভন, ৩) শোভন, ৪) মারণ, ৫। উম্মাচরণ, ইত্যাদি প্রদর্শন করলেন। এরপর বাসুদেব এ পঞ্চ কামবান্দ দেব সৃষ্টি সম্মেলনে উপস্থিত সকল দেব-দেবীর হৃদয়ে নিক্ষেপ করেন।

দেবগণ কাম মদন শরাঘাতে মোহিত হয়ে কাম উত্তেজনায় সংজ্ঞা হারা হয়ে গেলেন। এ কাম শরাঘাত হতে সৃষ্টিকর্তা পরম ব্রহ্মা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণও বাদ পড়লেন না।

সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় কাম শক্তিতে মহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সর্বশক্তিমান। তাই কামদেবের কামবান এর প্রভাব তার উপরেই সবচেয়ে বেশী। কারণ, তিনি পরম ব্রহ্মা পরমেশ্বর এবং কামের সৃষ্টিকর্তা।

শ্রী কৃষ্ণ কামাহত

কামদেব নিক্ষিপ্ত পঞ্চশর বাণের ফলে আদি স্রষ্টা, সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর অনংগ জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ হয়ে গেলেন কামে অধৈর্য্য। সে সৃষ্টি সভার মধ্যেই তার হল বীর্যপাত। লজ্জায় তিনি স্বীয় বীর্য বস্ত্রে আচ্ছাদন করলেন। কিন্তু তা গোপন রইল না। মহা স্রষ্টা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বীর্যতে সৃষ্টি হল প্রবল কাম অনল।

কামানল

তা থেকে সৃষ্টি হল কোটি গুণ হুতাসন। এ হুতাশনে বা কাম অগ্নিতাপে আদি স্রষ্টা সর্ব প্রথম স্রষ্টা কৃষ্ণ জনার্দন তাপিত হলেন। স্বীয় বীর্য রূপী অনলে তার বস্ত্র দগ্ধ হয়ে গেল।

জল ও জীবকোষ

বীর্যরূপ অগ্নিতাপে তপ্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ দেব বীর্য অগ্নি নিবারনার্থে স্বীয় মুখামৃত দ্বারা জল সৃষ্টি করলেন। জলেতে কৃষ্ণ বীর্য মিশ্রিত হওয়ার ফলে জল থেকে সৃষ্ট হল– সর্ব জীবকোষ, বীজ, জীব, রূপবতী নারী, তরুলতা, ইত্যাদি।

মহা বিষ্ণুদেব

কোন কোন বর্ণনায় দেব সভা মঞ্চে শ্রীকৃষ্ণ যে বীর্যপাত করেন– তা হতে সহস্র বছর পরে (ঐ বীর্য হতে) মহা বিষ্ণুদেবের জন্ম হয়।

www.nagorikpathagar.org

ব্রহ্মান্ড

শাস্ত্রীয় মতে কাম দেব নিক্ষিপ্ত কাম শরে কৃষ্ণ বীর্যপাত হয়। লজ্জাবশতঃ সে বীর্য শ্রীকৃষ্ণ জলেতে ফেলে দেন। সহস্র বছরে কৃষ্ণ বীর্য ডিম্বাকার হয় এবং এ ডিম্ব ব্রহ্মান্ড নামে খ্যাত হয়। এ ব্রহ্মান্ড থেকে মহা বিষ্ণুর জন্ম হয়।

বিভিন্ন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে আদি সৃষ্টি সংক্রান্ত বর্ণনায় পার্থক্য থাকলেও বিষয় বস্তু এবং ঘটনায় সমন্বয় সুস্পষ্ট।

গোলক ধাম

ব্রহ্মালোক গোলকধামে কৃষ্ণদেব শ্রীকৃষ্ণের জন্য নানাবিধ সুগন্ধী পুষ্পোদ্যান, বহু মণিমুক্তাখচিত রত্নময় মনোরম হর্মমন্ডল প্রস্তুত হয়। শ্রীকৃষ্ণদেব তথায় বাস করতে লাগলেন।

রাধিকা দেবী

গোলকধামে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাম পার্শ্ব হতে সর্বগুণের আধার অপরূপ সুন্দরী যুবতী আর্বিভূত হলেন। অন্যান্য সৃষ্টি তাকে পূজার দ্রব্য অর্পন করতে লাগলেন। কৃষ্ণ পিয়াসী রাধিকাদেবী চিত্ত সন্তোষে সকলের পূজার অর্ঘ কৃষ্ণপদে সমর্পন করেন।

কৃষ্ণ প্রাণাধিকা পরম রূপসী প্রেয়সী শ্রীরাধিকা ছিলেন ষোড়ষী, নবীনা, গোপঙ্গা, গোপাঙ্গনা সুস্থির যৌবনা। তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণে তার অংগে ছিল সুকোমল। পীন শ্রেণী পয়ধর ছিল দাড়িম্ব-যুগল। ঐ সময় শ্রী রাধিকার লোমকুপা হতে আকস্মাৎ লক্ষ কোটি গোপাংগানার জন্ম হয়। শ্রীকৃষ্ণের লোমকুপ থেকে জন্ম হয় লক্ষ কোটি গোপগণের।

ব্রহ্ম পুরাণ

বিশ্ব সৃষ্টি সংক্রান্ত উপরোক্ত বর্ণনা ভগবত গীতা থেকে এবং ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ এর ব্রহ্মা খন্ড হতে অনুবাদক গয়ারাম বর্ণিত। ব্রহ্মা পুরানের প্রকৃতি খন্ডে বিশ্ব সৃষ্টি সংক্রান্ত বর্ণনায় বেশ কিছু গড়মিল আছে। তবে মূল ধারায় আছে সমন্বয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতি খন্ডে উল্লেখ আছে, যে পরম ব্রহ্মা পরমেশ্বর যখন সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন তখন পরমেশ্বর স্বয়ং পুরুষ এবং প্রকৃতি (কৃষ্ণ ও রাধা)– এ দুটি অংশে বিভক্ত হলেন।

পুরুষ এবং প্রকৃতি

ব্রহ্মবৈবর্ত পূরাণে বর্ণিত আছে সৃষ্টির শুরুতে শ্রীকৃষ্ণ নিজ আত্মাকে পুরুষ ও প্রকৃতি (কৃষ্ণ ও রাধা) এ দুটি অংশে বিভক্ত করলেন। বাম অংগেতে হল রাধিকা রূপবতী। ডান অংগে রহিলেন স্বয়ং কৃষ্ণ। পরমা সুন্দরী রাধা নিতম্ব যুগল চন্দ্রাকার। উরুদ্বয়ের সৌন্দর্য কদলি স্তম্ভকে হার মানায়। স্তনযুগল ছিল শ্রীফল

www.nagorikpathagar.org

আভায় মনোহর। ক্ষীণ বক্রচক্ষু রত্ন ভূষিত। রাধার মুখায়বয়বে দেবী চন্দ্রিমা উদিত।

কৃষ্ণ রাধা রতি শৃংগার

রাধিকা সুন্দরীর সৌন্দর্যে মোহিত সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব প্রথম পরাৎপর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নানাভাবে রতি শৃংগার করেন রাধিকার সাথে বহুকাল। বিরামহীন রতি কর্মে ছিল নিশ্বাস ঘন। অংগে বয়ে যায় ঘর্ম। কৃষ্ণের সে দেহ নি:সৃত ঘর্ম থেকেই হয়েছে ভূ-মন্ডল বেষ্টিত বায়ু, সলীল ও বৃষ্টি।

কৃষ্ণ রাধিকার সুদীর্ঘকাল ব্যাপী সংগমের পর রাধিকদেবী গর্ভধারণ করে একটি ডিম্ব প্রসব করেন। এ ডিম্ব দেখে হতাশ হয়ে রাধিকা খেদোক্ত চিত্তে ডিম্ব গোলকটি জলে নিক্ষেপ করেন (ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ, পৃঃ ৮৯)।

কৃষ্ণ রাধিকা সংগাত

রাধিকার গর্ভধারণ হয় শত মন্বন্তর পর। শ্রী রাধিকার প্রসবিত ডিম্বটি রাধিকা কর্তৃক জলে নিক্ষিপ্ত দেখে জনার্দন পরাৎপর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ে হাহাকার উঠে। সক্রোধে রাধিকাকে তিরস্কার করে শ্রীকৃষ্ণ তাকে অভিশাপ দেন। যেন তার ঘরে আর কখনো পুত্র না জন্মে। নারী পুরুষের কল্পনা ও দৃষ্টি ভঙ্গিতে দ্বিমত এবং বৈপরীত্ব সৃষ্টি শুভলগ্ন জাত।

নারীর সীমাবদ্ধতা

আদি পুরুষ মনুর মতে স্ত্রী জাতির কর্মাদি মন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন হয় না। স্মৃতি ও ধর্ম শাস্ত্রে নারীর কোন অধিকার নেই। নারী জাতি নিতান্ত হীন এবং অপদার্থ।

যদিও সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকা শত শত বছর পর্যন্ত সংগমে লিপ্ত ছিলেন, তবে তিনি অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন– কাম, ক্রোধ, লোভ– এ ৩টি নরকের দ্বার স্বরূপ। কিন্তু জীবনসূত্রে বাধা (ভগবত গীতা ১৬. ২১)।

গীতা এবং পুরাণে বর্ণিত সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় মহাদেব শিব এবং সৃষ্টি সম্পর্কে শাস্ত্র নীরব।

www.nagorikpathagar.org

১৭তম অধ্যায়

৫৪

পরমেশ্বর ব্রহ্ম পূজা

ঈশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, প্রভৃতি সত্তার মধ্যে পার্থক্য কি? এরা ছাড়াও আরো ছোট বড় শত শত, লক্ষ লক্ষ, এমন কি ৩৩ কোটি দেব-দেবী আছেন। তাদের মধ্যে সর্ব প্রধান কে ? কোন দিকে কে প্রধান ? তাদের পারস্পরিক শক্তি, ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য এবং তত্ত্ব নেই। সর্বজন স্বীকৃত তত্ত্ব ও তথ্য পাওয়া যায় না।

যারা মুসলিমদের মধ্যে পীর মানেন, তাদের কেউ কেউ আশা করেন যে, একজন পীরকে অবলম্বন হিসেবে ধরতে পারলে তাঁর দোয়ার বরকতে মুক্তি পাওয়া যাবে। দেব-দেবীদের উপর হিন্দুদের অনেকের বিশ্বাস সূফী দরবেশ এবং মুসলিমদের নবী রাসূলদের উপর বিশ্বাস এবং আস্থা থেকেও বেশী।

নবী রাসূলগণ তো ছিলেন হযরত আদম (আঃ)-এর বংশধর। দেব-দেবীদের উৎস আরো গভীর এবং উচ্চ ধর্মীয় স্তরে। শ্রীকৃষ্ণকে তো ব্রহ্মা বিষ্ণুর উপর স্থান দেয়া হয়। অথচ, তিনি ছিলেন মানব বাসুদেব এবং মানবী দেবকীর সন্তান। কোন কোন ভাষ্য মতে শ্রীকৃষ্ণ হলেন বিষ্ণুর অবতার।

দেবতাদের স্তর বিন্যাস এবং অঞ্চল বিন্যাস

হিন্দু মন্দিরে যে দেবতাদের পূজা করা হয়, তাদের সকলের প্রতি ভক্তদের আনুগত্য, তাদের সকলের শক্তি এবং ক্ষমতার পরিমন্ডল একরূপ নয়। তারা সম মর্যাদার নন। কোন দেবতা এবং দেবী সমগ্র দুনিয়ায় বা সকল দেশে সার্বজনীনভাবে পূজনীয় নন। আল্লাহ্‌র ইবাদত সমগ্র পৃথিবীতে একইভাবে করা হয়।

হিন্দুদের মধ্যে একক দেবতা না থাকলেও দেব মন্ডলী আছেন। এ দেব মন্ডলীর কেউ না কেউ একেকটি অঞ্চল বা দেশে বসবাসকারী হিন্দুদের বিশেষ বিশেষ পূজারী বা ভক্ত মন্ডলী কর্তৃক পূজীত হন।

সর্বেশ্বরবাদ পূজা

হিন্দু ধর্মে ৩৩ কোটি দেবতার কথা বলা হয়। কিন্তু, পূজারীগণ তিন চার শত দেবতার নাম অবহিত। ৩৩ কোটি দেবতার মধ্যে কোটি কোটি দেবতা হারিয়ে গেলেও তাঁরা বিস্মৃত হননি। সর্বেশ্বরবাদের (Pantheism) মাধ্যমে দেবতাদের পূজা পুনঃ প্রবর্তিত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

সকল প্রাণী এবং বস্তুর মাধ্যমে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশিত করেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বের বাইরে অন্য কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। সকল প্রাণীর মধ্যে এমনকি কীট-পতঙ্গের মধ্যেও ঈশ্বর আছেন। শুধু প্রাণী জগত নয়, বৃক্ষ লতা-পাতা, তৃণ, প্রস্তর, পাথর, এমন কি ধূলিকণা ইত্যাদির মধ্যেও ঈশ্বর বিরাজ করেন।

সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর

হিন্দুগণ কি আল্লাহু, গড বা ঈশ্বরে অবিশ্বাস করেন ? হিন্দুগণ এক ঈশ্বরবাদী না হতে পারে। কিন্তু, তারাও ভগবানে বিশ্বাস করেন। সর্বেশ্বর বা মহেশ্বর বা সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর কে ? ঈশ্বরদের মধ্যে সকলের উপরে কে ? এ বিষয়ে তাদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে।

হিন্দুগণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। তদুপরি মহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বা পরম ব্রহ্মাতেও তাদের বিশ্বাস আছে। মহা ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বা মহেশ্বর এবং পরম ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ন, প্রমুখের মধ্যে কার স্থান কোথায়? তা নির্ণয়ে বা বর্ণনায় পার্থক্য দেখা যায়।

পরম ব্রহ্মার স্থান

মহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং পরম ব্রহ্মাকে এক এবং অবিচ্ছেদ্য স্বত্ত্বা হিসেবে সর্বোচ্চ স্থান দেয়া হয়। কিন্তু তার থেকে বেশী পূজা করা হয় শিব, বিষ্ণু, দূর্গা, সরস্বতী, কালী প্রভৃতি দেব-দেবীর। পরম ব্রহ্মা সম্বন্ধে বলা হয় যে, তিনি মানুষের কল্পনার অতীত। তার গুণাবলী এবং শক্তি মানুষের বোধের অগম্য। কিন্তু পরম ব্রহ্মা অপেক্ষা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং ভগবানকে বেশী ডাকা হয়। শিব এবং অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা বেশী করা হয়।

কারো কারো মতে মুসলিমগণ আল্লাহু এবং খৃস্টানগণ গড বলতে যাকে বুঝেন তিনিই হলেন হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণ অথবা পরম ব্রহ্মা। খৃস্টানদের মতে যীশু খৃষ্ট মেরীর গর্ভজাত মানুষ। যাকে শুলে চড়ানো যায়। অন্য দিকে তিনি ঈশ্বরের ঔরসজাত পুত্র। কারো কারো মতে তিনি নিজেই ঈশ্বর।

হিন্দুদের মতে পরম ব্রহ্মা এক বাস্তব এবং পরম সত্তা। তাকে হিন্দুগণ স্বীকার করেন। প্রত্যক্ষভাবে পূজা করেন না। যেমন হিন্দুগণ শিব পূজা করেন, বিষ্ণু পূজা করেন এবং অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা করেন। তাদের মধ্যে কৃষ্ণ এবং রাধা পূজার ঐতিহ্যও মযবুত নয়।

৫৫
হিরণ্যগর্ভ

হিন্দু ধর্মের আদি দেবতা বা ঈশ্বরের এক নাম ছিল হিরণ্যগর্ভ। ঋগবেদে বলা হয়েছে–সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন এক মহেশ্বর। তাঁর নাম ছিল হিরণ্য গর্ভ। তিনিই

www.nagorikpathagar.org

ছিলেন সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রভু। তিনি পৃথিবী হতে আলোর জগত পর্যন্ত সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। সব কিছুই তিনি সংরক্ষণ করেন। এ পরিপূর্ণ ত্রুটিহীন ঈশ্বরের নিকট প্রণত হই। অন্য কোন ঈশ্বরকে জানি না।-(ঋগবেদ, মন্ডল-১০, সুক্ত-১২১, ঋক-১)।

যদি এটাই একমাত্র স্রষ্টার ব্যাখ্যা হয়–তাহলে আমাদের মহান প্রভু ইলাহ এর সাথে হিরণ্য-গর্ভ নামক ঈশ্বরের পার্থক্য কোথায়? ইসলামের শিক্ষা হলো– আল্ ইলাহা (The God) বা আল্লাহুর পূর্বে কিছুই ছিল না। একমাত্র এক আল্লাহু ছাড়া। ঋগবেদের কথাও তো তাই।

বৈদিক আর্যগণ তাদের কল্পনা মত স্রষ্টা বা ঈশ্বরের একটি নাম দিয়েছেন। হীরা হল–সবচেয়ে মূল্যবান পাথর। যিনি হীরা বা হিরণ্য গর্ভে ধারণ করেন, তিনি হলেন হিরণ্যগর্ভ। হীরা বলতে এখানে বস্তুগত হীরা বুঝান হয়নি। হীরা সবচেয়ে মূল্যবান পাথর। ঈশ্বর যা গর্ভে ধারন করেন তা হিরণ্য হতেও মূল্যবান। তাই তিনি হিরাগর্ভ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্য গর্ভ এমন এক শক্তিশালী সত্বা যার গর্ভে হিরা বা হিরণ্য রূপ অন্ন আছে।

ইসলাম ধর্মের আল্লাহু চির জীবন্ত। তিনি দিবা-রাত্রি এবং কাল সৃষ্টি করেছেন। তিনি আহার করেন না। তিনি বিশ্রাম করেন না। তিনি কখনো ক্লান্ত হন না।

শিশুরা যদি কোন ঈশ্বরের কল্পনা করে এবং সে ঈশ্বরের যদি ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে, তাকে কী খাওয়ানো হবে ? ঈশ্বরকে সবচেয়ে দামী জিনিসটি খাওয়াতে হবে। খাদ্যের মধ্যে উত্তম হল ফল।

একটি বড় হীরকখন্ড দিয়ে লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন প্রকারের ফল পাওয়া যাবে। এ লক্ষ লক্ষ ফল খেতে ঈশ্বরের সময় লাগতে পারে। তাঁর থেকে বিশ্বের বৃহত্তম হীরকটি ঈশ্বরের উদরে দিয়ে দিলে ক্ষতি কি?

তিনি তাঁর যা ইচ্ছা তাই হীরকের মূল্য দিয়ে কিনে খেয়ে নিতে পারবেন। যে স্রষ্টা বা ঈশ্বর হীরক আহার করেন তাঁকে হিরণ্যভোজী বা হিরণ্যগর্ভ নাম দিলে দোষটা কি? এমন ব্যাখ্যা হয়ত করা যায়।

নাসাদিয়া সুক্তে পরমেশ্বর

ঋগবেদে নাসাদিয়া সুক্তের অনুবাদ করেছেন–স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। এ নাসাদিয়া সুক্তটির অর্থ দাঁড়ায় নিম্নরূপ। এ বস্তু জগত বা বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে কিছুই ছিল না। এমনকি আকাশও ছিল না। শুধুমাত্র ছিলেন ঈশ্বর। তিনি ছিলেন পরম স্রষ্টা এবং সৃষ্টির কারণ।

www.nagorikpathagar.org

ঐ কালে স্রষ্টার সম্মুখে কিছুই ছিল না। কোন কিছুর কল্পনাও স্রষ্টার মাঝে উদিত হয়নি। এ বিশ্ব প্রকৃতি ছিল না। আকাশ ছিল না। কোন কিছুই ছিল না। এ বিশ্ব সৃষ্টির জন্য কোন গর্ভ ছিল না। নারী ছিল না। বিধাতা ছিল না। শুধুমাত্র ছিলেন পরম ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণ। আর তাঁর ছিল– ইচ্ছা শক্তি।

এ ইচ্ছা শক্তির বলে তিনি যা ইচ্ছা, তাই সৃষ্টি করতে পারতেন। শীতকালে শীতের ঊষা সৃষ্টিতে কোন কুয়াশা ছিল না। নদী ছিল না। প্রবাহ ছিল না। নদীর পানি থেকে বা ভূমি থেকে কুয়াশাও সৃষ্টি হত না।

এত ক্ষুদ্র ছিল সকল সৃষ্টি যে সব কিছু মিলে স্রষ্টাকে আচ্ছাদন করতে বা আড়াল করতে পারত না।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা ও ব্রহ্মান্ড

শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা ছিলেন একক শক্তি। তিনি তাঁর কল্পনা দিয়ে বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি করেন।-(ঋগবেদ, মন্ডল-১০, (নাসাদিয়া) সুক্ত-১২৯, ঋক-১ ও ২)।

ব্রহ্মা থেকে বড় বা গভীর বা সুন্দর বা শ্রেষ্ঠ আর কি হতে পারে! কিছুই হতে পারে না। ব্রহ্মার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুই ব্রহ্মাকে আড়াল করতে পারত না। ব্রহ্মা ছিলেন অসীম এবং সীমাহীন। ঈশ্বর ব্রহ্মার সাথে তুলনা হতে পারে এমন কিছুই ছিল না।-(স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, ঋগবেদ, আদি ভাষ্য ভূমিকা)।

উপরে ব্রহ্মা বা স্রষ্টা সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হল– তা আল্-কুরআনে উল্লেখিত রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ তা'য়ালার বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক কতটুকু ?

আল্-কুরআন নাযিল হয়েছে দেড় হাজার বছর পূর্বে। ঋগবেদ রচিত হয়েছে কত হাজার বছর পূর্বে? তাতে কোন ঐক্যমত নেই। কারো মতে, তিন হাজার বছর পূর্বে। কারো মতে পাঁচ হাজার বছরেরও বেশী পূর্বে। কারো কারো মতে দশ হাজার পূর্বে।

আরো বড় সমস্যা হল– কুরআনের আয়াত যেভাবে নাযিল হওয়ার সাথে সাথে লেখা হয়েছে– বৈদিক শ্লোকগুলো সেভাবে লেখা হয়নি। পরবর্তীতে ঋষিগণ নিজস্ব কল্পনার আলোকে বেদ মন্ত্র পুনঃ পুনঃ রচনা করেছেন।

সর্বশ্রোতা বরুণদেব

ঋগবেদের একজন দেবতা হলেন– বরুণ দেব। অথর্ববেদে একটি শ্লোকে বরুণ দেবের একটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে– যখন দুই ব্যক্তি চুপি চুপি কথা বলে, তৃতীয় একজন তা শুনেন। তিনি হলেন– ঈশ্বর দেব বরুণ।-(রাহুল সংকৃর্ত্তায়ন, Perspectives of the World, page-551).

সর্বশ্রোতা আল্লাহ্ তা'য়ালা সম্বন্ধে আল্-কুরআনে কি বলা হয়েছে? আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, আল্লাহ্ তা জানেন। তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন

www.nagorikpathagar.org

কোন গোপন পরামর্শ হয় না। যাতে চতুর্থ জন হিসাবে তিনি (আল্লাহ্) উপস্থিত থাকেন না। পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও কথা হয় না– যাতে ষষ্টজন হিসাবে তিনি (আল্লাহ্) উপস্থিত থাকেন না।-(আল্-কুরআন, সূরা মুজাদালা ৫৮, আয়াত-৭)।

মূল বেদে একেশ্বরবাদের দর্শনই বিদ্যমান আছে। যারা এ দর্শনের ব্যাখ্যা করেছেন, তারা একেশ্বরবাদের মধ্যে বহু ঈশ্বরবাদ প্রবেশ করিয়েছেন। নিরাকার ব্রহ্মা বা ঈশ্বরের পূজার স্থলে মূর্তি পূজার প্রবর্তন করেছেন। মূল বৈদিক ধর্মের সাথে ইসলাম ধর্মে রয়েছে যথেষ্ট মিল এবং সাদৃশ্য।

৫৬
বিষ্ণু নারায়ণ পূজা

শ্রী ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা কেন্দ্রিক বিভিন্ন উৎসব পালন করা হয়। দু'টি উৎসব পালন করা হয় সূর্য দেবতাকে উপলক্ষ্য করে। সূর্য পূর্ব দিকে উঠে। পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। শীতকালে সূর্য আকাশের উত্তর দিকে হেলান দিয়ে উদিত হয় এবং অস্ত যায়। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণে হেলান দিয়ে উদিত হয়। যখন সূর্য ক্রমশ উত্তর দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন এ অগ্রসরমানতাকে বলা হয় উত্তরায়ন।

যখন সূর্য দক্ষিণ দিকে হেলান দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে তখন তাকে বলা হয় দক্ষিণায়ন। সূর্যের এ উত্তর দক্ষিণে সরে যাওয়াকে বলা হয় আয়ন। উত্তর দিকে সরে যাওয়াকে বলা হয় উত্তরায়ন এবং দক্ষিণ দিকে সরে যাওয়াকে বলা হয় দক্ষিণায়ন।

দোলযাত্রা ও ঝুলনযাত্রা পূজা

সূর্যের গতিপথ পরিবর্তনের ফলে শীত, গ্রীষ্ম, শরত, বসন্ত, ইত্যাদি ঋতুর পরিবর্তন হয়। সূর্যের এ উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ন অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে এবং উত্তর দিকে গমনের গতিপথ অবলম্বন করে দোলযাত্রা এবং ঝুলনযাত্রা উৎসব ও পূজা উদযাপন করা হয়।

দোলযাত্রা উৎসবে শ্রীবিষ্ণু এবং লক্ষ্মীকে ত্রিধাপ বা তিন সিঁড়ি উচ্চতায় ঝুলন্ত মঞ্চেও স্থাপন করা হয়। এ মঞ্চকেও দোলমঞ্চ বা বেদী বলা হয়।

বিষ্ণু ও লক্ষী পূজা

শ্রীবিষ্ণু ও লক্ষ্মীকে দোলযাত্রা এবং ঝুলন যাত্রা উপলক্ষে ঝুলন্ত আসনে দক্ষিণমুখ করে বসিয়ে উত্তর-দক্ষিণে দোলানো হয়। দেবীকে মন্দির থেকে বের করে এনে দোলনমঞ্চ বা দোলনায় আরোহন করানো হয়।

www.nagorikpathagar.org

ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথীতে উৎসব করে দেবী লক্ষ্মী ও শ্রীকৃষ্ণকে আবির দিয়ে রঙ্গীন করা হয়। ফাল্গুন ও চৈত্র মাস বসন্তকাল। তাই এ রং এর মাধ্যমে বসন্তের রং এরই প্রতিফলন ঘটে থাকে।

ঝুলনযাত্রা

শ্রাবণ মাসের শুক্লা একাদেশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত দেবী লক্ষী ও কৃষ্ণ গোবিন্দকে পূর্ব দিকে মুখ করে দোলনায় স্থাপন করা হয় এবং পূর্ব-পশ্চিম দিকে দোলনাটি দোলানো হয়। যেহেতু দোলনাটি পূর্ব পশ্চিমে ঝুলন্ত অবস্থায় দোলে, তাই এ অনুষ্ঠানকে লক্ষ্মী গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা বলা হয়।

লক্ষ্মী ও গোবিন্দ

দোলযাত্রা এবং ঝুলনযাত্রায় দোলনায় বসেন, দেবী লক্ষী ও কৃষ্ণ গোবিন্দ। যেহেতু সূর্যের গতিপথ বা আয়ন উপলক্ষে এ পূজা বা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়– তাই এর কেন্দ্র হল সূর্য। সূর্য হল বিষ্ণুর প্রতীক।

পূজাকালে ঘট বা ঘটি ব্যবহার করা হয়। ঘট বা ঘটি জলপূর্ণ করে দেব-দেবীকে প্রথমে স্বাগত জানানো হয় এবং পরে পূজা করা হয়। সূর্যের মধ্যে দেব-দেবীর প্রাণ আছে– কল্পনা করা হয়। পূজার মধ্যে ঘট বা ঘটির প্রতীক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষ্ণু পূজায় শালগ্রাম শীলা প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীপূজা

লক্ষ্মী হলেন সৌভাগ্যের দেবী। প্রত্যেক মানুষই তার সুন্দর সৌভাগ্য কামনা করেন। তাই প্রতিটি ধর্মপ্রাণ হিন্দু গৃহে লক্ষ্মী পূজা হয়। সেকালে শিল্প দ্রব্য তত বেশী ছিল না। শস্যই ছিল সম্পদ। পরিমাপের বস্তু। তাই শস্যের সাজি ডালাটিকেই লক্ষ্মীর প্রতীক মনে করে পূজা করা হয়।

বিত্ত সম্পদ ও সৌভাগ্যের দেবী লক্ষ্মীর পিতা হলেন ঋষি বৃগু এবং মাতা হলেন ঋতি। দেবী লক্ষ্মীর বিয়ে হয় পালনকর্তা ঈশ্বর বিষ্ণুর সাথে।

রাম-সীতা পূজা

রামায়ণের মহানায়ক রাম এবং তাঁর স্ত্রী সীতার পূজা সার্বজনীনভাবে হয় উত্তর ভারতে এবং দাক্ষিণাত্যে। কিন্তু বাংলা আসামে রাম এবং সীতার পূজা তেমন হয় না। হনুমান দেবতার পূজা হয় ঐ সমস্ত অঞ্চলে যেখানে রাম এবং সীতার পূজা হয় বেশী। যেমন দাক্ষিণাত্যে এবং উত্তর ভারতে। কিন্তু বাংলায় এবং আসামে বানর দেবতা হনুমানের নাম উচ্চারিত হলে অথবা হনুমান বা বানর দেখা গেলে দর্শনার্থীদের মনে পূজার অনুভূতি হয় না বরং, হনুমান দেবতা হাসির উদ্রেক করে।

www.nagorikpathagar.org

৫৭

তুলসী এবং শালগ্রাম শীলা পূজা

বিশ্ব পালনকর্তা বিষ্ণু নারায়ণ ছিলেন দেবী তুলসীর প্রেমে অন্ধ। দেবী তুলসী হলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমিকা রাধিকা দেবীর বান্ধবী। তুলসী দেবীর বিয়ে হয় শংঙ্খচুর নামক দৈত্য-ঋষীর সাথে। সময় অসময়ে বিষ্ণু অন্তর্নিহিত হয়ে যেতেন। বিষয়টি বিষ্ণুপত্নীর দৃষ্টি এড়ায়নি। এক পর্যায়ে তিনি স্বামী বিষ্ণুর অবৈধ সম্পর্কের বিষয়টি আবিষ্কার করেন। হিন্দুনারীদের দৃষ্টিতে স্বামী হল দেবতাতুল্য। স্বামীর দোষ থাকলেও তা দেখতে নেই।

ভগবান বিষ্ণু দেবী তুলসীর রূপে আকৃষ্ট হন। ভগবান বিষ্ণু শঙ্খচুরের রূপ ধারণ করে শংঙ্খচুর পত্নী দেবী তুলসীর সতীত্ব নষ্ট করেন (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)। দেবরাজ ইন্দ্রের একই রূপ অবৈধ যৌনাত্মাক ঘটনা সতী দেবী অহল্যার সাথেও বটে।

ভগবান বিষ্ণুর এই অবৈধ তুলসী সংগমের বিষয়টি ঘটনাক্রমে তুলসীর স্বামী দৈত্য ঋষি শঙ্খচুড়ও অবহিত হলেন। তুলসীর স্বামী শংখচুড় ছিলেন একজন দৈত্য, ঋষি এবং দেবতা। তিনি ঈশ্বর বিষ্ণুর দোষ ধরলেন না। দোষ ধরলেন অবলা নারী তুলসীর। তিনি তাকে মন ভরে অভিশাপ দিলেন।

ঋষি শংখচুড়ের অভিশাপে তুলসী পরিণত হয়ে গেলেন ক্ষুদ্র একটি গাছে। এই গাছটির নাম হল তুলসীগাছ। এ গাছের পাতা পূজার সময় ব্যবহৃত হয়। ঔষধি পাতা হিসেবেও এটি রোগ নিরামক।

ঋষি শঙ্খচুড় পত্নী তুলসীগাছে পরিণত হওয়ার একাধিক ভাষ্য রয়েছে। ঘটনাটি যে সঠিক এতে কোন বৈদিক ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দ্বিমত নেই।

বিশ্ব পালনকর্তা ঈশ্বর বিষ্ণু তুলসীর স্বামী শঙ্খচুড়ের ছদ্মবেশে তুলসীর সাথে অবৈধ যৌনাচারে মিলিত হলেও তিনি তুলসীকে সত্যিকারে ভালবাসতেন। অপরূপ সুন্দরী দেবী তুলসীগাছে পরিণত হলেও বিষ্ণু নারায়ণ তুলসীর প্রতি আকর্ষণ সম্বরণ করতে পারলেন না।

তৃলসীদেবীর সংসর্গ লোভী হয়ে তিনি তুলসী গাছের কাছেই পড়ে থাকতে চাইলেন। তাই ভগবান বিষ্ণু স্বেচ্ছায় নিজেকে শালগ্রাম শিলায় পরিণত করেন তুলসী গাছের নিকটে পড়ে থেকে জীবনের সার্থকথা খুঁজে পান। অতি গভীর ছিল ঈশ্বরিক প্রেম!

এ উদ্দেশ্যে বিষ্ণু নিজেকে শালগ্রাম নামক একটি শিলায় পরিণত করে, তুলসী গাছের গোড়ায় পড়ে রইলেন। এ কারণে বিষ্ণুর প্রতীক শাল গ্রাম প্রস্তর খন্ডকে তার ভক্ত পূজারীগণ দেবতা সম মনে করেন।

www.nagorikpathagar.org

বিষ্ণু পূজারীরা শালগ্রাম শিলা এবং তুলসী গাছের পূজা করে থাকেন। তাদের নিকট শালগ্রাম শিলা জীবন্ত বিষ্ণুর প্রতিনিধি বা প্রতীক।

মৃত্যু পথ যাত্রীকে তুলসী তলায় নেয়া হয়। তুলসী তলায় মৃত্যু হলে স্বর্গ লাভ সহজ হয়। তুলসী গাছ বট অশ্বত্থ গাছের ন্যায় বৃহৎ বৃক্ষ নয়। তুলসী গাছের উচ্ছতা হয় তিন, চার বা পাঁচ ফুট।

শালগ্রাম শীলাপূজা

ভগবান বিষ্ণু নারায়ণ শঙ্খচুড় মুনী-ঋষি পত্নী তুলসীর সাথে তার স্বামী শঙ্খচুড়ের ছদ্মবেশে ব্যভিচারে লিপ্ত হতেন– ঐ ঘটনাটি চুড়ান্তভাবে প্রমাণিত হওয়ায় দেবী তুলসী অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হন এবং ভগবান বিষ্ণুকে অভিশাপ দেন। এর ফলে ভগবান বিষ্ণু গোলাকার শিলা পাথরে পরিণত হন। এ ব্যভিচারের ঘটনাটি ঘটেছিল শালগ্রাম নামক স্থানে। তাই এ বিষ্ণু পাথরটির নাম হয় শালগ্রাম শীলা।

"ব্রাহ্মবৈবর্ত পুরাণে" উল্লেখিত রয়েছে যে, শঙ্খচুড় পত্নী তুলসী এক পর্যায়ে বিষ্ণুকে তার সতীত্ব হরণের জন্য অভিশাপ দেন। এর ফলেই বিষ্ণু শালগ্রাম শিলা নামক প্রস্তর খন্ডে পরিনত হন। এ শিলা পাওয়া যায় হিমালয় পর্বতের দক্ষিণাংশে গন্ডাকি নদীতে (সুধীরচন্দ্র সরকার, পৌরাণিক অভিধান, পৃঃ ১৯৯, ৫০৪)।

অন্য বর্ণনায় দেখা যায়, বিশ্ব পালনকর্তা বিষ্ণু পাথরে পরিণত হওয়ায় স্বর্গীয় দেবতাগণ তুলসী দেবীর প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। তারা ভগবান বিষ্ণু দর্শনে আসেন। তুলসী দেবী তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দেবতাদের ভয়ে তিনি বৃহৎ বৃক্ষে নয় স্বেচ্ছায় ক্ষুদ্র তুলসী গাছে পরিণত হয়ে যান।

দেবতাগণ তখন বিধান দেন যে, প্রত্যহ শালগ্রাম শীলা পূজা করতে হবে এবং সাথে সাথে তুলসী পূজা করতে হবে। প্রত্যহ শালগ্রাম শীলাপূজার সময় ভগবান বিষ্ণুর প্রেমের সম্মানার্থে তুলসী পাতা শালগ্রাম শিলার বুকে এবং পৃষ্ঠে স্থাপন করতে হবে। যেমনভাবে তারা পরস্পরের বুকের সাথে যুক্ত ছিলেন। তুলসী পাতা সংযুক্ত করা না হলে ভগবান বিষ্ণু পূজা তথা শালগ্রাম শিলাপূজা সিদ্ধ হবে না (দেবী ভগবত, নবম খন্ডম, পৃঃ ৫৯৮)।

শালগ্রাম শিলাটি গোলাকার। এ শিলার বুকে এবং পৃষ্ঠদেশে অর্থাৎ উপরে এবং নিম্নভাগে চন্দনের সাহায্যে তুলসী পাতা সংযুক্ত করা হয়ে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

১৮তম অধ্যায়

৫৮

মহাদেব শিবপূজা

ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব হচ্ছে মহা ঈশ্বরের উচ্চতম স্তরের তিন প্রকার কর্ম ভিত্তিক দায়িত্ব বা রূপ। ঈশ্বর তিনটি বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন। মহাদেব শিব হিন্দুদের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা। সকল মন্দিরে বিশেষ করে শিব মন্দিরে শিবলিঙ্গ পূজা হয়।

নিজস্ব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দেবজগতে চলছে শিবের রাজত্ব। শিবের সাথে অন্যান্য যে দেবদেবীর পূজা আধুনিক কালে হয়, তাদের মধ্যে আছেন বহু দেবদেবী। যেমন, শিবের স্ত্রী পার্বতী, (পুনর্জন্মে) দুর্গা, কালী, ধূমাবতী, শিব-দুর্গার পুত্র কার্তিক এবং দুর্গার পুত্র গণেশ।

তাছাড়া আরো রয়েছেন রামের সাহায্যকারী বানর, হনুমান, স্কন্দ, লকমী, যম, গণপতি এবং অন্যান্য অনেকে। বহু কারণে বিশেষত বিপদাপদ থেকে রক্ষার জন্য দূর্গাপূজা করতে হয়।

শিবপূজা

সমগ্র ভারতে শিবপূজা হয়ে থাকে। তবে, এ পূজায় উৎসাহ এবং ভক্তিমার্গ একই স্তরের নয়। শিবমন্দির সারা ভারতেই আছে। দাক্ষিণাত্যে বিশেষ করে তামিলনাড়ু বা মাদ্রাজে এবং তেলেগু ভাষী অন্ধ্রপ্রদেশে নামের শেষে লিঙ্গ বা লিঙ্গম যোগ করা মুসলিমদের নামের শেষে আল্লাহ্ যোগ করার মত সম্মানজনক গণ্য করা হয়।

আবদুল্লাহ্, রুহুল্লাহ, রহমাতুল্লাহ্, মুজিবুল্লাহ্, আহসানুল্লাহ্, ইত্যাদি নামের শেষে আল্লাহ্ যুক্ত হয়। অনুরূপভাবে দাক্ষিণাত্যে করুণালিঙ্গ, অরুণ লিঙ্গ, প্রতাপলিঙ্গ, কৃষ্ণলিঙ্গ, মাধব লিঙ্গ, ইত্যাদি নাম সম্মানজনক গণ্য করা হয়।

শিবপূজার অন্যতম প্রধান প্রকৃতি হচ্ছে শিবলিঙ্গ পূজা। মন্দিরে শিব লিঙ্গের প্রতীক এবং লিঙ্গের অনুরূপ একটি পাথর খাড়া করে রাখা হয় যা শিবলিঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। এ লিঙ্গটিকে প্রত্যেক দিন কয়েক বার দুধ, জল এবং ভাং দ্বারা স্নান দেয়া হয়। প্রচুর পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য, পুষ্প, চন্দন কাঠ এবং বস্ত্রাদি দেবতার উদ্দেশ্যে মন্দিরে উৎসর্গ করা হয়।

বর্তমানে বহু হিন্দু শিবপূজার পরিবর্তে বেশী করেন শিব যৌন লিঙ্গের পূজা। ঋষি ব্রীগু এর অভিশাপের কারণেই ঈশ্বর শিব এর পূজা না হয়ে, তার লিঙ্গ পূজা হয়। এ তথ্যের উৎস হচ্ছে পদ্ম পুরাণ।

www.nagorikpathagar.org

ভাসন পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈশ্বর শিবের পরিবর্তে তার লিঙ্গ পূজার ঘটনাটি শুধুমাত্র ঋষি বৃগু এর অভিশাপের জন্য নয়, একাধিক ঋষির অভিশাপের কারণেও হয়েছে (W.J. Wilkins, Modern Hinduism, p-280-281, London, 1975).

মন্দিরে ধাতু এবং পাথরের শিবলিঙ্গ স্থাপন করা হয়। নারী পুরুষ সকলেই একই সাথে শিবলিঙ্গের পূজা করে। শিব এবং তার স্ত্রী পার্বতীর যৌনতা দৃশ্যের স্থাপত্য এমনভাবে পাথর এবং ধাতুতে চিত্রিত করা হয় যা মুসলিমদের পক্ষে পুত্র কন্যাসহ যুগপৎ দর্শন বিব্রতকর।

মহাদেব শিবকে ধরা হয় যৌন শক্তিতে সর্বশক্তিমান। তাই শিবলিঙ্গ পূজা নারী পুরুষ সকলের জন্য সার্বজনীনভাবে কাঙ্খিত। তবে বাংলা এবং আসামে শিবলিঙ্গ পূজা এবং শিব পার্বতীর যৌনদৃশ্যও স্থাপত্যে সংযম পরিলক্ষিত হয়।

৫৯
শিবলিঙ্গ পূজা

হিন্দুধর্ম গ্রন্থ পদ্মপুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, মহা মুনি ঋষি বৃগু তিনজন প্রধান দেবতার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ও মহৎ তা নির্ণয়ের ইচ্ছা করেন। তিনি প্রথমে শিব ভবনে আসেন এবং মহাদেব শিবের দরজায় দ্বার রক্ষককে দেখতে পান। দ্বার রক্ষক ঋষি বৃগুকে গৃহে প্রবেশে বাধা দেন। তিনি ঋষি বৃগুকে জানান যে, মহাদেব শিব তার স্ত্রী দেবী পার্বতীর সাথে যৌন কেলীতে লিপ্ত আছেন।

দীর্ঘক্ষণ ঋষি বৃগু শিব ভবনে অপেক্ষা করেন। তিনি ক্লান্ত হয়ে যান এবং তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। ঋষি বৃগু মহাদেব শিবকে অভিশাপ দিয়ে বলেন, হে শংকর! আমার সাথে তুমি অবজ্ঞা এবং অবমাননাসূচক আচরণ করেছ। তোমার কাছে পার্বতীর সাথে যৌনকেলী হল আমার সাক্ষাত অপেক্ষা আকর্ষণীয়। আমি অভিশাপ দিচ্ছি তোমার পূজার পদ্ধতি এবং প্রতীক হবে পুরুষাঙ্গ ও নারী যোনী। তখন থেকে শিব লিঙ্গ এবং পার্বতীর যোনী পূজা শুরু হয় (W.J. Willkins, Hindu Mythology, p- 280-81, 1992, New Delhi)।

শিব-পার্বতী লিঙ্গচ্ছেদ

যৌন বা রতি ক্রিয়ায় শিব হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তার এক স্ত্রীর নাম পার্বতী। একদিন মহাদেব শিব স্বীয় পত্নী পার্বতীর সাথে যৌন ক্রিয়ায় লিপ্ত ছিলেন। মহাদেব শিবের যৌন উত্তেজনা ছিল চরমে। ফলে পার্বতী মরণাপন্ন হন। তিনি প্রাণ রক্ষার জন্য পালনকর্তা ঈশ্বর বিষ্ণুর নাম যপ করেন এবং তার কাছে জীবন রক্ষার প্রার্থনা করেন। ভগবান মহেশ্বর বিষ্ণু তখন স্বীয় সুদর্শন চক্র দ্বারা শিব

www.nagorikpathagar.org

এবং পার্বতী উভয়ের লিঙ্গকে দেহ থেকে কেটে বিচ্ছিন্ন করেন এবং পার্বতীর প্রাণ রক্ষা করেন। (সুন্দর পুরাণ, নাগর খন্ড, ৪৪৪১ পৃ. ১-১৬ শ্লোক)।

বান (উভয়) লিঙ্গপূজা

শ্রী বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র দ্বারা যৌনরতা পার্বতী এবং শিবকে বিচ্ছিন্ন করার সময় মহাদেব শিব এবং পার্বতীর উভয় লিঙ্গ সংযুক্ত ছিল। যে অবস্থায় উভয় লিঙ্গ সংযুক্ত ছিল– ঐ অবস্থায়ই উভয় লিঙ্গ তাদের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ উভয় লিঙ্গের পূজাকে বলা হয় "বানলিঙ্গ" পূজা। বান শব্দের অর্থ উভয়।

মহেশ্বর বিষ্ণু কর্তৃক তার সুদর্শন চক্র দ্বারা শিব এবং পার্বতীর উভয় লিঙ্গ কর্তনের সময় তাঁরা কোন ব্যথা পাননি। কারণ, ভগাবন বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র এমন অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন যে, এ চক্র দ্বারা দেহাংশ কর্তন করা হলে ব্যথানুভূত হয় না এবং যার অঙ্গ কর্তন করা হয়, তার মৃত্যু ঘটে না।

হিন্দু ধর্মমতে মহাদেব শিব এবং দেবী পার্বতীর দেহ বিচ্ছিন্ন এবং পরস্পর সংযুক্ত যৌনাঙ্গের "বান লিঙ্গ" অর্থাৎ উভয় লিঙ্গ পূজা অত্যন্ত উন্নত মানের পূজা।

যৌনলিঙ্গ পূজা

যৌনদেব শিবের প্রতীক হল লিঙ্গ বা যৌনলিঙ্গ। যে কোন শিব মন্দির বা মন্ডপে পুরুষ লিঙ্গাকৃতির একটি কাল পাথর তৈরী করে শিবের উদ্দেশ্য স্থাপন এবং উৎসর্গ করা হয়। অতপর এ যৌন অঙ্গরূপী লিঙ্গকে পূজা করা হয়। কোন কোন মন্দিরে যৌথ পূজা হয় দৈনিক **পাঁচ বার**।

এ যৌনঙ্গের প্রতীক পাথর খন্ডকে প্রতিদিন দুগ্ধ, জল এবং ভাং দিয়ে স্নান করানো হয়। বহু ধরনের খাদ্য দ্রব্য শিব লিঙ্গ রূপী দেবতার ভোজের জন্য অর্পন করা হয়। চন্দন সুবাসিত কাষ্ঠ চূর্ণ, পুষ্প এবং বস্ত্র শিবলিঙ্গকে উপহার দেয়া হয়।

মন্দিরের মধ্যে দেবতা শিবের মূর্তি স্থাপন করা হয়। কিন্তু পূজা করা হয় শিবলিঙ্গের। এ শিবলিঙ্গ অধিকাংশ মন্দিরেই যোনি বা নারী অঙ্গের মধ্যে স্থাপন করা হয়। নারী অঙ্গটি লিঙ্গের ভিত্তি বা নিম্নদেশ হিসাবে কাজ করে– যার উপরে শিবলিঙ্গটি উপস্থাপন করা হয় । যারা শিব লিঙ্গের পটভুমিকা অবহিত থাকেন– তাদের পক্ষে শিব লিঙ্গের পূজা কালে বিরূপ ধারণা না করাটাই স্বাভাবিক (W. J. Willkins, Hindu Mythology, p- 280, 1993, New Delhi).

বানলিঙ্গ বা উভয়লিঙ্গ তৈরীর ক্ষেত্রে শুধু শিব লিঙ্গ নয়, যোনীও তৈরী করতে হয় এবং সেখানে যথাযথভাবে যোনীতে শিবলিঙ্গ বসাতে হয়। অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে লিঙ্গ এবং যোনীলিঙ্গ, ইত্যাদি তৈরী করতে হয়। তবে বিধবাদের মাধ্যমে এ কাজটি না করানই ভাল। কিন্তু তা করানো হলে তাদের অধিকতর পূণ্য লাভ হয়।

www.nagorikpathagar.org

মহিলারা সাধারণত নদী তীরে অথবা পুকুরে স্নানের সময়ও শিব লিঙ্গ পূজা করে থাকেন। তারা ঐ সময় কাঁদা মাটি দিয়ে শিব লিঙ্গ তৈরী করেন এবং লিঙ্গের দিকে মাথা নত করে ভক্তি অর্ঘ প্রদান করেন। যারা মন্ত্র পাঠ জানেন না, তারা লিঙ্গ তৈরী এবং প্রণামের মধ্যেই পূজা সীমিত রাখেন।

শিবলিঙ্গ সাধারণত হয়ে থাকে পাথরের। শিব লিঙ্গ পূজা অথবা বান লিঙ্গ পূজা শুধু ঠাকুরের মাধ্যমেই করালে চলে না, নিজেদেরকেও স্বীয় আত্মার মুক্তির জন্য এ পূজা করতে হয়।

মাটির শিবলিঙ্গ

পাথরের শিব লিঙ্গ বহন করা অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক। তাই মাটি দিয়ে শিবলিঙ্গ তৈরী করতে হয়। এ লিঙ্গ মন্দিরের বৃহৎ শিবলিঙ্গের আকারের না হলেও চলে। সর্ব নিম্ন শিবলিঙ্গ হতে হয় এক অংগুষ্ঠ বা বৃদ্ধাঙ্গুলের সমান।

গৃহে শিবলিঙ্গ তৈরী করেন মহিলাগণ। বিশেষ করে বিধবাগণ। শিব লিঙ্গ তৈরীর সময় দেবতার লিঙ্গ এর প্রতি মনোনিবেশ করতে হয়।

দেবলীলা

সাধারণ মানুষ অবৈধ যৌন ক্রিয়ায় লিপ্ত হলে তা পাপ বলে গণ্য হয়। কিন্তু দেবতাদের স্ত্রী বহির্ভূত যৌনকর্মও গণ্য হয় পবিত্র লীলা এবং তা দেবলীলা হিসাবে নন্দিত। এ দেবলীলা খেলায় যারা যত পারদর্শী, তারা তত বড় দেবতা হিসাবে গণ্য হন।

৬০
দূর্গা-কার্তিক পূজা

হিন্দুগণ তাঁদের উদ্দেশ্য এবং উপলক্ষ অনুসারে দেবতা নির্বাচন এবং পূজা করে থাকেন। যে উদ্দেশ্য সাধনে যে দেবতা অধিকতর প্রশংসনীয়, ঐ দেবতার পূজা করা হয়। কিন্তু ভীতি থাকে যে, অন্য দেবতা হয়ত অসন্তুষ্ট হতে পারেন।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পিতা এক দেবতাকে পূজা করেন। মাতা পূজা করেন আর এক দেবতাকে। কোন জন যে অধিকতর খাঁটি দেবতা– তা নির্ণয় করা খুব কঠিন।

সকলকে খাঁটি মনে করে পূজা করাই বিচক্ষণতা। বহু কারণে বিশেষ করে বিপদাপদ থেকে রক্ষার জন্য দেবী দুর্গা পূজা করতে হয়।

মুসলিমদের মধ্যে সার্বজনীন অর্থাৎ সকলের মিলিত জামায়াতের নামায আছে। তা দৈনিক পাঁচবার এবং অন্যান্য উপলক্ষেও। হিন্দুদের মধ্যে এমন কোন সমবেত বা সার্বজনীন দৈনিক পূজা নেই। বাংলায় সার্বজনীন দূর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয় শরৎকালে বছরে একবার। পূজা অবশ্য একাধিক দিন ধরে চলে।

www.nagorikpathagar.org

দূর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বিরাট পূজা মন্ডপ বা প্যান্ডেল তৈরী করা হয়। এ পূজা মঞ্চে বা মন্ডপে কয়েকটি মূর্তি এক সাথে রাখা হয়। এর মধ্যে থাকে দেবী দূর্গার মূর্তি। দেবী দূর্গার একপাশে স্থাপন করা হয়। দূর্গার পুত্র কার্তিক এবং গণেশের মূর্তি। অন্যপাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্তি।

দূর্গাপূজা সকলের এবং সার্বজনীন। এককভাবে কারো পক্ষে দূর্গা পূজার অনুষ্ঠান করা অর্থাৎ ব্যয়ভার বহন করা কঠিন। তাই যৌথভাবে এ পূজার ব্যবস্থা করতে হয়। অতীতে জমিদারগণ, বর্তমানে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণ এককভাবে দূর্গাপূজার অনুষ্ঠান করতে পারেন।

দূর্গাপূজা একাধিক দিনব্যাপী চলে। পূজা চলাকালে নাচ, গান, বাদ্য, বাজনার ব্যবস্থা হয়। দেবীর কল্যাণে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হয়। দূর্গাপূজা চলাকালে যন্ত্র সঙ্গীত উচ্চকণ্ঠেও শব্দে গীত হয়। কর্তাল, ঢোল, বেল বাজানো হয়।

মুসলিম আরাধনায় কোন গান, বাজনা নেই। কথাবার্তা অত্যন্ত নিম্ন স্বরে বলতে হয়। যাতে কোন প্রার্থনাকারীর মনযোগ কোন দিকে ব্যাহত না হয়। হিন্দুদের মধ্যে যে পূজা একক ভাবে করা হয়– ঐ পূজার মধ্যে ধ্যান বা মেডিটেশন আছে।

ধ্যানের জন্য নীরব স্থান দরকার হয়। তাই হিন্দু মুনি ঋষিদেরকে পাহাড়, পর্বতে এবং বনে জঙ্গলে ধ্যানের জন্য চলে যেতে হয়। তারা বনের ফল মূল খেয়ে জীবন ধারণ করেন।

বনে বসবাসকালে হিন্দু ঋষি সাধকগণ সাধারণত সিদ্ধ খাবার খান না। এ ধ্যান চলে শুধু দিনের পর দিন নয়, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। বনে জঙ্গলে মুনি, ঋষিদের ধ্যান ছাড়া মানব সমাজে পূজায় মন্ত্র যেমন আছে, গীত বাদ্যও তেমন আছে। এ বাদ্যযন্ত্র শুধু যে পূজার সময় ব্যবহৃত হয় তা নয়, মৃত দেহ শ্রাদ্ধ করার সময়ও সঙ্গীত যন্ত্রের ব্যবহার হয়।

যাদের পক্ষে অর্থ ব্যয় সম্ভব হয়, তারা মৃত দেহ সমাধি স্থলে ব্যান্ড পার্টি ভাড়া করে নিয়ে যান। অনুষ্ঠানে হিন্দুদের শোক প্রকাশেরও মাধ্যম মুসলিমদের জানাযার প্রসেশনের মত নয়। হিন্দুদের মৃতদেহের শোক যাত্রায় ঢোল, কর্তাল ও সঙ্গীত যন্ত্র বাজানো হয়।

দূর্গাপূজা/শ্যামপূজা

দূর্গাপূজার আর একটি প্রকরণ হল শ্যামপূজা। দুর্গার অপর নাম কালী এবং তারা। মহাবীর রক্ত বিযার সাথে দুর্গার মহা যুদ্ধ ঘটে। রক্ত বীযা ছিল দুর্গার শত্রু পক্ষের সেনাপতি। এ যুদ্ধে বিজয়ের পরই দুর্গা মহানন্দে মহানৃত্য শুরু করেন। তার পদভারে সমগ্র বিশ্ব কম্পমান হয় এবং তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরায় পরিণত হওয়ার অবস্থায় আসে।

www.nagorikpathagar.org

দেবতাগণ তখন সৃষ্টি রক্ষার জন্য মহাদেব শিবকে আহ্বান করেন। মহাদেব শিব স্বীয় স্ত্রী দুর্গাকে শান্ত করতে বিফল হয়ে মৃতদের সাথে দুর্গার পদতলে পড়ে থাকেন। এক পর্যায়ে দূর্গা স্বামী শিবকে তার পায়ের নীচে দেখতে পেয়ে লজ্জিত, হতভম্ব ও শান্ত হয়ে পড়েন।

ক্ষোভ ও লজ্জায় তাঁর জিহ্বাটি মুখের বের হয়ে আসে এবং দুর্গা তা কামড়িয়ে ধরেন। এ কারণে দূর্গার মূর্তিতে তাকে স্বীয় জিহ্বায় কামড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখানো হয়।

মা দূর্গা তাঁর এক হাতে তরবারী ধারণ করেন। অন্য হাতে ধরেন এক দৈত্যের মাথা, এবং অন্য দু'টি হাত দিয়েছেন তার পূজারী এবং আতিথ্য প্রদানকারীদেরকে। দেবী দুর্গার মূর্তিতে দেবীর হস্ত দেখানো হয় দশটি।

দুর্গার কানের অলংকার হিসাবে ছিল দানবদের মাথা। তাঁর কণ্ঠে ছিল মাথার ঠুলির হাড়। কোমরবন্দ ছিল পরাজিত শত্রুদের হাড় দিয়ে তৈরী। তাঁর পরিধানে কোমরবন্দ ছাড়া আর কোন পরিচ্ছদই ছিল না।

মা দূর্গার কেশরাজী কোমর পর্যন্ত বিলম্বিত ছিল। তার নয়ন ছিল ক্রোধে পরিপূর্ণ। দুর্গা তখন ছিলেন রক্তে মাতাল। পূজার প্রকৃতি ছিল দুর্গার প্রকৃতির প্রতিফলন।

কার্তিকপূজা

মহাদেব শিব এবং দূর্গার পুত্র হলেন কার্তিক। কার্তিকের জন্ম কাহিনীও চমকপ্রদ। যৌন সম্রাট মহাদেব শিব একদা স্বীয় পত্নী পার্বতীর সাথে প্রবল রমন ও রতি কর্মে লিপ্ত ছিলেন। শিবের তীব্র যৌনতায় পার্বতীর জীবন সংশয় দেখা দেয়। তবু মহাদেব শিব পার্বতীকে যৌনতা থেকে অব্যাহতি দিচ্ছিলেন না। অগত্যা সেখানে পার্বতীর আহবানে তার প্রাণ রক্ষার জন্য বিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে দেবতাগণের আবির্ভাব হয়।

কার্তিকের জন্ম

সেখানে অকস্মাৎ দেবতাদেরকে দেখে মহাদেব শিব গাত্রোত্থান করেন। ফলে মহাদেব শিবের বীর্যের ফোটা ভুমিতে নিক্ষিপ্ত হয়। পৃথিবী এ শক্তিশালী বীর্য দেহে ধারণে অক্ষম হয়ে তা অগ্নির দিকে নিক্ষেপ করেন। অগ্নি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তা শরবনে নিক্ষেপ করেন।

এ শরবনে জন্ম হয় কার্তিকের। শিশু কার্তিককে প্রতিপালন করেন কৃর্তৃকগণ। কার্তিক প্রতিপালিত হয় কার্তিকগণের কোলে। তাই তার নাম হয় কার্তিক (শিব পুরাণ)।

কার্তিকের জন্ম সম্পর্কে মার্কন্ডেয়, ব্রহ্মী, কৈবর্ত, প্রাণপুরাণ, মহাভারত, ভাগবত, ইত্যাদি গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন রূপ বর্ণনা রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

কার্তিক সৌন্দর্যে এত অনুপম ছিলেন যে, স্বীয় মাতা দুর্গা দেবীও তার পুত্রের আকর্ষণ সম্বরণ করতে পারেননি। কার্তিক ছিলেন সৌন্দর্যের দেবতা। সুন্দর মানুষের তুলনা করা হয় কার্তিকের ন্যায় সুন্দর বলে। কার্তিক এত সুন্দর ছিলেন যে, তার কোন শত্রু ছিল না। শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্ম রক্ষার জন্য কার্তিক পূজা দেয়া হয়।

৬১

মহামায়া ভগবতী দূর্গা

দূর্গা সকল অপশক্তিকে ধ্বংসের দেবী। দূর্গাদেবী দশভূজা অর্থাৎ তার হাত দশটি। দূর্গার এক হাতে থাকে রক্তাক্ত চুরি, অন্য হাতে থাকে একটি কর্তৃত মস্তক মূর্তি। তার গলায় থাকে নরমুন্ডের মালা। দূর্গার পদতলে থাকে সিংহরূপী একটি দৈত্য।

দূর্গাচন্ডী

দেবী চন্ডী হচ্ছে দূর্গার অপর নাম। তাঁর রূপ দূর্গা থেকে ভিন্ন। অসুর রাজ শুম্ভ এর সেনানী ছিলেন চন্ড এবং মুন্ডক। দূর্গা এ দুই অসুরকে হত্যা করেন। অসুর রাজ এর শুম্ভ এর সেনাপতি চন্ড এবং মুন্ডকে হত্যা করে দূর্গাচন্ডী খেতাবপ্রাপ্ত হন।

উগ্রতারা

দেবী উগ্রতারার অপর নাম মাতঙ্গী। মাতঙ্গী ছিলেন মতঙ্গ মুনির স্ত্রী। দেবী উগ্রতারা মতঙ্গ মুনির স্ত্রী মাতঙ্গীর দেহ থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই তার নাম মাতঙ্গী।

দূর্গা কর্তৃক শুম্ভ ও নিশুম্ভ হত্যা

শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দুইজন অসুর ছিলেন দেবতাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। তারা দু'জনে দেবতাদের উপর অত্যাচার শুরু করেন। নির্যাতিত দেবতাগণ আত্মরক্ষার জন্য মতঙ্গ মুনির আশ্রমে সমবেত হন এবং ভগবান শিবের স্ত্রী ভগবতী দুর্গার আরাধনা শুরু করেন।

ভগবতী দুর্গা তখন মতঙ্গ মুনির স্ত্রী মাতঙ্গীর রূপ ধরে পৃথিবীতে আগমন করেন এবং শুম্ভ ও নিশুম্ভ অসুরদ্বয়কে ধ্বংস করেন।

রম্ভা এবং মহীষাসূর

রম্ভ নামক একজন অসুর এর সুযোগ্য পুত্র মহীষাসুর কোন এক পর্বতে অযুত বর্ষকালব্যাপী কঠোর সাধনা ও তপস্যায় রত হন। যে পর্বতে তিনি সাধনা করেন ঐ পর্বত মহীষাসুর পর্বত নামে খ্যাত হয়। তিনি মহিষে আসন প্রিয় ছিলেন। তাই রম্ভা পুত্র মহিষাসুর নামে খ্যাত হন।

www.nagorikpathagar.org

অযুতকাল ব্যাপী সুদীর্ঘ তপস্যা ও সাধনার ফলে অসুর রম্ভাপুত্র মহীষাসুর মহামতি দেবেশ্বর ব্রহ্মার নিকট হতে বর লাভ করেন। এ বরটি ছিল এ যে, কোন পুরুষই "মহীষাসুর"-কে বধ করতে পারবে না। এ বর লাভ করার পর মহীষে আসন প্রিয় এই অসুর দুর্মদ হয়ে উঠেন এবং দেবতাদের স্বর্গরাজ্য দখল করে নেন।

দেবতাগণ অনন্যোপায় হয়ে আশ্রয়ের জন্য মহেশ্বর বিষ্ণু এবং শিবের দারস্থ হোন। সকল দেবতার দেহ নিঃসৃত তেজ থেকে এক দেবী সৃষ্ট হন। এ দেবীই হলেন মহামায়া ভগবতী দুর্গা। এ দুর্গাদেবী শেষ পর্যন্ত মহিষাসুরকে হত্যা করেন।

জঘন্য পূজা

দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হত নতুন চাঁদ উদয়ের মধ্য রজনীতে। তখন তার উদ্দেশ্যে পশু হত্যা করা হত। গভীর রজনীর অন্ধকার, পূজায় নিহত প্রাণীদের রক্তধারা, পূজার বলীতে রক্তাক্ত ছুরি, পুরোহিতদের বিকট চিৎকার, তার জয় জয় ধ্বনির অগ্নি শিখা, মদ্যপায়ী ব্যক্তিদের অঙ্গ ভঙ্গি– সবকিছু নিয়ে শ্যামপূজা ছিল ভারতের সবচেয়ে জঘন্য পূজা (Willkins, W. J., Hindu Mythology, New Delhi. 1992, p. 76-77)।

দূর্গা পূজা

দুর্গাপূজা বর্তমানে সেপ্টেম্বর অক্টোবরের শীতের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজা নয় দিনব্যাপী চলে। বাঙ্গালী হিন্দুদের সবচেয়ে আনন্দ ঘন পূজা হল দুর্গাপূজা। এ পূজা উপলক্ষে দুর্গার বিরাট প্রতিমা মূর্তি তৈরী করা হয়। দশম দিনে দুর্গার মূর্তি আড়ম্বর সহকারে জলে বা নদীতে বিসর্জন দেয়া হয়। বহু কারণে, বিশেষ করে বিপদাপদ থেকে রক্ষার জন্য দূর্গাপূজা করতে হয়। মুসলিমদের আশুরা অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বছর ১০ই মহররম মাসে।

www.nagorikpathagar.org

১৯তম অধ্যায়

৬২

পূজা-পার্বণ

হিন্দু ধর্মে পূজার উদ্দেশ্য হল পূজনীয় দেবদেবীকে সন্তুষ্ট করা। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে পূজা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। পূজার বহু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকে। অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে থাকে হৃদয় বা কলব পরিচ্ছন্নকরণ। নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন। চরিত্রের মধ্যে অপপ্রকৃতি দূরীভূত করণ।

পূজাকালে প্রয়োজন হয় ফুল, চন্দন, ঘট, মূর্তি। ঘট, মূর্তি, ফুল চন্দন এবং অন্যান্য দ্রব্য সম্মুখে রেখে মন্ত্র পাঠ করতে হয়। এ পাঠ বা পূজা দেবতার মূর্তির উদ্দেশ্যে করা হয়।

পূজাকালে মূর্তির উদ্দেশ্যে অর্থ, উপহার, পাদ, ভোগ, নৈবদ্য, বলিদান, ইত্যাদি নিবেদন করে কাঙ্খিত বিষয়ে আবেদন করতে হয় এবং দেব দেবীর সন্তোষ লাভের চেষ্টা করা হয়।

মূল বিষয় হলো মন্ত্র পাঠ। এতদ্‌সংক্রান্ত সকল আনুষ্ঠানিকতাকে পূজা বলা হয়। পূজার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– পুরোহিতের উপস্থিতি ছাড়া পূজা হতে পারে না।

পূজার মন্ত্র এবং শ্লোক

পূজার সময় যে ছন্দবদ্ধ মন্ত্র এবং শ্লোকগুলো পাঠ করা হয়, তা এমনভাবে উচ্চারণ করা হয় যে, যারা সংস্কৃত ভাষা জানেন, তাদের পক্ষেও শব্দগুলোর উচ্চারণ বুঝা অথবা অর্থ অনুধাবন করা কঠিন। না বুঝার প্রধান কারণ হল, পূজাকালে বাদ্য যন্ত্রের প্রচন্ড স্বর এর সুর।

পূজার মধ্যে প্রার্থনার শব্দগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ করা পুরোহিতের কাজ। পূজার মন্ত্রের অর্থ অনুধাবন করা উপস্থিত পূজারীদের প্রয়োজন নয়। পূজারীদের কাজ হল পূজাকালে উপস্থিত থেকে দেবতাকে উপহার, উপঢৌকন দেয়া এবং পুরোহিতের পাওনা আদায় করা।

কুম্বমেলা

উত্তর ভারতের যুক্ত প্রদেশের এলাহাবাদের নিকটে গঙ্গা নদীর বুকে যমুনা এবং সরস্বতী নামে দু'টি পবিত্র নদীর মিলন ঘটে। গঙ্গ, যমুনা ও সরস্বতী- এ ত্রি-নদীর সঙ্গম ধারাটি পবিত্র স্থান হিসাবে চিহ্নিত। এ স্থানে প্রতি বার বছর পর অনুষ্ঠিত হয় এক মাস ব্যাপী কুম্ব মেলা। এখানে পূজা চলা কালে লক্ষ লক্ষ ভক্ত ও পূজারী পবিত্র স্নানের জন্য সমবেত হন।

www.nagorikpathagar.org

হিন্দুধর্ম মতে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গম স্থলে স্নান করতে পারলে সকল পাপ ক্ষমা হয়ে যায়। পূজারীগণ এখানে আসেন অতীত জীবনে সকল পাপ মোচনের জন্য। এখানে পাপ মোচন হয়ে গেলে পুনর্জন্মের মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্তের কোন প্রয়োজন হবে না।

কুম্বমেলার মূল তাৎপর্য হল– এ স্থানে এক বাটি অমৃতের জন্য হিন্দু দেবতা এবং দানবদের মহা সংগ্রাম ঘটে। সংগ্রাম কালে এক ফোটা অমৃত তিন নদীর মিলন স্থলে পতিত হয়।

কুম্ব মেলাকালে ভক্তজনের চিত্তবিনোদনের জন্য নাগ সাপ আনা হয় দূর দূরান্ত থেকে। প্রধান একটি দর্শনীয় বিষয় হল দ্বিগম্বর, বস্ত্রহীন সাধুদের মিলনমেলা। তাদের দেহে থাকে শুধু গোবর পোড়া ছাই এবং জল মিশ্রিত তরল প্রলেপ (Trumbull, Robert, As I See India, London 1957, p- 244, Fazlie, Murtahim B. Jasir, Hinduism and Islam, A Comparative Study Jeddah, 1997, p. 117).

দশরা উৎসব

হিন্দু ধর্ম মতে স্বর্গ থেকে গঙ্গা নদী ধরাধামে নেমে আসেন। পৃথিবীতে গঙ্গা আগমনের স্মৃতি উৎসব হল দশরা উৎসব। এ উৎসব উপলক্ষে গঙ্গা নদীতে কেউ পবিত্র স্নান সম্পন্ন করতে পারলে পূর্ববর্তী দশ জন্ম ও জীবনে যত পাপ করা হয় সব ক্ষমা হয়ে যায়। মুসলিমগণ পবিত্র হন জমজম কুপের পানিতে।

হাজার হাজার পূজারী দশরা উৎসবে তাদের শস্য, ফল ও পূজার দ্রব্য নিয়ে হাজির হন। এ ফল, শস্য নিজেরা ভোগ করেন এবং অন্যদেরকে উপহার দেন। নারী পুরুষ এক সাথে নদীতে স্নান করেন। পুরুষদের পরিধানে থাকে লেংটি এবং মহিলাদের বক্ষ থাকে উন্মুক্ত।

রসযাত্রা

রসযাত্রা হচ্ছে বৃন্দাবনে দুগ্ধ গোপীনিদের সাথে বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা ও যৌনকেলীর স্মৃতি চারণ উৎসব। পূর্ণিমা রজনীর তিন রাত ধরে এ উৎসব চলে। নৃত্য, নাটকের সাথে দেবতাদের যৌনকেলী বর্ণনামূলক সঙ্গীত গীত হয় সারা রাত ধরে। প্রত্যুষে দেব মূর্তি সমূহ মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তী সন্ধ্যায় পুনরায় রসযাত্রা উৎসব শুরু হয়।

হলি উৎসব

হলি পূজা হল বৃন্দাবনে গোপীনিদের সাথে শ্রীকৃষ্ণের কামকেলী সংক্রান্ত স্মৃতিচারণ পূজা। সমগ্র উত্তর ভারতে হলি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজাকালে

www.nagorikpathagar.org

যৌন সঙ্গীত গীত হয় এবং শ্রোতাগণ পথচারীদেরকে লাল রঙে রঞ্জিত করেন। এ সময় নারীদের পক্ষে শালীনতা বজায় রেখে পথ চলাই কষ্টকর হয়।

তান্ত্রিক পূজা

তান্ত্রিক পূজাকালে ৮ যুগল অথবা ৯ যুগল অথবা ১১ জোড়া নারী পুরুষ পূর্ব নির্ধারিত স্থানে ও ব্যবস্থাপনায় মিলিত হয়। মধ্য রাত্রিতে এই পূজা শুরু হয়। এ পূজাকালে একজন সুন্দরী নগ্ন মহিলাকে মঞ্চে উপস্থাপন করা হয়। তার দেহ থাকে অলংকারে সজ্জিত এবং বিবস্ত্র। তাকে ধরা হয় নারী শক্তির প্রতীক।

জোড়ায় জোড়ায় নারী পুরুষ তান্ত্রিক পূজায় লিপ্ত হয়। পূজারীগণ নৃত্য, গীত, মদ্য পান এবং অন্যান্য যৌনকেলীতে অংশ গ্রহণ করেন। এ যৌন কেলীতে কোন সীমাবদ্ধতা থাকে না। যার মন যা চায়–তাই করতে পারেন।

সকল পূজারী পুরুষকে ধারণা করতে হয় তিনি যৌন দেবতা শিব এবং প্রত্যেক নারীকে কল্পনা করতে হয় তার যৌনসঙ্গী পার্বতীরূপে (John Campbell Oman, The Brahmans, Theists and Muslims of India, p- 27, Delhi, 1973).

৬৩
বিভিন্ন প্রকার পূজা

পূজাকালে প্রাসঙ্গিক মন্ত্র পাঠ করা হয়। বিভিন্ন প্রকারের পশু বলী দেয়া হয়। কোন কোন পূজায় মানুষ পর্যন্ত বলি দেয়া হয়। পূজার সময় পূজা মন্ডপে দেবতার ছবি রাখা হয়। গাঁদা, জবা, বকুল ও অন্যান্য ফুল দেয়া হয়। গঙ্গার পানি ছিটানো হয়। এ সমস্ত পদ্ধতিতে দেবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং আনুগত্য ও ভালবাসা প্রকাশ করা হয়।

পূজার সময় গোলাপ ফুল দেয়া হলে তাতে পূজা নষ্ট হয়ে যায়। কারণ এ ফুলটি যবন ফুল নামে খ্যাত। মুসলিম আমলে এ ফুলটি ইরান থেকে ভারতে আমদানি করা হয় এবং অন্যত্র ছড়িয়ে পরে। পূজাকালে ধুপ, ধুনা, আগর, সুগন্ধি কাঠ পোড়ানো হয়। (Chaturvedi, M.D., Hinduism, The Eternal Religion, Bombay, 1992, p- 159).

দেবতাদের পূজা

হিন্দু পরিবারে বিশেষ করে উচ্চপর্যায়ের হিন্দুদের সন্ধ্যা আহ্নিক এবং তর্পন করতে হয়। বিশেষ করে শিবলিঙ্গের পূজা করতে হয়। মাঝে মাঝে শালগ্রাম পূজাও করতে হয়। শালগ্রাম হল বিশেষ ধরনের শিলা বা গোল পাথরের পূজা।

www.nagorikpathagar.org

শিবলিঙ্গের পূজা হল মহাদেব শিব সংক্রান্ত এবং শালগ্রাম শিলা পূজা হল বিশ্ব পালনকর্তা বিষ্ণু সংক্রান্ত। উপাস্য দেবতা হিসাবে ব্রহ্মের পরে তাদের স্থান হওয়ার কথা। তবে বর্তমানে শিব সংক্রান্ত পূজাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

দেবী উষা পূজা

প্রত্যুষ এবং ভোর বেলা দিবসের মধ্যে উত্তম। উষাকালের সৌন্দর্য মোহনীয়। উষা কালের কল্পিত দেবতা হলেন দেবী উষা। উষাকালের মোহনীয়তা এবং সৌন্দর্যের জন্য হিন্দুগণ দেবী উষার পূজা করেন। উষাকালে এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে মুসলিমগণ ফজর নামাজ আদায় করেন।

মনসা পূজা

ভয়-ভীতি প্রেম-ভালবাসা জীবনের অংশ। ভয়-ভীতি সৃষ্টি হয় বিপদ থেকে। আদি মানুষ মনু সন্তানকে ইহজগতে ভয়-ভীতি ও বিপদাপদ থেকে রক্ষার জন্য দেবতাদের পূজা করতে হয়।

প্রাণীকুলের মধ্যে সর্প অত্যন্ত ভয়ংকর এবং বিষাক্ত। নিঃশব্দে আগত সর্পের সামান্য এক ছোবলে মৃত্যু ঘটে। তাই সর্পদেবতার পূজা শুরু হয়। দেবীমনসা হলেন সর্পরাণী। সর্প থেকে নিরাপত্তার জন্য সর্পরাণী মনসার পূজা করা হয়।

সর্প নিজেকে জলাশয়ে নিরাপদ মনে করে। তাই সর্পরাণী মনসার প্রতীক হিসেবে এক পাত্র জল রেখে মনসা পূজা করতে হয়।

গেন্টু পূজা

গেন্টু হলেন খোঁচ-পাঁচড়া, চুলকানী রোগের দেবতা। এ রোগ হয় মেয়েদের বেশী। তারাই গেন্টু পূজায় অধিকতর উৎসাহী হয়। গেন্টু দেবতাদের প্রতীক হল হলুদ এবং লেবুর তরল মলম জাতীয় মিশ্রণ। একটি ভাঙ্গা বা ফাটা পাতিলে এ মিশ্রণ তৈরী করা হয়।

পূজার শেষে পাতিলটি টুকরা টুকরা করা হয়। পাতিলে এ টুকরা টুকরা অংশে লেগে থাকা তরল হালুয়া বা সিন্নি পূজারীদের দেহে লাগানো হয়।

গেন্টুপূজা কলেরা, বসন্ত রোগের দেবী শীতলা এবং কলেরা রোগের দেবী ওলা বিবিরও পূজা করা হয়।

ষষ্ঠি ও স্বাচ্ছন্দ পূজা

হিন্দুগৃহে নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দের প্রতীক হিসেবে কলাগাছ রোপন করা হয়। হিন্দুদের অনুকরণে বিয়ে শাদীতে মুসলিম গৃহে কলাগাছ লাগানো হয়। উদ্দেশ্য– কলাগাছের এক ছড়িতে যে রূপ অসংখ্য কলা হয়, সেরূপ এক স্ত্রীর গর্ভজাত বহু সন্তান পরিবারে আসুক।

www.nagorikpathagar.org

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে কলাগাছকে নারী ও শিশুদের রক্ষা ও নিরাপত্তার দেবী এবং স্বস্তির প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই স্বস্তি পূজাকালে কলাগাছের পূজা করা হয়।

শীতলা দেবী পূজা

কলেরা এবং বসন্ত রোগ থেকে রক্ষার জন্য শীতলা পূজা করতে হয়।

জড়সুর পূজা

জ্বর রোগে আক্রান্ত না হওয়ার জন্য জড়সুর পূজা করতে হয়। বহু কারণে বিশেষ করে বিপদাপদ থেকে রক্ষার জন্য **দুর্গা পূজা** করতে হয়। হিন্দু ধর্মে আরো বহুবিদ পূজা আছে। ধন ধ্যান্যের জন্য করতে হয় **লক্ষ্মীপূজা**। জ্ঞান-বিদ্যার জন্য করতে হয় **সরস্বতীপূজা**। পুত্র লাভের জন্য করতে হয় **ষষ্ঠী পূজা**।

স্বাস্থ্যের জন্য করতে হয় **অশ্বীনি কুমারদ্বয় পূজা**। সিদ্ধি লাভের জন্য করতে হয় **গনেশপূজা**। শত্রু নাশের জন্য করতে হয় কার্তিক মাসে **কার্তিক পূজা**। বৃষ্টির জন্য করতে হয় **বরুণপূজা**।

যক্ষার ভয়ে করতে হয় **রক্ষাকালীর পূজা**। নৌকাডুবির ভয়ে করতে হয় **গঙ্গাপূজা**। ঝড়, বজ্র, বিদ্যুতের ভয়ে করতে হয় **ইন্দ্রের পূজা**।

অমঙ্গলের ভয়ে করতে হয় **শনি পূজা**। দেহে পাঁচড়া ও চুলকানি এবং চর্মরোগ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে করতে হয় **ইটে কুমারের পূজা।**

হিন্দুদের বার মাসে তের পার্বনে আরও বহু পূজা করার বিধান রয়েছে।

৬৪

পূজা পদ্ধতি

হিন্দু ধর্ম একটি। দেব দেবী অসংখ্য। পূজা পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। মুসলিমগণ শুধু মসজিদে নয়, খোলা মাঠেও যদি সালাতের (নামাযের) জামাতে দাঁড়ান– যে কোন হিন্দু বা অমুসলিম লাইন দেখেই বুঝতে পারবে লোকগুলো হয় ঈদের জামাতে অথবা যানাযা জামাতে অথবা অন্য কোন নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়েছেন।

হিন্দু ধর্মে পূজার এমন কোন সর্বজন স্বীকৃত পদ্ধতি নেই। যদিও তাদের সকল পূজা পদ্ধতি আদি মানব মনু প্রদত্ত বিধি "মনু সংহিতা" অনুসারে পরিচালিত হয়। হিন্দুদের মধ্যে মুসলিমদের ন্যায় সারিবদ্ধ বা জামায়াতবদ্ধ আরাধনা নেই। পূজা অনেকটা ব্যক্তিগত।

প্রত্যেক পূজারী দেবতার সামনে মাথা নত করার জন্য এককভাবে বা কয়েকজন মিলে পূজা গৃহ বা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন। তবে দেবতাকে নমস্কার পদ্ধতি ব্যক্তিগত।

www.nagorikpathagar.org

উচ্চ বর্ণের যে কোন হিন্দু মন্দিরে প্রবেশ করে তাঁর দেবতাকে সম্মান প্রদর্শন করতে পারেন। ফুল অর্ঘ নিবেদন করতে পারেন। কিন্তু পূজা করেন পুরোহিত। মুসলিমদের মধ্যে ফরয নামায ঈমামের নেতৃত্বে হয়। তা দুই রাকাত অথবা চার রাকাত। প্রতি রাকাতে সিজদা মাত্র দুটি। হিন্দুদের মধ্যে মুসলিমদের জামায়াতের ন্যায় উপস্থিত সকল হিন্দুর সম্মিলিত পূজা নেই।

দৈনিক পূজা

প্রত্যেক হিন্দুই প্রতিদিন সম্ভব হলে স্নান করতে চেষ্টা করেন। সূর্যের দিকে হাত তুলে প্রার্থনা করেন এবং নতজানু হয়ে সূর্য প্রণাম করেন। যে গৃহে পূজা মন্ডপ বা পূজা মন্দির থাকে, সে গৃহে ফুল, আরতি, প্রদীপ, ধুপ-ধুনা, ইত্যাদি দিয়ে দেবতার মূর্তির পূজা করা হয়।

স্তব-স্তুতি

দিবস ও রজনীর বিভিন্ন সময়ে দেব-দেবীর প্রশংসা-সূচক মন্ত্র পাঠ করাকে স্তব-স্তুতি বলা হয়। সাধারণত স্নানের পরে লক্ষ্মী, কালী, গংগা, প্রভৃতি দেব-দেবীর প্রশংসামূলক মন্ত্র পাঠ করাকে স্তব-স্তুতি বলা হয়।

আচার অনুষ্ঠান

পূজার অন্তর্ভূক্ত আচার অনুষ্ঠান হল (১) সন্ধ্যা, (২) আহ্নিক, (৩) তর্পন, (৪) জপ, (৫) যজ্ঞ (হোমাচার), (৬) হোম, ইত্যাদি।

আহ্নিক

অহ্ন অর্থ কাল। দিবা-রাত্রি কয়েকটি অহ্নে বিভক্ত। বিশেষ করে সূর্যাস্তের যে অহ্ন–সে অহ্নে পূজাকে বলা হয় আহ্নিক পূজা। এটা অনেকটা মুসলিমদের মাগরিবের নামাযের মত।

আহ্নিকের সময় পূজারীকে মূর্তি থাকলে মূর্তির সম্মুখে বসে সন্ধ্যা অহ্নের মন্ত্র পাঠ করতে হয়। মূর্তি না থাকলেও সন্ধ্যা অহ্নে আহ্নিক বা সন্ধ্যা পূজা করা যায়।

আহ্নিক প্রতিদিন প্রত্যুষে এবং বিশেষ করে সন্ধ্যাকালে করতে হয়। নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট বেদ মন্ত্র পাঠ করাকে আহ্নিক বলা হয়। সন্ধ্যাকালে অনুষ্ঠিত হলে দু'টিকে একত্রে বলা হয় সন্ধ্যা-আহ্নিক। মুসলিমদের মাগরিবের নামাজ-অনুষ্ঠিত হয় সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই।

সন্ধ্যা

নিয়মিত সন্ধ্যা, আহ্নিক, তর্পন, ইত্যাদিতে ফুল, চন্দন অথবা ভোগ, নৈবেদ্য প্রয়োজন হয় না। কিন্তু পূজার মধ্যে মূর্তি, ঘট, ফুল, চন্দন, ভোগ, নৈবেদ্য, প্রভৃতি প্রয়োজন হয়।

www.nagorikpathagar.org

তর্পন

মৃত ব্যক্তিদের আত্মার কল্যাণের জন্য বা তৃপ্তির জন্য নির্ধারিত মন্ত্র পাঠ করে তিল, জল এবং অন্যান্য দ্রব্য উৎসর্গ করাকে তর্পন বলা হয়। প্রাতঃকালে অথবা সন্ধ্যার পরে তর্পন করা হয়।

জপ

দিনের যে কোন সময় সুযোগ মত দেবতার নাম স্মরণ এবং উচ্চারণ করাকে জপ বলা হয়। এটা অনেকটা তাসবীহ এবং যিকিরের মত।

হোম

সাধারণত পূজা কালে ধুপ-ধুনা পোড়ানো হয়। পূজার মধ্যে অথবা আরতিতে সুনির্দিষ্ট কিছু কিছু দ্রব্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করাকে হোম বলা হয়ে থাকে। ঝাঁক-জমকের সাথে বৃহৎ আকারে হোমাচারকে বলা হয় যজ্ঞ।

মন্দির

পূজা পার্বণের জন্য বহু মন্দির নির্মিত হয়। এ মন্দিরের আকর্ষণীয় বিষয় হল পুরোহিত এবং দেবতার মূর্তি। যে কোন মন্দিরে দেবতার মূর্তিপূজা করা হয়। মূর্তিপূজার পুরোহিতগণ সাধারণত ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত।

পুরোহিতের ভূমিকা

হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ভূমিকা সর্বোচ্চ স্তরে। পুরোহিতের প্রধান ভূমিকা হল মন্দিরে পূজা করা। বিবাহ, শ্রাদ্ধ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদেরকে নিমন্ত্রণ করা হয়।

অগ্নি হিন্দুদের মধ্যে একজন দেবতা। পূজায় ধুপ ধুনা জ্বালানো হয়। মৃতদেহের সৎকারে চিতায় অগ্নি দেবতার ভূমিকা মুখ্য।

মৃত্যুর পরও প্রাণ মৃত ব্যক্তির গৃহে ও বাড়িতে ঘোরাফেরা করে। তাই মৃতদেহের আত্মার উদ্দেশ্যে খাদ্য ছড়াতে হয়। এ খাদ্য ভোজের অতিথি হল পাখি ও প্রাণী।

মৃত্যুর ৪০ দিন পর হিন্দুদের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রাদ্ধ ব্যবস্থা না হলে মৃত ব্যক্তির আত্মা শান্তি পায় না।

কীর্তণ

হিন্দুদের ধর্মীয় সঙ্গীতকে বলা হয় কীর্তণ। সঙ্গীতের বিষয়বস্তু থাকে ধর্ম সংক্রান্ত এবং পবিত্রতার আমেজ স্নিগ্ধ। কীর্তণ ধর্মীয় আরাধনা বা পূজার একটি বিশেষরূপ। যন্ত্র সঙ্গীতের তালে তালে কীর্তণে অংশ গ্রহণকারীদের নৃত্যও থাকে।

মুসলিমদের মধ্যে ধর্মীয় মারফতী সঙ্গীত হল গযল, কাওয়ালী, মুর্শিদী, ইত্যাদি। মুসলিম ধর্মীয় সঙ্গীতে অতীতে যন্ত্র সঙ্গীত ছিল না। কীর্তণের মধ্যে একতারা এবং ঢোল ব্যবহার হয়। মুসলিম গযলে আজকাল কিছু কিছু মামুলী সঙ্গীত যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। তবে, আরাধনার সময় সঙ্গীত কুরআন হাদীস সঙ্গত নয়। বহু প্রকার সঙ্গীত বিদাত হিসেবে বিবেচিত এবং সালাত বা নামাযের বিকল্প নয়।

www.nagorikpathagar.org

২০তম অধ্যায়

৬৫

বৈদিক দেবতা পূজা

হিন্দু ধর্মে এক ঈশ্বরবাদের সাথে সাথে বহু ঈশ্বর এবং দেবদেবীর অস্তিত্বের স্বীকৃতি আছে। ঈশ্বর এবং দেব-দেবীগণ শুধুই যে স্বর্গে থাকেন তা নয়, তারা পৃথিবীতে আবির্ভূত হন- মানব পিতামাতার সন্তান হিসাবে। যেমন হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাম চন্দ্র।

সর্বেশ্বর বা বহু ঈশ্বরবাদ

শুধু মানুষই যে দেবতার আসন অলংকৃত করে মানব মন্ডলির পূজা পাওয়ার উপযুক্ত হন, তা নয়। বানর, সর্প, ইদুর, মৎস, ইত্যাদি মানব মন্ডলি কর্তৃক পূজিত হন। শুধু বানর, ইদুর, সর্প, মৎস, প্রভৃতি প্রাণী নয়, প্রাণহীন সূর্য, অগ্নি, বায়ু, ইত্যাদিও দেবতারূপে পূজিত হন।

মানব কর্তৃক পূজা পাওয়ার যোগ্য দেব-দেবী একজন, দু'জন, শত শত এবং হাজার হাজার নয়, তারা লক্ষ লক্ষ এবং সর্ব মোট তেত্রিশ কোটি। এদের মধ্যে অনেকেই হিংসা বিদ্বেষ বশতঃ পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হন এবং অনেকেই মানবের মালিকানায় চলে আসেন ও মানব কল্যাণে জীবন দান করেন।

বৈদিক যুগের দেবতা

সময় ও কালের বিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ ও পরিবেশও বদলায়। বৈদিক যুগে যে দেবদেবীর পূজা হত, পরবর্তীতে তা পরিবর্তিত হয়। বৈদিক যুগে ক্ষমতাধর এবং প্রয়োজনীয় দেবদেবীদের মধ্যে ছিলেন ইন্দ্র, রুদ্র, অগ্নি, প্রজাপতি, মিত্র, বরুণ, সবিতা প্রমুখ। তারা এখন রয়েছেন বর্তমানে পূজিত দেবমন্ডলের অন্ত রালে।

মানুষ নিজের থেকে শক্তিশালী ব্যক্তির বা সত্ত্বার উপাসনা করে। তাঁর কাছ থেকে সাহায্য চায়। সভ্যতার শুরুতে মানব প্রজাতি ঘুর্ণিঝড়, বৃষ্টি, নদী, মহাসাগর, ইত্যাদিকে নিজের থেকে শক্তিশালী মনে করত। এখন বহু ক্ষেত্রে মানুষ প্রাকৃতিক বিপদ নিয়ন্ত্রক।

ঈন্দ্র

ঝড় ও বজ্রপাতকে মানুষ ভয় করে। অগ্নি, বৃষ্টি, মহাপ্লাবন, ইত্যাদি ধ্বংসশীল এবং ক্ষমতাবান। এগুলোকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রতিভূ দেবতা হিসাবে হিন্দুগণ পূজা করেন।

www.nagorikpathagar.org

ঝড় বৃষ্টি এবং বজ্রের দেবতা হলেন ঈন্দ্র। বৈদিক যুগের অন্যতম প্রধান দেবতা ছিলেন দেবরাজ ঈন্দ্র। তার জীবন সঙ্গিনী ভার্যা ছিলেন ঈন্দ্রানী।

অন্যান্য প্রাণীদের ন্যায় দেবতাদেরও জন্ম আছে। জনক জননী আছে। দেবরাজ হলেন ঈন্দ্র। তার পিতা অদিতি, মাতার নাম নিষ্টিগ্রী। ঈন্দ্রের স্ত্রীর নাম ঈন্দ্রানী এবং শচী।

দেবতাগণ আহার বিহার করেন। দেবরাজ ঈন্দ্র ১০টি বৃষের মাংস এবং ৩০০টি মহিষের মাংস ভক্ষণ করেন এক ভোজে (চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, দেববাণী)।

ঈন্দ্র ও বরুণ পূজা

ব্রহ্মা, বিষ্ণ, শিব আর্য হিন্দু দেবতা। বিষ্ণুর অন্যতম অবতার হলেন অযোদ্ধার রাজা দশরথের পুত্র রাম। বিষ্ণু অপেক্ষা ঈন্দ্র এবং বরুণ অধিকতর প্রাচীন। কিন্তু ভারতে ঈন্দ্র এবং বরুণ পূজা অপেক্ষা বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ পূজাই অধিকতর সমাদৃত। ভারতে ঈন্দ্র ও বরুণ পূজা হয় না বললেই চলে। তবে তারা বিস্মৃত হয়ে যাননি।

বরুণ পূজা

বিরাট নদী অতিক্রম করা কষ্টকর। নদীতে ঝড় উঠলে নৌকা ডুবি হয়। মহানদী, সমুদ্র অতিক্রম করা আরো কষ্টকর হয়। বৃষ্টিতে নদীর দু'কূল প্লাবিত হয়। এ সমস্ত দেখে জল দেবতা বরুণের পূজা শুরু হয়।

বায়ুপূজা

প্রবল ঘুর্ণিঝড়ে শুধু যে ঘর-বাড়ী উড়িয়ে নিয়ে যায় তা নয়, বিরাট মহীরুহ উৎপাটিত হয়ে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। বনাঞ্চল তোলপাড় হয়। এ দেখে মানুষ বায়ু দেবতার পূজা শুরু করে। তার সাহায্য কামনা করে।

অগ্নিপূজা

বজ্রপাত, বিদ্যুৎ চমক, ইত্যাদিতে মানুষ ভয় পায়। মানুষ ঘর বাড়ী যা তৈরী করে অগ্নি সব কিছু গ্রাস করে নেয়। তাই মানুষ অগ্নি দেবতার পূজা শুরু করে।

গঙ্গাদেবী

নদী পথে মানুষের চলাফেলা করতে হয়। সমুদ্র যাত্রায় জাহাজ ডুবির সম্ভাবনা থাকে। নৌকাডুবি ও জাহাজডুবি বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য গংগা দেবীর পূজা করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

৬৬

দেবতা পূজার বৈশিষ্ট্য

বহু হিন্দু ধর্মাবলম্বী গৌরব বোধ করেন যে, মুসলিমদের আল্লাহ্ মাত্র একজন। তাঁদের দেব দেবী তেত্রিশ কোটি বা তিন শত ত্রিশ মিলিয়ন। ভক্তের আচরণে একজন দেবতা সন্তুষ্ট না হলে আরেকজন দেবতা সন্তুষ্ট হতে পারেন। বর্তমানে চিকিৎসা শাস্ত্রে একাধিক চিকিৎসকের সাহায্য নেয়া হয়। কিন্তু আত্মার চিকিৎসা শাস্ত্রে একাধিক চিকিৎসক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

হিন্দু দেবতার সংখ্যা

হিন্দুধর্মাবলম্বীগণ তেত্রিশ কোটি দেবতার কথা বলেন। কিন্তু, নাম জিজ্ঞাসা করলে কোটি, লক্ষ–দূরের কথা, হাজার দেবতার নামও তাদের থেকে জানা যায় না। ধর্মের সকল শাস্ত্র খোঁজ করে চার শতের বেশী হিন্দুদের দেব-দেবীর নাম পাওয়া যায় না।

যে চার শত দেব-দেবীর নাম পাওয়া যায়, তাদের প্রায় দুই শতের মত দেব-দেবীর পূজা হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ কম বেশী করে থাকেন। কোন কোন দেবতা একই ব্যক্তি কর্তৃক একাধিকবার পূঁজিত হতে পারেন। ঘোষিত ৩৩ কোটি দেবতার তুলনায় জানা দেবতার সংখ্যা সীমিত। বহু দেবতার কোন ভক্ত নেই–বললেই চলে।

আঞ্চলিক দেবতা

বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ দেবতার পূজা হয়। যেমন- বাংলাদেশে দুর্গাপূজা অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে পালিত হয়।

অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের পূজা হয় উত্তর ভারতে অধিক। রাম ও রাবণের মধ্যে মরণপণ যুদ্ধ হয়। উত্তর ভারতে শ্রীরাম চন্দ্রের পূজা বেশী হয়। দক্ষিণ ভারতে রাবণের পূজা হয় অধিক। দক্ষিণ–মধ্য ভারতে, মহারাষ্ট্রে গনেশের পূজা হয় অধিক।

শুধু যে ভারত উপমহাদেশে অঞ্চল ভেদে দেব-দেবীর পূজারীদের ভিন্নরূপ আনুগত্য থাকে, তা নয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অঞ্চলভেদে, গোত্রভেদে, ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজা হয়। এমনকি একই পরিবারে দু'ব্যক্তি দু'জন দেবতার পূজা করতে পারেন। হিন্দু ধর্মীয় দেবতাগণ অদৃশ্য নন।

www.nagorikpathagar.org

শক্তিপূজা

মানুষ নিজের থেকে যাকে শক্তিশালী মনে করেন– সেরূপ শক্তির পূজা করেন। প্রাকৃতিক শক্তি, প্রাণী শক্তি, এমন কি মানব শক্তি হলেও। রাজা, বাদশাহ, সেনাপতি হতে মানুষ আশ্রয় প্রার্থনা করে। আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি কামনা করে।

আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন পুরুষদেরকে দেবতার প্রতিমূর্তি কল্পনা করে তাদের পূজা করা হয়। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। এ সেরা জীবের একটি বৈশিষ্ট্য হল– নিজের থেকে শক্তিশালী ব্যক্তি বা শক্তির পূজা করা।

মানব মর্যাদা

এ পৃথিবীতে অসংখ্য জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ আছে। হিমালয় পর্বত, প্রশান্ত মহাসাগর, ইত্যাদি সৃষ্টির মধ্যে বৃহত্তম। শিশু মায়ের কোলে পায়খানা, প্রস্রাব করলেও– মা প্রতিবাদ করে না।

আবহাওয়া কিরূপ– তা অনুধাবন করে বর্তমানে বিমান যোগে আকাশচারি হওয়া যায়। গ্রহ যানে করে চাঁদেও ভ্রমণ করা যায়। আবার ফিরেও আসা যায়। এরূপ মানুষ ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে নদী পূজা করে। পাহাড় পূজা করে।

জীব-জন্তুর পূজা করে। বৃক্ষপূজা করে। সর্পপূজা করে। বিশেষ স্থানের পূজা করে। ৩৩ কোটি দেবতার পূজা করে। অর্থাৎ ৩৩ কোটি দেব দেবী অথবা প্রতীক সৃষ্ট বস্তু পূজার যোগ্য এবং উপযুক্ত। আধুনিক কারো কারো মতে, পূজারীগণ হয়ত তাদের চিন্তাধারার ফলে নিজেদেরই কেউ কেউ অবমাননা করেন।

৬৭
দেবতাদের বাহনপূজা

দেবতাগণ পদব্রজে চলেন না। যদিও তাঁরা ইচ্ছা করলেই যে কোন স্থানে যে কোন সময় হাজির হতে পারেন। কল্পনা করলেই তাদেরকে পাওয়া যায়। যেহেতু তাঁরা বাহনে চলেন এবং বাহনগুলো তাদের অতি পছন্দনীয়, তাই দেবতাদের বাহন পূজাও করতে হয়।

বাহন ছাড়া সাধারণত দেবদেবীর আগমন এবং নির্গমন হয় না। তাই, তাদের পূজার সময় বাহনেরও ব্যবস্থা করতে হয়। যদি উপাসক ও ভক্তগণ তাদের গৃহে দেবদেবীর আগমন নিশ্চিত করতে চান এবং ঐকান্তিক ভাবে কামনা করেন, তবে তাদের বাহনের পূজাও করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

এত পূজা করতে হলে চলার পথ হয়তো মসৃন হয় না। কারণ, ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। বাহনের বিষয় ভুলে গেলেও দেবতার অসম্মান ও পাপ হয়।

দেবতার বাহন

হিন্দু ধর্মে শুধু যে দেবতাদের পূজা করা হয়, তা নয়। দেবতাদের বাহন হিসাবে যে সমস্ত পশু পক্ষী আছে সেগুলোর পূজা করা হয়। ইঁদুর হল গনেশের বাহন। গনেশ হলেন মহাদেবী পার্বতীর পুত্র। তাঁর আকৃতি মানুষের মত, যদিও মস্তকটি হাতির মত।

এরূপ একজন দেবতার বাহন হল ইঁদুর যা যুক্তিতে মিলে না। কিন্তু যে সমস্ত অঞ্চলে গনেশের পূঁজা প্রচলিত, ঐ সমস্ত অঞ্চলে ইঁদুর বা মুষিক পূজা করা হয়। নিশ্বাসে জীবন। বিশ্বাসে ধর্ম। ভক্তিতে মুক্তি। ধর্মের সমালোচনা পাপ। এরূপ কথাই হিন্দু ধর্মে প্রচলিত।

হস্তি, হনুমান, বানর, বৃষ, গাভী, ইত্যাদি ছাড়াও অন্যান্য প্রাণী যেমন– ঈগল, পেঁচা, ময়ুর, সর্প পূজা প্রচলিত আছে। বট বৃক্ষ, তুলসী গাছ, পাহাড়, পর্বত, নদী, বৃক্ষপত্র, ইত্যাদিও পূজার লক্ষ্য বস্তু অথবা পূজার সামগ্রী হিসাবে গন্য।

দেবীলক্ষ্মীর বাহন হল পেঁচা পাখি। যে অঞ্চলে লক্ষ্মী পূজা বেশী হয়, সে অঞ্চলে পেঁচাকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা হয়। দেবী সরস্বতীর বাহন হল রাজহাঁস। বিনয়ী দেবেশ্বর ব্রহ্মার বাহন পাতিহাঁস।

দুর্গার বাহন সিংহ। ইন্দ্রের বাহন হস্তী। বিষ্ণুর বাহন গরুড় পাখি। কার্তিকের বাহন ময়ুর। যমরাজের বাহন কুকুর। দেবী মনসার বাহন সর্প। মহাদেব শিবের বাহন ষাঁড় বা বৃষ।

গঙ্গার বাহন মকর। বিশ্বকর্মার বাহন ঢেঁকি। দেবী শীতলার বাহন গাধা। এরূপভাবে অন্যান্য দেব দেবীরও বাহন আছে।

শিবের বাহন নন্দি ষাঁড়

নন্দি নামক একটি বৃষ (ষাড়)-কে মহাদেব শিব বাহন হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তাই ষাঁড়ের পূজা করা হয়। উত্তর ভারতে বাঁদরের পূজা হয় বেশী। সরস্বতীর বাহন হল রাজহাঁস। শিক্ষার্থীদের কাছে হাঁস প্রিয়। ব্রহ্মার বাহন পাতিহাঁস। শিক্ষার্থীগণ ব্রহ্মার অতি প্রিয়।

পূজারীগণ পূজার মধ্যে শিব দেবতা এবং শিব দেবতার বাহনকে একত্র করে ফেলেন। তাই শিব পূজার সাথে সাথে নীল লক্ষ্মী বা বৃষ পূজাও সাধিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

শিব পূজাকালে বাহন এবং বাহিতের পার্থক্য লুপ্ত হয়। বাহন এবং মহাদেব শিবকে একই স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। যেমন- ঋষিগণ শিব পূজায় বলেন- হে দেব ! তুমি বৃষরূপী ভগবান। হে নীল বৃষ! তুমি বিশ্ব পালকগণের পালক এবং সনাতন। তুমি বিঘ্ন হত্যাকারী, তুমি ত্রাণকর্তা, ধর্মরূপী মহা প্রভু।

হে নীল বৃষ ! তুমি নাথ। তুমি সিদ্ধ। তুমি গনকপ্রদ। তুমি সর্ববৈরী নিশুধন। জগৎ সুধা বিধায়ক, সৌর শ্রেষ্ঠ ও মহাবল। তুমি শুভ। অগ্রে পার্বতীসহ কৈলাশপর্বত ধারণ করেছ। তুমি বেদময় বেদাত্মা। তুমি দেবসত্য।

পূজার শ্লোক

শিব পূজাকালে যে সমস্ত শ্লোক পাঠ করা হয়, তা অত্যন্ত ভক্তি, এবং শ্রদ্ধা রসমিশ্রিত। একটি শ্লোকের অর্থ নিম্নরূপ ঃ যিনি দেব মহেশ্বর, তিনি এ বৃষ বা ষাঁড়রূপ ধারণকারী। এ চতুষ্পদ নীল বৃষই পঞ্চশহর। এই বৃষ দর্শনে বা জপের ফলে পূণ্য লাভ হয়। নীল বৃষের পূজা করা হলে সমস্ত জগত পূজিত হয়।

নীল বৃষকে স্নিগ্ধ ঘাস বা পানীয় প্রদান করা হলে জগত আপ্যায়িত হয়। এ নীল বৃষ সর্বদা সনাতন বেদ মন্ত্র দ্বারা অর্চিত হয়ে থাকে। পূজার মধ্যে বলা হয়– হে দেব মহাদেব! তুমি বৃষরূপী ভগবান। যে তোমার সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে অথবা পাপাচার করে, সে অবশ্যই বৃষ এবং রৌরব নরকে পঁচবে। যে তোমাকে পদ দ্বারা স্পর্শ করে, সে ক্ষীপ্ত ঘাস ও তুষণী নরক যাতনা ভোগ করবে, ইত্যাদি (স্কন্দ পুরাণ, নাগর খন্ড, অংশ ৫৯, শ্লোক ৫০-৭০)।

www.nagorikpathagar.org

২১তম অধ্যায়

৬৮

প্রকৃতি পূজা

হিন্দু ধর্মের ধর্মচিন্তায় প্রাথমিক স্তরে ছিল প্রকৃতি পূজা। প্রকৃতিকে কল্পনা করা হয় নারী হিসাবে। কারণ, নারী-নবজাতকের জন্ম দেয় এবং সন্তান প্রসব করে। জীব জগতের জন্ম প্রক্রিয়ায় নারীর সাথে পুরুষেরও প্রয়োজন।

পর্বত ও প্রস্তর পূজা

পাহাড় পর্বত থেকে নদী প্রবাহিত হয়। পাহাড়ে বৃক্ষরাজী জন্মে। বিরাট বিরাট মহীরুহে পরিণত হয় ক্ষুদ্র চারাগাছ। পাহাড়ের বৃক্ষরাজী তাপে ভারসাম্য আনে। উঁচু হিমালয় পাহাড়ে মেঘ আটকে যায়। পানি হয়ে প্রবাহিত হয়। মুণি ঋষিগণ পাহাড়ে তপস্যা করেন। তাই পাহাড় পবিত্র। পাহাড়কে হিন্দুগণ পূজা করেন।

নদীপূজা

অন্যান্য প্রাকৃতিক বস্তু এবং শক্তির ন্যায় নদী ও নদীর জলধারা শক্তির প্রতীক। বর্ষাকালে বা বিশেষ বিশেষ সময়ে নদী প্লাবন সৃষ্টি করে। ঘর, বাড়ী ভেসে যায়। জল ধারা পরিবর্তন হয়। মাটি ভেঙ্গে নদী সৃষ্টি হয়। নদী যোগাযোগের মাধ্যম।

নদীতে মৎস উৎপন্ন হয়। নদীর জল মাতৃসম। মা যেমন সন্তানকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করেন, নদীও প্রকৃতিকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে পবিত্র করেন। হিন্দুগণ নদী পূজা করেন। মাতৃসম নদী শুধু সেবিকা নন, দেবীও।

গঙ্গা নদী থেকে শিব পত্নী গঙ্গার জন্ম। এলাহাবাদের অদূরে ত্রিবেনী নামক স্থানে **গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী** নদীর সঙ্গম স্থল। এ স্থান হিন্দুদের নিকট পবিত্রতম। ত্রি-নদীর মিলন স্থানে বেনারস শহর। বেনারস হল হিন্দুদের পবিত্রতম তীর্থস্থান। সকাল বেলা গঙ্গাস্নান সৌভাগ্যের প্রতীক। গোবর মিশ্রিত পানি দিয়ে গৃহ পরিষ্কার করা হয় এবং পবিত্র করা হয়।

বিত্তশালী এবং হিন্দু সাধকগণ মুত্যুর পূর্বে বেনারসে যেতে চেষ্টা করেন– গঙ্গা নদীর জলে মৃত্যু-বরণ করার জন্যে। মৃত্যু আসন্ন হলে মৃত্যু যাত্রীদের শরীরের অর্ধেক গঙ্গাজলে ডুবিয়ে রাখা হয়। যেন প্রাণ ত্যাগ করার সাথে সাথেই প্রাণটিকে গঙ্গাদেবী কোলে তুলে নিতে পারেন। উৎপত্তি স্থল থেকে শুরু করে সমুদ্রের মিলন স্থান পর্যন্ত সর্বত্র গঙ্গা নদী তথা গঙ্গাদেবী পবিত্র।

www.nagorikpathagar.org

গঙ্গাস্নান

গঙ্গা তীরে বা নদী তীরে যাদের বাস–তারা সাধারণত প্রাতকালে গঙ্গা স্নান করে দিবসের কাজ শুরু করেন। যে কোন নদীর তীরে প্রাতস্নান অতি পূণ্য কাজ। স্নানকালে ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করেন। গায়ত্রী মন্ত্রে দেবতা বন্দনা করা হয়।

দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হয় পূজারীকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসার জন্য। মুসলিমগণও মুনাযাত করে অজ্ঞানতার অন্ধকার (জাহলিয়াত) থেকে জ্ঞানের আলোতে (নূর) আসার জন্য।

যাদের বাড়ী গঙ্গা তীরে নয় অথবা কোন নদী তীরে নয়, তাদেরও গঙ্গা স্নানের বিকল্প বিধি আছে। তারা সূর্য উঠার শুরুতেই ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করে সূর্য দেবতাকে সম্মান জানাবেন, দেবতার সম্মানার্থে মন্ত্র পাঠ করবেন, নদীর পানি কয়েক ফোঁটা চারিদিকে ছড়িয়ে দিবেন। গঙ্গাঁ জল না পাওয়া গেলে বিকল্প জল ব্যবহার করা হয়।

বৃক্ষপূজা

বৃক্ষ ফল দেয়, ছায়া দেয়, পাতা দেয়। গাছ কেটে কাঠ পাওয়া যায়। কাঠ দিয়ে ঘর তৈরী হয়। নৌকা তৈরী হয়। জাহাজ তৈরী হয়। জ্বালানী হিসাবেও কাঠ ব্যবহার হয়। বৃক্ষ, মহীরুহ শত শত বছর জীবিত থাকে। তাই বৃক্ষমূলে পূজা অর্পণ শুরু হয়।

প্রাকৃতিক শক্তির পূজা মানুষের মনে প্রথম সৃষ্টি হয়। ঝড়ে বা অন্য কারণে বৃক্ষ উপড়ে পড়ে। বুড়ো ডাল ভেঙ্গে পড়ে। বৃক্ষ স্বেচ্ছায় কারো ক্ষতি করে না।

বৃক্ষের উপকার এতো বেশী যে, বৃক্ষকেও দেবতা হিসাবে পূজা করা হয়। ঈশ্বরের প্রতিভু দেব-দেবীবৃন্দ নিজেদেরকে বৃক্ষের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেন। মুনি ঋষিগণ বৃক্ষতলে তপস্যা করেন। এ বৃক্ষকেও হিন্দুগণ দেবতা জ্ঞানে পূজা করেন।

তুলসী দেবী

ঈশ্বর নিজেকে তার সৃষ্ট জীব এবং বস্তুর মাধ্যমে প্রকাশ করেন। শুধুমাত্র বটবৃক্ষ, অশ্বথ বৃক্ষ নয়, তরুলতার মাধ্যমেও ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন।

তুলসী চারা অতি ক্ষুদ্র। ঝোপ ঝাড় যতটুকু উঁচু হয় তুলসী ততটুকুও নয়। ক্ষুদ্র তুলসী গাছকেও দেবী মনে করা হয়। ধরা হয় যে, তুলসী গাছে এক হাজার দেবতা বাস করেন। তুলসীপাতার রস, কফ এবং সর্দির জন্য খুবই উপকারী। এর অন্যান্য স্বাস্থ্যগত গুণও রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

ধর্মপ্রাণ হিন্দুগৃহে তুলসী গাছ রোপন করা হয়। মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুপথযাত্রীকে বাড়ীর অঙ্গনে তাড়াতাড়ি তুলসী বৃক্ষ দেবীর তলে নিয়ে যাওয়া হয়। যাতে মৃতের প্রতি এক হাজার দেবতার আশির্বাদ তুলসী দেবীর আশির্বাদের সাথে মিলিত হয়।

৬৯
মূর্তিপূজা

মূর্তিপূজা হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট। বেদ, উপনিষদ, পুরাণে মূর্তি পূজার কোন উল্লেখই নেই। মূর্তিপূজা হিন্দু ধর্মে কখন প্রবর্তন হয়েছিল তা অস্পষ্ট হলেও বর্তমানে মূর্তিপূজা হিন্দু ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মূর্তিপূজা ভারত উপমহাদেশে কখন থেকে শুরু হল–তা বলা কষ্টকর। কোন যুগ, শতাব্দী থেকে মূর্তিপূজা শুরু হল– তাও অস্পষ্ট এবং অজানা। কিন্তু কোন গ্রন্থ থেকে শুরু হল তার ইঙ্গিত রয়েছে।

অনেকের মতে, গ্রীসে মূর্তিপূজা ছিল। আলেকজান্ডারের অভিযানের পরেই গ্রীক প্রভাবে ভারতে মূর্তিপূজা শুরু হয়। এটা সাধারণভাবে গৃহীত একটি সত্য।

মহেঞ্জোদারোতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের সময় দেবতাদের মূর্তি পাওয়া যায়। মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত একটি মূর্তিকে ধারণা করা হয় এটা শিবমূর্তির প্রতীক।

কারো কারো মতে, ভারতে মূর্তিপূজা শুরু হয় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের পর থেকে। বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্পষ্ট। বৌদ্ধের প্রধান শিষ্য আনন্দ। আনন্দ তার প্রভু বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন–ঈশ্বর বা প্রভু বলে কোন সত্ত্বা কি আছে ? মহাজ্ঞানী বুদ্ধ জবাবে বলেছিলেন, আমি কি বলেছি ঈশ্বর নেই?

আনন্দ পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে প্রভু! আমি কি ভাবব ঈশ্বর আছে? এবার বুদ্ধ বুদ্ধিমত্তার সাথে জবাব দিলেন আমি কি বলেছি ঈশ্বর আছে? অর্থাৎ ঈশ্বর আছে কি নেই–এর কোনটাই বুদ্ধ বলেননি। হয়ত বুদ্ধই ছিলেন ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরের নবম অবতার।

বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীগণ বুদ্ধের মূর্তিপূজা করেন। বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল আলেকজান্ডারের ভারত বিজয়ের পূর্বে।

হিন্দুগণ এক ও অদ্বিতীয় সর্ব শক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেও এখন পর্যন্ত ঈশ্বরের কোন মূর্তি কেউ দেখেনি। তবে যে কোন প্রাণীর পূজাকেও ঈশ্বরের পূজা বলে ধারণা করা হয়। কারণ, সব কিছুই ঈশ্বর থেকে এসেছে অথবা ঈশ্বর থেকেই সৃষ্টি অথবা সৃষ্টির প্রেরণা থেকেই পাওয়া গেছে। এর ফলে এক ঈশ্বরের পূজা অসংখ্য মূর্তি পূজায় পরিগণিত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

গৃহে মূর্তি

ধর্মপ্রাণ হিন্দুগৃহে, দেবতার প্রতিমূর্তি রাখা হয়। এ মূর্তি হতে পারে মহেশ্বর শিব অথবা বিষ্ণু অথবা শ্রী কৃষ্ণের। এ মূর্তি পূজা হতে পারে সকাল এবং সন্ধ্যায়।

মূর্তি কেন্দ্রীয় ভাবে তৈরী করা হয়না। কোন কোন স্থানে অতীতে পূজ্য মূর্তি বা প্রাণী পূজা বাদ দিয়ে নতুন বস্তু পূজা প্রবর্তিত হয়েছে। ঈশ্বর-ঈশ্বরী, দেবতা-দেবী, ইত্যাদির পূজা বিভিন্ন আকার-আকৃতি ও প্রথায় পালন করা হয়।

প্রত্যেকটি হিন্দুগৃহে কোন না কোন দেবতার মূর্তি বা ছবি রাখা হয়। মূর্তির পরিবর্তে কোথাও কোথাও আলোকিত আঁধার রাখা হয় যা মূর্তির রূপ প্রতিফলিত করে। মাটির মূর্তির পরিবর্তে আলোকিত মূর্তি অধিকতর পরিচিত হচ্ছে।

পূজারী দেবতার কাছে মাথা নত করতে করতে দিবসের যে কোন সময় মন্দিরে প্রবেশ করতে পারেন। তবে জীবনে একবারও মন্দিরে প্রবেশ না করলে তা পাপ নয়। দেবতাগণ অতি ক্ষমাশীল এবং উদার।

প্রত্যেক হিন্দু মন্দিরে এক বা একাধিক বা বহু দেব-দেবীর মূর্তি থাকবে। শিবের যৌনাঙ্গ বা লিঙ্গ থাকবে। শুধুমাত্র শিবের লিঙ্গই নয়– সাথে সাথে নারী অঙ্গ বা নারী যোনী থাকতে হবে। যা ধরা হয় দেবী পার্বতীর লিঙ্গ।

শিবলিঙ্গ এবং পার্বতী লিঙ্গ-এর মাধ্যমে সৃষ্টি প্রক্রিয়া প্রতিফলিত হয়। হিন্দুদের নিকট শিবলিঙ্গ অথবা পার্বতী যোনীর বিষয়টি তেমন আপত্তিকর কিছু মনে হয় না। বরং তা পরিগণিত হয় পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে।

নারী পুরুষ সকলেই পরস্পরের লিঙ্গ দেখতে অভ্যস্ত। বিশেষ করে শিশু লিঙ্গ। ইয়াহুদ, খৃষ্টান এবং মুসলিমগণ দেব-মন্দিরে লিঙ্গ দেখে হতভম্ব হয়ে যান। খৃষ্টানদের মধ্যে লিঙ্গচর্চা এত ব্যাপক যে, তারা ইয়াহুদ ও মুসলিম অপেক্ষা ধর্ম মন্দিরে লিঙ্গের অবস্থানে অধিকতর সহনশীল।

কীর্তণ

হিন্দুদের ধর্মীয় সঙ্গীতকে বলা হয় কীর্তণ। সঙ্গীতের বিষয়বস্তু থাকে ধর্ম সংক্রান্ত এবং পবিত্রতার আমেজ স্নিগ্ধ। কীর্তণ ধর্মীয় আরাধনা বা পূজার একটি বিশেষরূপ। যন্ত্র সঙ্গীতের তালে তালে কীর্তণে অংশ গ্রহণকারীদের নৃত্যও থাকে।

৭০

গো-পূজা

হিন্দু শাস্ত্রে গরু একটি অতি পবিত্র প্রাণী। গো হত্যা মহা পাপ। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য রচিত "অর্থ শাস্ত্র" হতে জানা যায় যে, সেকালে গো হত্যার পাপের শাস্তি ছিল মৃত্যুদন্ড। মহাত্মা গান্ধী তাঁর রচিত 'হিন্দু ধর্ম' পুস্তকে লিখেছেন, গো-রক্ষা হিন্দু ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় কর্তব্য।

www.nagorikpathagar.org

প্রাণী পূজার মধ্যে প্রধান ছিল অশ্ব পূজা এবং গো-পূজা। গো-পূজাটাই হিন্দুদের মধ্যে অত্যধিক। কোন ধার্মিক হিন্দু সাধারণত গো-হত্যা করে না। শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, অন্যান্য বহুবিধ কারণে গো-রক্ষা এক অতি পূণ্য কর্ম (মাহাত্মা গান্ধী, হিন্দুধর্ম, পৃ. ১০৮)।

গোরক্ষা

মহাত্মা গান্ধীজী লিখেছেন, যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাহ্যিক প্রকাশ কি? আমি বলব, তা হল– গো-রক্ষা (হিন্দুধর্ম, নতুন দিল্লী, ১৯৯১ খ্রী. পৃ. ১১০)। তিনি আরো লিখেছেন, যদি কেউ গো-রক্ষা নীতিতে বিশ্বাস না করে, তিনি হিন্দু হতে পারেন না।

একজন আমেরিকান ঐতিহাসিক এবং পরিব্রাজক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে ভারত ভ্রমণ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লিখেছেন, কলকাতায় অবস্থানরত মার্কিন সেনাদেরকে লিখিত নির্দেশ দেয়া হতো যে, একজন মার্কিন সেনা যদি মটর চালনাকালে এমন অবস্থায় পতিত হন যে– তাকে একজন মানুষ অথবা একটি গরুকে নিহত করা ছাড়া তার সামনে কোন তৃতীয় বিকল্প নেই, তবে তাকে মানুষের দিকে গাড়ী চালাতে হবে।

দুর্ঘটনার পর অন্য কোন দিকে না গিয়ে পুলিশের কাছে থানায় যেতে হবে এবং তার সামনে মানুষ অথবা গরু–এ দু'টির উপরে গাড়ি চালনা করা ছাড়া তার তৃতীয় বিকল্প ছিল না–এ রিপোর্ট দিতে হবে। তাহলে তিনি থাকবেন নিরাপদ ও আইনের ধারায় সুরক্ষিত (Robert Trumbull, As I see India, London, ১৯৫৭, p- ২৪১).

গো-মাংস ভক্ষণ

প্রাচীন ভারতে গো-হত্যা নিষিদ্ধ ছিল না। তৎকালীন দেবতার সন্তোষের জন্যে মানুষ হত্যা, নরবলি, গো-হত্যা যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত। প্রাচীন হিন্দু সমাজে গো-মাংস দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করা হত।

বর্তমানে যদি কোন হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, তাকে গোমাংস ভক্ষণে বিরূপ তো দেখাই যায় না বরং বিপরীত মনে হয়। গোমাংস না খাওয়ার অভ্যাসটি যে প্রকৃতি সম্মত– অন্তত তা নও মুসলিমদের রুচি থেকে প্রতীয়মান হয় না।

মহাত্মা গান্ধীজী উল্লেখ করেছেন, আমি জানি প্রাজ্ঞ জ্ঞানী সুধীবর্গ আমাদেরকে বলবেন যে, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদে গাভী উৎসর্গের উল্লেখ আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লেখ আছে যে, প্রাচীন ভারতে গো-মাংস দিয়ে ব্রাহ্মণদেরকে আপ্যায়ন করা হত। (M. K. Gandhi, Hindu Dharma, p-120, New Delhi, 1991).

www.nagorikpathagar.org

ঐ গান্ধীজী অবশ্য এ সম্বন্ধে যা কিছু জানেন সব কিছু উল্লেখ করেননি। কারণ, যারা গো-হত্যা নিষিদ্ধ মনে করেন, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে তাদের মনোকষ্টের কারণ তিনি হয়ত হতে চাননি।

ঋগবেদে গাভী উৎসর্গ

ঋগবেদ হল হিন্দুদের প্রাচীন এবং পবিত্রতম ধর্মগ্রন্থ। ঋগবেদে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে গাভী উৎসর্গের কথা বলা হয়েছে। ঋগবেদে একটি প্রার্থনা শ্লোকে বলা হয়েছে, আমাদের গাভীগুলোর ওপর মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হোক। গাভীগুলো সুস্থ হয়ে ওঠুক। তাদের প্রয়োজন মত দুর্বা ঘাস তারা আহার করুক।

যে প্রাণীগুলো দেবতাদের উদ্দেশ্যে তাদের দেহার্ঘ অর্পন করে– তাদের সকল কিছু সোম অগ্নি দেবতার জ্ঞাত। (Ralph J. H. Griffith translated Rig Veda, p- 647, New York, 1992).

গাভীগুলোর কিছু বিচিত্র বর্ণের। কয়েকটি হালকা বর্ণের এবং কিছু কিছু এক বর্ণের। অগ্নি পূজা উপলক্ষে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়। গো রক্ষার জন্য তাদের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

ঋগবেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অগ্নি দেবতা গাভী এবং বৃক্ষ দ্বারা আপ্যায়িত হতেন অর্থাৎ গো-মাংস অগ্নিতে সিদ্ধ করে এবং পুড়িয়ে অগ্নি দেবতাকে আপ্যায়ন করা হতো। (Rig Veda, V111.43.11).

ঋগবেদে অন্য একটি শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সৎকারের উদ্দেশ্যে মৃতদেহ প্রস্তুত করার সময় গো-মাংস মৃত দেহের চারিদিকে দেয়া হত এবং তারপর অগ্নি সংযোগ করা হত (Rig Veda. x. 16.7).

ঐত্যরীয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে গো-হত্যা

"ঐত্যরীয় ব্রাহ্মণে" উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন রাজা অথবা অন্য কোন সম্মানিত ব্যক্তির আগমন উপলক্ষ্যে কোন বৃষ অথবা বাচ্চা হয়নি এমন গাভী যেমন হত্যা করা হত, অনুরূপভাবে সোমরাজ অগ্নির আগমন উপলক্ষ্যে গো-হত্যামূলক শ্রদ্ধা নিবেদন অর্ঘ করা হতো। (ঐত্যরীয় ব্রাহ্মণ- ১.১৫)।

তৈত্রিয় ব্রাহ্মণে গো-হত্যা

অগস্ত্য মুনি ঋষির আগমন উপলক্ষে একশত কৃষ্ণ বর্ণের ষাড় অর্ঘ হিসাবে হত্যা করা হয়। (তৈত্রীয় ব্রাহ্মণ, Taitriya Brahamana 11. 1. 11. 1 at Pancha Vinsha Brahmana, xxxi, 14.5).

"শত পথ ব্রাহ্মণে" গো-হত্যা

www.nagorikpathagar.org

"শতপথ ব্রাহ্মণ" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঋষি যজন বলক্য বলেছেন যে, যদিও গাভী সকলের জন্য উপকারী প্রাণী, তিনি ওটার মাংস ভক্ষণ করবেন, যদি তা হয় সুস্বাদু। (Satahpatho Brahman 111.1. 2.21).

"শতপথ ব্রাহ্মণে" আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সোম পূজা উপলক্ষ্যে কুমারী গাভী উৎসর্গ এবং হত্যা করা যেতে পারে। শুধু ধর্মীয় উদ্দেশ্যে নয়, অন্যান্য উপলক্ষ্যেও গাভী হত্যা করা যায় এবং ওটার মাংস ভক্ষণ করা যায়। (Sata Patha Brahman 5.2.1).

শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে সম্মানিত অতিথি আগমন উপলক্ষ্যে মোটা তাজা বৃষ এবং তাজা ছাগল উৎসর্গ ও হত্যা করা যায়। (Satapatha Brahmana রা.5.2.1).

বৃহদারণক্য উপনিষদে গোমাংস ভক্ষণ

যদি কোন দম্পতি এমন সম্মান প্রত্যাশা করেন যিনি হবেন বেদ শাস্ত্রে মহাপন্ডিত– তবে, তাঁরা ষাঁড়ের মাংস অথবা বাছুরের মাংস যোগে সন্ধ্যা রাতে আহার সম্পন্ন করতে পারেন। (Brihadaranyaka Upanishada (vi. 4. 18) ; Prof. A.B. Shaha, Religion and Society in India; Muslims in India, p- 557, December, 1983.).

গো-মূত্র ও গোবর

হিন্দু ধর্ম তত্ত্বে গরুর স্বর্গীয় মর্যাদার কারণে হিন্দুগণ গো-মুত্র এবং গোবরকে দেহ পবিত্রকারী, পানীয় এবং খাদ্য বস্তু হিসেবে বিবেচনা ও মূল্যায়ন করেন। হিন্দু ধর্মতত্ত্বে আধ্যাত্মিক গুরুত্বের জন্য ভারতীয় শাসনতন্ত্রে গো রক্ষার জন্য বিশেষ ধারা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

২২তম অধ্যায়

৭১

তীর্থযাত্রা ও তীর্থস্থান

হিন্দু ধর্মে তীর্থস্থান ও তীর্থযাত্রা আছে। তীর্থস্থানগুলো মুসলিমদের খানকা, দরগা অপেক্ষা অধিকতর জমজমাট এবং আকর্ষণীয়। মাযার, খানকা কোন অলি বুযুর্গের মৃতদেহকে অবলম্বন করে গড়ে উঠে। হিন্দু ধর্মের তীর্থ যাত্রায় পাপ ক্ষয় হয়। কিন্তু তীর্থ যাত্রায় মাধ্যমে ত্যাগের মনোভাব ছাড়া অন্যান্য পূণ্য লাভের লক্ষ্য ততটা পূণ্য হয়ত হয় না।

তীর্থ স্থানে অবস্থান

পূজার উদ্দেশ্য–মানুষের অপবৃত্তি হ্রাস ও অপমানসিকতা নাশ এবং ঈশ্বরের সন্তোষ লাভ। পাপনাশের বিষয়টির উপর তীর্থস্থানের গুরুত্ব ততটুকু দেয়া হয় না। তীর্থস্থানে থাকাটাই পূণ্যকর্ম ধরা হয়। কিছু কিছু লোক তীর্থস্থানে যায়– তাদের শেষ জীবন সমাপ্তির জন্য।

যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গেলে জ্ঞান লাভের, বিশেষ করে, স্তরভেদে জ্ঞান লাভের লক্ষ্য থাকে। তীর্থস্থান ভ্রমণের ক্ষেত্রে সেরূপ সুস্পষ্ট লক্ষ্য থাকে না। তবে তীর্থস্থানের অবস্থিতির কাজটি পূণ্য ধরা হয়।

সংসার ত্যাগ ও বৈরাগ্য

হিন্দু ধর্মে কৃচ্ছ সাধনা আছে। সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বনের বিধিও স্বীকৃত। বৈরাগ্য অবলম্বনকালে ব্যক্তিকে দান-উপদানের উপরেই নির্ভর করতে হয়।

বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকায় তীর্থস্থানে গমন এবং বৈরাগ্য অবলম্বনে কিভাবে আত্মার আত্ম-শুদ্ধি হয় সে সমস্ত সুন্দর সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে।

পূজা পার্বনের জন্য বহু মন্দির নির্মিত হয়। এই মন্দিরের আকর্ষণীয় বিষয় হলো পুরোহিত এবং দেবতার মূর্তি। যে কোন মন্দিরে দেবতার মূর্তি পূজা করা হয়। মূর্তিপূজার পুরোহিতগণ সাধারণত ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত।

পবিত্র নগরী বেনারস

হিন্দুদের পোপ নেই। কাথলিকদের পীঠস্থান রোম নেই। মুসলিমদের মক্কা মদীনা আছে, তবে স্থান হিসেবে পূজিত হয় না। মক্কা মদীনা ইবাদাত কবুলের অতি উৎকৃষ্ট স্থান।

হিন্দুদের পবিত্র নগরী বেনারস। এটা কখন কি কারণে পবিত্র হলো– তা ততো সুস্পষ্ট নয়। কিন্তু বেনারসে হিন্দু মন্দির, হিন্দু পুরোহিত, হিন্দু তীর্থ যাত্রীর

www.nagorikpathagar.org

সংখ্যা অন্য বহু খৃষ্টান ও মুসলিম তীর্থস্থান থেকে বেশী। হিন্দুগণ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য বেনারসে বা গঙ্গা তীরে চলে যান।

পবিত্র হিমালয়

হিমালয় পর্বত হলো হিন্দু দেবতাদের বাসস্থান। এখানে আছে শিব নিবাস কৈলাস, বিষ্ণু লোক বৈকুণ্ঠ এবং ব্রহ্মালোক গোলকধাম ইত্যাদি। হিমালয়ের পবিত্রতা মহাদেব শিবের কারণে। ব্রহ্মা থাকেন ব্রহ্মালোকে। বিষ্ণু থাকেন বিষ্ণুলোকে। মানস সরোবরে প্রতি বছর শত শত তীর্থযাত্রী সীমাহীন কষ্ট সহ্য করে তীর্থ যাত্রা করেন।

ত্রিবেনী

এলাহাবাদের নিকটে ত্রিবেনী হলো তিন পবিত্র নদীর সঙ্গম স্থল। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর মিলন কেন্দ্র। কুম্বমেলা উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ লোকের এখানে আগমন হয়। এখানে একবার ডুব দিতে পারলে সকল পাপ ক্ষয় হয় এবং জীবনের জন্য পরিত্রাণ বা মুক্তি পাওয়া নিশ্চিত হয়ে যায়।

বৃন্দাবন ও পূরী

উড়িষ্যা রাজ্যের পুরী, আজমীরের নিকটস্থ পুষ্কর হ্রদ পূণ্যস্থান। তীর্থ স্থান।

বৃন্দাবন হলো শ্রীকৃষ্ণদেব এবং গোপীনিদের লীলা খেলার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। কৃষ্ণ প্রেমের মহা স্মৃতি উৎসব এখানেই হয়। বৈষ্ণবদেরও প্রাণপ্রিয় স্থান হলো বৃন্দাবন।

হিন্দু ধর্মে পাহাড়, পর্বত, পর্বত গুহা, নদী তীর, নদীর অববাহিকা, ঝর্না প্রভৃতি–সকল প্রকার সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য হলো ধর্মীয় কোণ থেকে পবিত্র। এগুলো প্রাকৃতিক সৌন্দয্যের আকার এবং আকর্ষণীয়। সবগুলো যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর তা হয়ত বলা যাবে। অগ্নিগিরি, ভূমিকম্প, ইত্যাদি ভীত প্রদ এবং ভয়ঙ্কর।

হিন্দু ধর্মের নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান অন্য ধর্মের বিধি-বিধান থেকে অনেক বেশী কঠোর। হিন্দু ধর্মের ধর্মীয় মাহাত্মের মধ্যে এমন কিছু ক্ষুদ্র বৃহৎ সীমাবদ্ধতা লুকিয়ে আছে যার ফলে এই ধর্মটির মাধুর্য অন্য ধর্মের অবলম্বনকারীদের পক্ষে উপভোগ করা সম্ভব হয় না।

পারস্পরিক জানাজানির মাধ্যমে এই বাধার বৃন্দাচলের জটাজল বিচ্ছিন্ন হলে হিন্দু এবং মুসলিম ধর্মের সমন্বয় সাধিত হবে। একটির আলোতে আরেকটি উজ্জ্বলতর হবে।

www.nagorikpathagar.org

৭২
এক লক্ষ নরক

বেদ হিন্দুদের সর্ব প্রথম এবং সর্ব প্রধান ধর্মগ্রন্থ। মূল বেদ গ্রন্থে নরকের কোন উল্লেখ নেই। তবে হিন্দুদের অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থে নরকের উল্লেখ আছে। শ্রী ভগবত গীতা হিন্দুধর্মের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ। এটা মহাভারতের অংশ। শ্রী ভাগবতে এক লক্ষ নরকের উল্লেখ আছে। এক এক শ্রেণীর পাপী এক এক ধরনের নরকে নিক্ষিপ্ত হবে।

স্বর্গবাসীদের নরক

বিষ্ণু পুরাণে স্বর্গের অধিবাসীদের অবস্থা বর্ণনা আছে। এতে উল্লেখ করা হয় যে, শুধুমাত্র নরকেই নরক যন্ত্রণা আছে তা নয়, যারা পরবর্তী জীবনে স্বর্গ প্রাপ্ত হবেন, তারাও নরক যন্ত্রণা ভোগ করবেন। স্বর্গ বাসীদের এক প্রকার নরক যন্ত্রণা হবে স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হয়ে এই পৃথিবীতে পুনঃজন্ম গ্রহণ।

এ পুনর্জন্মে পূর্ববর্তী জন্ম অপেক্ষাকৃত গুণগত মানে উন্নততম কর্ম সম্পাদন করা না হলে নিক্ষিপ্ত হতে হবে নরকের গহ্বরে। পূর্ববর্তী জন্মে অতীতের হিসাবে যতটুকু অগ্রগতি হয়েছিল তা হারিয়ে যাবে, আবার নতুন করে নরক জীবন যাপন শুরু হবে।

ধর্মগ্রন্থ পাঠে অনীহা

যারা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদ এবং ব্রাহ্মণ ধর্ম গ্রন্থ পাঠ করবে না এবং অনুসরণ করবে না, তারা নিক্ষিপ্ত হবে জ্বলন্ত ধাতবের অগ্নিকুন্ডে। তারা এ প্রজ্জ্বলিত নরকে থাকবে ৩৫ বছর যাবত।

তমিস্রা

যারা বিবাহ বহির্ভূত যৌনতা এবং শিশু সন্তান চুরি বা অপহরণের জন্য দায়ী, তারা নিক্ষিপ্ত হবে তমিস্রা নামক অন্ধকার নরকে। এ নরকের বৈশিষ্ট্য হল চির অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে পাপীদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। কে শাস্তি দিচ্ছে, কোন দিক থেকে শাস্তি আসছে, পাপীরা দেখতে পাবে না।

রৌরভ

যে সমস্ত পাপীগণ ধর্মকর্মের প্রতি উদাসীন এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে না, তারা নিক্ষিপ্ত হবে রৌরভ নরকে। এই নরকের শাস্তির একটি প্রকৃতি হবে রূঢ় নামক এক প্রকার অতি জঘন্য প্রাণী কর্তৃক আক্রমণ এবং পাপীদের দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করণ।

www.nagorikpathagar.org

দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্নের পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো পুনরায় মিলিত হবে এবং পুনরায় নরকবাসী জঘন্যতর প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হবে। একবার আক্রান্ত হবে শৃগালের দ্বারা। শৃগালের আক্রমণের পর বাঘের দ্বারা আক্রান্ত হবে।

অতিভোজীদের নরক

যারা অতিভোজী, তারা নিক্ষিপ্ত হবে চির জ্বলন্ত এবং ফুটন্ত তৈলের নরকে। যেহেতু তৈলাক্ত খাদ্যের প্রতি দুনিয়ার জীবনে তাদের আকর্ষণ ছিল, তাই ফুটন্ত তৈলের কড়াইতে তাদেরকে ভাজী করা হবে। এ তৈলের উত্তাপ দুনিয়ায় ফুটন্ত তৈলের তাপমাত্রা হতে হবে অনেক অনেক বেশী। কারণ, তা উত্তপ্ত হবে নরকের আগুনে। যারা অহংকারী, তারাও রৌরভ নরকে নিক্ষিপ্ত হবে।

যারা উচ্চবর্ণের মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করবে, তারা নিক্ষিপ্ত হবে শুকর অধ্যুষিত নরকে। এ নরকে তারা বার বার শুকর কর্তৃক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হবে। (Wilkins, Hindu Mythology, p- 412, 1975).

৭৩
স্বর্গ

দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গটির নাম হল স্বর্গ। ভারতীয় ভাষা সমূহে স্বর্গ শব্দটি দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গের নাম হতে এসেছে। অন্যান্য দেবতাদের স্বর্গ দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গের নিকটে। মেরু নামক পর্বতের উপর স্থাপিত হবে ইন্দ্রের স্বর্গ। এ মেরু পর্বতটি হিমালয়ের উত্তর দিকে।

বৃহত্তম স্বর্গ

হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে স্বর্গের বিষদ বর্ণনা আছে। মহা ঈশ্বর ব্রহ্মের স্বর্গই হবে বৃহত্তম। এ স্বর্গ হবে ৮০০ শত মাইল দীর্ঘ এবং ৪ শত মাইল প্রশস্ত এবং ৪০ মাইল উচ্চ। কলিযুগে জনসংখ্যা বিষ্ফোরণগত কারণে স্বর্গের আয়তন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হতে পারে।

বৈকুণ্ঠ স্বর্গ

বিষ্ণু হলেন পালনকর্তা। মহান স্রষ্টা ব্রহ্মার স্বর্গের পর পালনকর্তা বিষ্ণুর স্বর্গের স্থান। বিষ্ণুর স্বর্গের নাম হল বৈকুণ্ঠ। এ স্বর্গ হবে স্বর্ণ দিয়ে তৈরী। এর পরিধি হবে ৮০ হাজার মাইল।

হিন্দু ধর্মে ও ধর্মগ্রন্থে স্বর্গ এবং নরক উভয়টির উল্লেখ আছে। মৃত্যুর পর ৪ প্রকার স্বর্গীয় সুখ এবং শান্তির আনন্দ পাওয়া যাবে। সর্ব নিম্ন সুখ-শান্তি হবে বিভিন্ন দেবতাদের স্বর্গে আশ্রয় প্রাপ্তি।

www.nagorikpathagar.org

দেব স্বর্গ

হিন্দু ধর্মে স্বীকৃত এবং পূজ্য সকল দেবতারই নিজস্ব স্বর্গ আছে। দেবতাদের নিজস্ব স্বর্গ তাদের নিজস্ব অনুসারীদের জন্য। যে যেই দেবতার পূজা করবেন, তিনি ঐ দেবতার স্বর্গে স্থান লাভ করবেন। দেবতাদের স্বর্গের শ্রেণী বিভাগ আছে। একাধিক দেবতার পূজা করলে একাধিক স্বর্গপ্রাপ্তিরও সম্ভাবনা আছে।

দেবত্বে উন্নয়ন

দেবতাদের স্বর্গের স্থান পাওয়ার জন্য প্রথম জন্মে উন্নততর সৎ কর্মের প্রয়োজন আছে। ২য় শ্রেণীর স্বর্গপ্রাপ্তি হবে দেবত্বে উন্নীত হওয়া। দুনিয়ার প্রথম জীবনে যেমন বিভিন্ন স্তরের পূজারী হওয়া সম্ভব, সৎ কর্মের ফলে পরবর্তী জীবনে দেবত্বে উন্নীত হওয়াও সম্ভব। যারা পৃথিবীর জীবনে অশ্বমেদ যজ্ঞের মত বা অনুরূপ কর্ম সম্পাদন করবেন, তারা উন্নীত হবেন ইন্দ্রের স্তরে। ইন্দ্র হলেন দেবরাজ।

দ্বিতীয় স্তরের স্বর্গ

প্রথম জীবনের পর পরবর্তীতে দেবত্বে উন্নীত হওয়ার মেয়াদ হবে স্বল্পকালীন। কিছুকাল স্বর্গে দেবতা হিসাবে বিরাজ করার পর তাদেরকে এ পৃথিবীতে পুনজন্ম নিয়ে আসতে হবে। এ জন্মে যদি তারা নিষ্পাপ থাকেন এবং পূর্ববর্তী জন্ম অপেক্ষা অনেক বেশী পূণ্য কর্ম করেন, তবে পরবর্তী জীবনে বা ৩য় স্তরে পূজারীগণ উন্নীত হবেন। দ্বিতীয় স্তরে তারা হয়েছিলেন স্বর্গের দেবতাদের ন্যায় একটি স্বর্গের মালিক।

তৃতীয় স্তরের স্বর্গ

তৃতীয় স্তরে স্বর্গবাসীগণ দেবতাদের বন্ধু হিসাবে গণ্য হবেন। এ স্তরে তাদের মর্যাদা এবং সুখ-শান্তি পূর্ববর্তী দুই স্তর অপেক্ষা বেশী হবে। জন্ম এবং জন্মান্তরের পর তাদেরকে পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসতে হবে। পৃথিবীতে এই তৃতীয় জন্মে তাদের পদমর্যাদা হবে প্রথম দুই স্তরের জন্ম থেকে উন্নততর স্তরের।

স্বর্গ দর্শনের মাধ্যমে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য, ইত্যাদি হিসাবে জন্ম ভিত্তিক সামাজিক মর্যাদা ও জীবনের যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী জীবনের কর্মফলের উপর ভিত্তি করে স্বর্গ লাভ হয়ে থাকে।

পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলন

চতুর্থ জন্মে যারা ভাল কাজ করবেন তাদের মৃত্যুর পর তারা পূর্ববতী জীবনে উন্নততর মর্যাদা পাবেন। সেটা হল পরম ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সাথে মিলন। এটা অনেকটা আল-কোরানের আয়াত- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না লিল্লাহি রাজিউনের মত। যার কাছ থেকে আমরা এসেছিলাম। তাঁর কাছে হবে প্রত্যাবর্তন।

সমাপ্ত

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থপঞ্জী
ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম

০১. অমৃতত্ত্বানন্দ, স্বামী (অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা) শ্রীম'ভগবদ্ গীতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৭৯। শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন, দিনাজপুর, বাংলাদেশ।

০২. আলী, মাওলানা সৈয়দ হামীদ, "হিন্দু মত আত্তর তাওহীদ"।

০৩. আহমদ, সা'দ, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দাওয়াত ও আজকের মুসলমান, ১৯৭৬ খ্রীঃ, পৃ. ৩১, বই কিতাব প্রকাশনী, ৬৫, প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১।

০৪. ইউনুস, আ. খ.ম., মরনোত্তর জীবন সম্পর্কে ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম , (Islam and Hinduism on Life After Death) ২০০৩ খ্রীঃ, পৃঃ ১৫১, এম, ওয়াই খান, বাড়ী নং- ৩২ (এফ-৫), সড়ক, ৭, ধানমন্ডি (আ/এ), ঢাকা-১২০৫।

০৫. ইঞ্জিল শরীফ এন্ড দি নিউ টেস্টামেন্ট (বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯০৮, প্রকাশক বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ৩৯০ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১২২৭।

০৬. ইব্রাহীম খাঁ, মুসলিম জাহানে সংস্কার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা, পৃঃ ১৮; সংস্করণ, ১৯৭৯। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ৬৭ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১।

০৭. ইসলাম, এবিএম নূরুলঃ বাংলাদেশে অমুসলিম মিশনারীদের তৎপরতা, পৃঃ সংখ্যা ৭১, খ্রীঃ ১৯৮৫, কাউন্সিল ফর ইসলামিক সোসিও কালচারাল অরগেনাইজেসন (সিসকো), বিশ্ব ইসলাম মিশন কোরআন সুন্নী, ১২৫ লেক সার্কাস, ঢাকা-৫।

০৮. ইসলাহী, মাওলানা আমিন আহসান, দাওয়াতে দ্বীন ও তার কর্মপন্থা, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা, ২১০, আধুনিক প্রকাশনী, ২৫ শিরিষ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

০৯. উপাধ্যায়, ধর্মাচার্য অধ্যাপক ডঃ বেদ প্রকাশ, বেদ পুরানে আল্লাহ ও হযরত মুহাম্মদ (বাংলা অনুবাদ), পৃঃ ১২৮, ইসলামী সাহিত্য প্রকাশনালয়, ৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

১০. উপাধ্যায়, সত্যান্বেষী অধ্যাপক ডঃ বেদ প্রকাশ, কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব, ইসলামী সাহিত্য প্রকাশনালয়, পৃঃ ১৬০, ২০০৮ খ্রী. ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

www.nagorikpathagar.org

১১. উসমানী, মাওলানা শামস নাভেদ; আগার আব বী না জাগে তু, রোশনী পাবলিশিং হাউজ, বাজার নাসরুল্লাহ খান, রামপুর, ইন্ডিয়া, ২৪৪৯০১।
১২. কুতুব, মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ইসলাম প্রচার ও মুসলমানদের দায়িত্ব, ১৯৯৩ খ্রীঃ, পৃঃ ২৩, আঞ্জুমানে হেদায়তুল উম্মাত, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫।
১৩. খায়ের, খন্দকার আবুল, "অমুসলিমদের প্রতি মহা সত্যের ডাক", পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০, খন্দকার প্রকাশনী, ৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
১৪. খুরশিদ আহমদ, ইসলামের আহ্বান, অনুবাদক ঃ নুরুল আমিন জাওহার, পৃঃ সংখ্যা-২৭৭, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৫। প্রকাশকঃ পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০।
১৫. চারু চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, দেববাণী।
১৬. চক্রবর্তী, শ্রী শিবশঙ্কর, দেবদেবীর পরিচয় ও বাহন রহস্য, ৪র্থ মুদ্রণ, ২০০৫ খ্রী, পৃ. ১১৩, জ্ঞান-শিখা গ্রন্থালয়, শ্রী শ্রী ভোলানাথ গিরি আশ্রম মার্কেট, ১২ কে.এম.দাস লেন, টিকাটুলি, ঢাকা-১২০৩, মূল্য-৭০ টাকা।
১৭. চৌধুরী, সৈয়াদ আহমাদ, খৃষ্টান মিশনারী ও বিভ্রান্ত মুসলমান, পৃঃ ৩৩; বিশ্ব ইসলাম মিশন কুরাআনী সুন্নী, জমিয়াতুল মুসলেমীন, হেজবুলাহ, ১২৫ লেক সারকাস, কলাবাগান, ঢাকা-৫।
১৮. চৌধুরী, সৈয়দ আহমদ, প্রচলিত খৃষ্টবাদ ও বার্নাবাসের ইঞ্জিল, ৩য় সংস্করণ ১৯৮৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৮, বিশ্ব ইসলাম মিশন কোরআনী সুন্নী, ১৯/৪ বাবর রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-৭।
১৯. জিহাদী, মাওলানা আবুল বশর, কেন মুসলমান হলাম (Why We Embrac Islam ?), প্রথম খন্ড, খৃঃ ১৯৯৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৪, (দুই শতাধিক মনীষীর কাহিনী)। প্রকাশকঃ কুরআন হাদীস রিসার্স সেন্টার (ফুরফুরা শরীফের গবেষণা প্রতিষ্ঠান), মারকাজে ঈশায়াতে ইসলাম, দারুস সালাম,মীরপুর, ঢাকা-১২২৮।
২০. তথাগতানন্দ, স্বামী, মহাভারত কথা, ১ম সংস্করন, পৃঃ ২৭৫, প্রকাশক, স্বামী মুমুক্ষানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০,০০৩।
২১. তথাগতানন্দ, স্বামী, রামায়ন কথা, ২য় সংস্করণ, একাদশ পুনর্মুদ্রণ, পৃঃ ১৬০; প্রকাশক স্বামী মুমুক্ষানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয, ১ উদ্বোধণ লেন, বাগবাজার, কলকাতা ৭০০,০০৩।
২২. তিওয়ারী, কমলাকান্ত, "কলি যুগের অন্তিম ঋষি"।

www.nagorikpathagar.org

২৩. দীদাত, আহমদ, আহমদ দীদাত রচনাবলী, (অনুবাদক- ফজলে রাব্বী ও মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, ২য় সংস্করণ, ২০০৪, পৃঃ ২৫২, প্রকাশক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
২৪. নির্বেদানন্দ, স্বামী, "হিন্দু ধর্ম", ৭ম মুদ্রণ, ২০০৫, পৃঃ সংখ্যা ২৩৫, রাম কৃষ্ণ মিশন, কলিকাতা স্টুডেন্টস হোম, বেলগড়িয়া, কলিকাতা। বন্দোপধ্যায়, হরিচরণ, বাংলা শব্দ কোষ, নিউ দিল্লী।
২৫. নাদভী, সাঈয়েদ সুলাইমান, আরব আউর হিন্দ কি তায়াল্লুকাত (উর্দু)।
২৬. ফাতহুল কাদীর।
২৭. বাল্মীকি : রামায়ণ, হেমচন্দ্র ভট্টচার্য গদ্যানুবাদিত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০৭, তৃতীয় রাজ সংস্করণ, ২০০৪ খৃঃ, প্রকাশক, তুলি কলম, ১-এ কলেজ রোড, কলকাতা-৯।
২৮. বড়ুয়া, সুদর্শন, ত্রিপিটক পরিচিতি, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, খৃঃ ২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮৮, প্রকাশিকা, শ্রীমতি প্রভাবর্তী বড়ুয়া, রাঙুনিয়া, চট্টগ্রাম।
২৯. বড়ুয়া, সুদর্শন, প্রশ্নোত্তরে ত্রিপিটক, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১৪, দ্বিতীয় খন্ড, প্রকাশক, প্রভাবতী বড়ুয়া, রাঙুনিয়া, চট্টগ্রাম।
৩০. বাল্মীকি : রামায়ন, হেমচন্দ্র ভট্টচার্য গদ্যানুবাদিত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০৭, তৃতীয় রাজ সংস্করণ, ২০০৪ খৃঃ, প্রকাশক, তুলি কলম, ১-এ কলেজ রোড, কলকাতা-৯।
৩১. বিবেকানন্দ, স্বামী, গীতা প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৮, খৃঃ ২০০৫, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা; ত্রয়োদশ পুনমুদ্রর্ণ; ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা ৭০০, ০০৩।
৩২. বিবেকানন্দ, স্বামী, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ট খন্ড।
৩৩. বিবেকানন্দ, স্বামী, গীতা প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৮, খৃঃ ২০০৫, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা; ত্রয়োদশ পুনমূদ্রণ; ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০,০০৩।
৩৪. বিবেকানন্দ, স্বামী স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ খন্ড।
৩৫. বুকাইলি, ডঃ মরিস (মূল), আখ্তার-উল-আলম (অনুবাদক) ছোটদের বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২১৭, প্রকাশ, ১৯৯৫, প্রকাশক, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ৩৮/২/ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
৩৬. ভট্টচার্য, আবুল হোসেন, আর্তনাদের অন্তরালে, ইসলাম প্রচার সমিতি, ১৯৮১ খ্রী. পৃঃ ৬০,, ১২৯ মীরপুর রোড, কলাবাগান, ঢাকা-৫।

www.nagorikpathagar.org

৩৭. ভট্টচার্য, আবুল হোসেন, আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করিলাম, ৩য় সংস্করণ, ১৪০০ হি./১৩৮৬ বাং, পৃ. সংখ্যা-২৮০, ঢাকা-১৯৯২ প্রকাশিকা: জাহানারা বেগম, ৬ সেন্ট্রাল রোড, লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা-৫, মূল্য টাকা-১৫।
৩৮. ভট্টচার্য, আবুল হোসেন, একটি সুগভীর চক্রান্ত ও মুসলমান সমাজ, ১৩৮৪ বাংলা, হিঃ ১৩৭৮, পৃঃ সংখ্যা ৩২, ইসলাম প্রচার সমিতি, ৭নং সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা।
৩৯. ভট্টচার্য, আবুল হোসেন, বিড়াল বিভ্রাট, ১৯৮১, পৃঃ ৪২, ইসলাম প্রচার সমিতি, ১২৯, মীরপুর রোড, কলাবাগান, ঢাকা-৫।
৪০. ভট্টচার্য, আবুল হোসেন, (প্রাক্তন পুরোহিত সুদর্শন ভট্টচার্য) মূর্তি পূজার গোড়ার কথা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রী, ঢাকা, পৃঃ ১৩৬, প্রকাশক– এ.এন.এম. শামসুদ্দোহা, মিম প্রকাশন, ৬ কলাবাগান, লেক সার্কাস, ঢাকা-১২০৫।
৪১. ভট্টচার্য, আবুল হোসেন, শেষ নিবেদন, ১৯৭৯ খ্রী., পৃঃ ১৭৬, জাহানারা খাতুন, ৬ নং সেন্টাল রোড, লেক সারকাস (কলা বাগান) ঢাকা-২।
৪২. ভূঞা, মো. আবুল কাসেম, পর ধর্ম গ্রন্থে শেষ নবী।
৪৩. মহা ভারত, কালী প্রমন্ন সিংহ অনুদিত।
৪৪. মহা ভারত, সমদেব সম্পাদিত, দেব সাহিত্য কুঠির, কলিকাতা।
৪৫. ভগবত গীতা।
৪৬. মওদুদী, সাইয়্যেদ আবুল আলা, ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি, ১৯৭১ খ্রী., পৃঃ ৪৭, ইসলামিক পাবলিকেশান্স লিমিটেড, ১৬ বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০।
৪৭. মহাভারত, সংক্ষিপ্ত (আদিপর্ব,সভাপর্ব, বনপর্ব, বিরাট পর্ব, উদ্যোগ পর্ব, ভীষ্ম পর্ব এবং দ্রুত পর্ব), অনুবাদিকা গায়ত্রী বন্দোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮৭২, প্রকাশক, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ২৭৩,০০৫; ইন্ডিয়া।
৪৮. মহাভারত, সংক্ষিপ্ত (দ্বিতীয় খন্ড), পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৭০৬, অনুবাদিকা, গায়ত্রী বন্দোপাধ্যায়, গোবিন্দ ভবন, ১৫১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০,০০৭।
৪৯. মান্নান, মাওলানা আবদুলাহ আল মামুন আরিফ, কেন মুসলমান হলাম? (তৃতীয় খন্ড), পৃঃ ২৮৪, খৃঃ ১৯৯৯, কুরআন হাদীস রিসার্স সেন্টার, মারকাজে ঈশায়াতে ইসলাম, দারুস সালাম, মীরপুর, ঢাকা-১২২৮।
৫০. মুবারক পুরী, কাজী আতহার, নারজিল সে পাখিল তক (উর্দু)। মা আরিফ, ৫/৮৯।

www.nagorikpathagar.org

৫১. মেহেরুন্নাহ, মুন্সী মোহাম্মাদ, বিধবা গঞ্চনা ও বিষাদ ভান্ডার (বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত), ১৩৩৬ বাংলা, পৃঃ ১৪২, মুনশী মুহাম্মাদ মেহেরুলাহ রিসার্চ একাডেমী, মাতুয়াইল, কোনাপাড়া, ডেমরা রোড, ঢাকা।

৫২. মেহেরুলাহ, মুনশী মোহাম্মদ "মুনসী মেহরুল্লাহ রচনাবলী" প্রথম খন্ড, সম্পাদক, নাসির হেলাল, ১৯৯৯ খ্রীঃ, পৃঃ ২৭৪, মুনসী মেহেরুলাহ ফাউন্ডেশন, ১/জি/৯, মীরবাগ, ঢাকা-১২১৭।

৫৩. মেহেরুলা, মুনশী মোহাম্মদ, রদ্দে খ্রীষ্টান ও দলীলুল ইসলাম (খ্রীষ্টান ধর্মের অসারতা) ১৯৯৭ খ্রীঃ, পৃঃ ৪৩, মুনশী মুহাম্মদ মেহেরউল্ল্যাহ একাডেমী, মাতুয়াইল, কোনাপাড়া, ডেমরা, ঢাকা-১৩৩৬।

৫৪. মেহেরুলাহ, মুনশী মোহাম্মদ, হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা, ১০ম প্রকাশ, ২০০৭, পৃঃ ১৫০, মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুলাহ রিচার্স একাডেমী, ৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

৫৫. রহমান, মুহাম্মদ লুৎফর, (অনুবাদক) কেন ইসলাম গ্রহণ করিলাম ? (Islam our Choice) পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১৬। ১৩৯৯ হিজরী। মূল গ্রন্থ প্রকাশনায় বেগম আয়েশা বাওয়ানী ওয়াক্ফ, করাচী, ইসলাম প্রচার সমিতি, ১২৯, মীরপুর রোড, কলাবাগান, ঢাকা-৫।

৫৬. রায় ড. কানাই লাল, বেদ রহস্য (সানুবাদ ঈশোপনিষদ), খৃঃ ২০০৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫২। প্রকাশকঃ জ্ঞানশিখা গ্রন্থালয়, শ্রী শ্রী ভোলানন্দ গিরি আশ্রম মার্কেট, ১২, কে, এম, দাস লেন টিকাটুলি, ঢাকা-১২০৩।

৫৭. শর্মা, ডঃ আর, এস, (রাম শরন) Communal History and Ram's Ayodhya এর অনুবাদ : "রাম মন্দির না বাবরী মসজিদ"? ৫ম, প্রকাশ, ২০০২ খ্রী. পৃঃ ১১০, প্রকাশক, মোহাম্মদ শামসুজ্জামান, মুনশী মোহাম্মাদ মেহেরুলাহ রিচার্স একাডেমী, মাতুয়াইল, কোনাপাড়া, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬২।

৫৮. শামছুল হক ফরিদপুরী, তাবলীগ ও ইসলামী জিন্দেগী, ২০০২ খ্রী. পৃ. ৬৪, বিশ্ব কল্যাণ পাবলিকেশন্স, ৪১/৪-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

৫৯. হাই, শেখ মুহাম্মাদ আবদুল হাই, সত্যের সন্ধানে (Part of the Translation of "In Search of the Truth) প্রথম খন্ড, পৃ. ২৬৭, খ্রী. ১৯৯৬, মদীনা পাবলিকেশন্স, ৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

৬০. শায়খুল উবুদিয়া ইমাম সাইয়েদ মুহাম্মদ আব্দুলাহ ইবনে আবদুহু আল হোসাইনী: জগৎগুরু মোহাম্মদ (সা.) (প্রথম খন্ড), অনুবাদক ঃ মোহাম্মদ সোলায়মান ফারুকী, ড. মোহাম্মদ মুহসীন উদ্দিন, ড. এ. কে. এম.

www.nagorikpathagar.org

মুহিববুল্লাহ; রেনেসাঁ পাবিলিকেশন্স, ঢাকা, পৃঃ সংখ্যা-২৩১। প্রকাশঃ ২০০৫ খ্রীঃ, ২৫২, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫।

৬১. সরকার, সুধীর চন্দ্র, পৌরাণিক অভিধান, কলিকাতা, ১৩২৫ বাং।

৬২. সাঈদী, দেলওয়ার হোসেন, বিশ্বমানবতার মুক্তিসনদ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৯ খ্রী. পৃঃ ৩১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৬৩. সিদ্দিকী, মাওলানা মুহাম্মাদ কলীম, আপনার আমানত, অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ মুসা, পৃঃ ৩২, ২০০৬ খ্রীঃ, জমিয়াতে শাহ ওয়ালী উলাহ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

৬৪. সিদ্দিকী, মাওলানা মুহাম্মাদ কলীম, দাওয়াতের উপহার, (আরাম গানে দাওয়াত), অনুবাদক, আবূ সাঈদ ওমর আলী, ২০০০ খ্রী., পৃঃ ১৭৬, মজলিস নাশরিয়াত-ই-ইসলাম, বাংলাদেশ, মুহাম্মাদ ব্রাদার্স, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

৬৫. সিদ্দিকী, প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আহমাদ, অধ্যাপক আরবী পার্শি বিভাগ, এলাহাবাদ, ইউনিভার্সিটি, ইসলাম মে কালিম ফারা, করাচী, ১৯৫৯ ইং।

৬৬. হাই, আবু সালীম মোঃ আবদুল, অনুবাদকঃ জুলফিকার আহমদ কিসমতি, আদর্শ কিভাবে প্রচার করতে হবে, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৬ খ্রীঃ, পৃঃ ৮৮, মূল উর্দুতে, পলাশ পাবলিকেশান্স, ১৩ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১।

৬৭. হাসান রশিদুল; জেলা জজ, ইসলাম প্রচার (মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং জীবন ব্যবস্থার আলোতে), পৃঃ ৩৪, ২য় সংকরণ, ১৯৭০ খ্রী.।

Bibliography

1. Ambedkar, Dr. B.R.; Riddle of Rama & Krishna, Bangalore, 1988.
2. Badawi, Dr. Jamal A., The Status of Women in Islam, Riyadh, 1980.
3. Basham, A.L., The Wonder That Was India, Calcutta, 1992.
4. Bhuiyan Mahbubur Rahman, The Propagation Policy of Islam, pp-44, year-1980, Islamic Cultural Centre, Chittagong Division, Chittagong.
5. Briha Daranyaka Upanishada.

www.nagorikpathagar.org

6. Chaturvedi, M.D., Hindusim, The Eternal Religion, Bombay, 1992.
7. Dewitt, Williams Atharba Veda.
8. Dubois, A.J.A., Hindu Manners, Customs & Ceremonies.
9. Encyclopaedia of Religion and Ethics, ed, James Hastings, Edinburg, 1967. Vols. VI, VI and XII, New York, 1967.
10. Encyclopaedia of Britanica.
11. Fazlie, Murtahin B. Jasir, Radiance : Sayings of the Prophet, Jeddah, 1993.
12. Fazlie, Murtahim B. Jasir Murtahin B. Jasir, Hinduisn and Islam, A Comparative Study, Abul Qasim Publshing House Jeddah, Saudi Arabia, 1997.
13. Fazlie, Murtahin B. Jasir, Hindu Chauvinism and Muslims in India, Jeddah, 1995.
14. Galwash, Dr. Ahmad A., The Religion of Islam, Doha, 1973.
15. Gandhi, M.K., Hindu Dharma, New Delhi, 1991, Bombay, 1991.
16. Griffith, Ralph H. Rig Veda New York, 1992.
17. Grifith, Ralph, H. Rigveda, (Translation, New York, 1992)
18. Hardons, john, Religions of the World Vol. V.
19. Hayee S.K. MD. Abdul, In Search of the Truth, A.D. 1992, pp, 230, published by Md. Abdul Hayee, Consultant, Civil Engineer, Faculty of Education, King Abdul Aziz University, Al Madina Al Munawwara, KSA.
20. Hasan Dr. Muhammad Khalifa, The Relationship between Islam and other Religions, United Printing, Publishing and Distributing.
21. Husain, Syed Sajjad, A Young Muslim's Guide to Religions in the World, Bangladesh Institute of Islamic Thought, Kataban Mosque Complex, Dhaka, 1992.
22. Hitti, Professor Philip K. Hitti, History of the Arabs.
23. Huq Fazlul, Gandhi Saint or Sinner !, Bangalore, 1992.
24. Israil Muhammad, Hinduism As Contrasted With Islam, Patna, 1897.

www.nagorikpathagar.org

25. Jagannathan, Sakunthala, Hinduism, An Introduction, Bombay, 1991.
26. Landis, Benson Y., World Religions, New York.
27. Max Muller, Sacred Books of the East, Vol. I.
28. Nehru, Jawaharlal, The Discovery of India, New Delhi, 1983.
29. Muhiyauddin, Muhammad Ali, A Comparative Study of the Religions of Today, New York, 1985
30. Muhammad T., "One God, One Creed, Discover Islam Manama, Bahrain.
31. Oman, John Campbell, The Brahmans, Theists and Muslims of India, Delhi, reprint, 1973.
32. Pancha Vinsha Brahmana.
33. Rahul Samkrittayan, Perspectives of the World.
34. Penguin Dictionary of Religions, The London, 1984.
35. Poole, Stanley Lane, Speeches and Talks of Prophet Muhammad, London, 1982.
36. Rajshekar, V.T., Dalit, The Black Untouchables of India, Bangalare, 1979, Atlanta/Ottawa, 1987.
37. Rajshekar V.T. India's Muslim Problem, Bangalore, 1993.
38. Ramayana of Valmiki, The, Tr anslation, Hari Prasad Shastri, London, 1959.
39. Rawlinson, H.G., Intercourse Between Worlds, Cambridge, 1926.
40. Rig Veda, The, tr. by Ralph T.H. Griffith, New York, 1992.
41. Sam Krityayan, Rahul, Perspectives of the world.
42. Prof Shaha, A.B., Religion and Society in India, 1983.
43. Sandeela, F.M. "Islam, Christianity and Hinduism," Delhi, 1990.
44. Sharma, S.R., The Making of Modern India, Bombay, 1951.
45. Shastri, Shankaranand, My Memories and Experiences of Babasaheb Dr. B. R. Ambedkar, Faizabad, 1989.
46. Singh, Khushwant, India, An Introduction, New Delhi, 1990.

www.nagorikpathagar.org

47. Smith, Reverend Bosworth, Muhammad and Mohammedanism.
48. Theertha, Swami Dharma, History of Hindu Imperialism, Madras, 1992.
49. Trumbull, Robert, As I See India, London, 1957.
50. Valat, V.V.K. Through Rig Veda.
51. Balmiki, Ramayana, Tr. Rajshekhar Basu, Calcutta, 1396 B.E.
52. Wilkins, W.J., Hindu Mythology, New Delhi, reprint, 1993.
53. Wilkins, W.J. Modern Hinduism Yondon, 1975.

এজেডএম শামসুল আলম-রচিত
কয়েকটি পুস্তক-পুস্তিকা

১. আল্লাহু তা'য়ালা ও তার সত্ত্বা, পৃঃ ৯৬, মাম্মী প্রকাশনী, ২০০৩ খ্রী।
২. আল-কুরআনের বাণী, পৃঃ ১০৮, মাম্মী প্রকাশনী, ২০০৩ খ্রী।
৩. ঈমান ও তাঁর মৌলিক উপাদান, অনুবাদকঃ শহীদ আকন্দ, পৃঃ ১৪৪, বাড পাবলিকেশন্স, ২০০৩ খ্রী।
৪. হায়াত, মউত, দৌলত, অনুবাদক ঃ শহীদ আকন্দ, পৃঃ ১০৪, মুহাম্মাদ পাবলিকেশন্স, ২০০৮ খ্রী।

তাবলীগ ও দাওয়াহ

৫. তাবলীগ ও ফজিলত, অনুবাদক শহীদ আকন্দ, পৃঃ ১৫২, বাড পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮ খ্রী।
৬. তাবলীগ ও দাওয়াহ, অনুবাদক শহীদ আকন্দ, পৃঃ ৪৪০, ই. ফা.বা. প্রকাশনা, ২০০৪ খ্রী।

সালাত-সিয়াম

৭. সালাত ও সিয়ামের তাৎপর্য, পৃঃ ১২৮, নব তরঙ্গ, ২০০০ খ্রী।
৮. রোজার তাৎপর্য, পৃঃ ৬২, ই. ফা. বা. প্রকাশনা, ২০০৩ খ্রী।
৯. হজ্জের তাৎপর্য, পৃঃ ৯৬, মল্লিক এন্ড কোং, ১৯৯৩।

www.nagorikpathagar.org

মহানবীঃ

১০. মহানবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা.), পৃঃ ১৬৮, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ১৯৯৮ খ্রী।

১১. মহানবী পরিবার, পৃঃ ১৭৬, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৫ খ্রী।

১২. শিশুদের মহানবী (সাঃ), পৃঃ ৭০, ই. ফা.বা. প্রকাশনা, ১৯৮৬ খ্রী।

১৩. মহানবী (সাঃ) ও শিশু, পৃঃ ৪০, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ১৯৯৫ খ্রী।

সাহাবীঃ

১৪. আশারা মুবাশ্‌শারা (দশজন বিশিষ্ট সাহাবী), পৃঃ ১২৬, কামিয়াব প্রকাশন, ২০০৪ খ্রী।

১৫. মহিলা সাহাবী, পৃষ্ঠা-১৫২, কামিয়াব প্রকাশন, ২০০৭ খ্রী।

১৬. হযরত আলী (রা.), এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পত্র, পৃঃ ৩৫, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ১৯৮৩ খ্রী।

১৭. কৃতদাস থেকে সাহাবী, পৃঃ ১২৮, মাম্মী প্রকাশনী, ২০০৩ খ্রী।

১৮. ইতিহাসে উপেক্ষিত আবূ জর (রা.), পৃঃ ৭২, মুক্তি প্রকাশনী, ১৩৭৫ বাংলা

১৯. বিপ্লবী সাহাবী আবূ জর গিফারী (রা.), পৃঃ ৬৬, মুক্তি প্রকাশনী ১৯৬৭ খ্রী।

সোনালী জীবনঃ

২০. সাহাবীদের সোনালী জীবন-১, পৃঃ ১৬০, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৪ খ্রী।

২১. সাহাবীদের সোনালী জীবন-২, পৃঃ ১৬৮, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৪ খ্রী।

২২. সাহাবীদের সোনালী জীবন-৩, পৃঃ ১৬৮, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৫ খ্রী।

সংস্কৃতিঃ

২৩. ইসলাম ও সঙ্গীত চর্চা পৃঃ ৬২, মুর্শেদী প্রেস, সুনামগঞ্জ, ১৯৬৭ খ্রী

২৪. বাঙ্গালী সংস্কৃতি, পৃঃ ১৪৪, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০২ খ্রী।

২৫. মুসলিম সংস্কৃতি, পৃঃ ২০৮, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০২ খ্রী।

২৬. পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, পৃঃ ১৫৮, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৫ খ্রী।

২৭. মসজিদ পাঠাগার, পৃঃ ৬০, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ২০০৪ খ্রী।

পারিবারিক মূল্যবোধঃ

২৮. পরিবার পরিজন, পৃঃ ৮৪, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৩ খ্রী।

২৯. বিবাহ ও প্রেম, পৃঃ ১৬০, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৩ খ্রী।

৩০. বিবাহ ও যৌনতা, পৃঃ ১৬০, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৩ খ্রী।

www.nagorikpathagar.org

৩১. নারীর শ্রেষ্ঠত্ব, পৃঃ ১৭৬, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৩ খ্রী।

জীবনী

৩২. হযরত শায়খ শাহজালাল (রাঃ), পৃঃ ২৭৪, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৯৬ খ্রী।

৩৩. নওয়াব সৈয়দ শামসুল হুদা, পৃঃ ৪০, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ১৯৮৭ খ্রী।

৩৪. মেজর আবদুল গণী, পৃঃ ৩২, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ১৯৮৭ খ্রী।

৩৫. শাহজালালের শিষ্যগণ, পৃ ৪১, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ১৯৮২ খ্রী।

ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্সঃ

৩৬. ইসলামী ব্যাংকিং, পৃঃ ১৬০, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ১৯৯৯ খ্রী।

৩৭. ইসলামী ইন্স্যুরেন্স (তাকাফুল), পৃঃ ১৭৬, মাম্মী প্রকাশনী, ২০০১ খ্রী।

ইসলামী রাষ্ট্র

৩৮. ইসলামী রাষ্ট্র, পৃঃ ২৮৫, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ১৯৯৫ খ্রী।

৩৯. আফগান তালিবান, পৃঃ ৪০, বাড পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭ খ্রী।

৪০. আফগানিস্তান ও তালিবান, পৃঃ ১৪৪, বাড পাবলিকেশন্স, ২০০১ খ্রী।

ইসলামী অর্থনীতিঃ

৪১. ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা, পৃঃ ২২৬, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ২০০৩ খ্রী।

৪২. ইসলামী অর্থনীতিতে ভোগ ব্যবস্থার স্বরূপ, পৃঃ ৪৪, গিফারী সোসাইটি প্রকাশনা, ১৯৬৭ খ্রী।

৪৩. জমি ক্রয়-বিক্রয় বন্ধক, পৃঃ ১৬০, ঝিঙ্গে ফুল, ২০০৭ খ্রী।

পরিবার পরিকল্পনাঃ

৪৪. ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা (অনুবাদ); মূলঃ আবদেল রহীম উমরান, Family Planning in the Legacy of Islam পৃঃ ৩৫১, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল, ১৯৯৫ খ্রী।

শিক্ষাঃ

৪৫. মাদ্রাসা শিক্ষা, পৃঃ ১৯২, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০০ খ্রী।

৪৬. মহিলা মাদ্রাসা, পৃঃ ৩৪, আল ফালাহ প্রকাশনা, ১৯৯৩ খ্রী।

৪৭. মাসজিদ পাঠাগার, পৃঃ ৬০, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ২০০৪ খ্রী।

www.nagorikpathagar.org

৪৮. শিক্ষামূলক গল্প ও কাহিনী, পৃঃ ১৬০ সাজিদ প্রকাশনী, ২০০৮ খ্রী।
৪৯. ছোটদের ইসলাম, পৃঃ ৪৮, মাম্মী প্রকাশনী, ২০০০ খ্রী।
৫০. শিশু পালন, পৃঃ ১৪৩, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০১ খ্রী।

বর্ণ পরিচয়

৫১. বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ পৃঃ ৪৮, আলীফ পাবলিশার্স, ১৯৭৯ খ্রী।
৫২. বর্ণ পরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৬৮, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ১৯৮০ খ্রী।
৫৩. বর্ণ পরিচয়, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ৫৬, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ১৯৮২ খ্রী।
৫৪. ছবিতে বর্ণ পরিচয়, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ১৯৮১।

ইসলামী প্রবন্ধমালা

৫৫. ইসলামী চিন্তাধারা, পৃঃ ৮৯২, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ১৯৮১।
৫৬. ইসলামী প্রবন্ধমালা, পৃঃ ৬১০ ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ১৯৮৮।
৫৭. ইসলামী প্রবন্ধমালা, পৃঃ ৫৮৪, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ২০০৪ খ্রী।
৫৮. ইসলামী প্রবন্ধমালা, পৃঃ ৩০৪, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ১৯৮১।
৫৯. নির্বাচিত ইসলামী প্রবন্ধমালা, পৃঃ ৩১৬, মজিদ পাবলিকেশন, ২০০৫।

বিবিধ

৬০. ব্যবহারিক ইসলাম, পৃঃ ৩৮৬, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৯৬।
৬১. ক্যানসার রোগীর খাদ্য ও পথ্য পৃঃ ৪০, মুজিব পাবলিকেশন ২০০৫ খ্রী।
৬২. ব্যক্তিত্বের বিকাশ পৃঃ ২৬৪, কামিয়াব প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রী।
৬৩. চাকুরী, পদোন্নতি ও পেশাগত সাফল্য পৃঃ ৩০৯ কামিয়াব প্রকাশনী, ২০০২ খ্রী।
৬৪. অমুসলিমদের নিকট ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব, পৃঃ ২৫৭, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০১০।

ইংরেজীঃ

65. Message of Tableeg & Dawah Pp. 1390, I.F.B. Publication, 1993.
66. Islamic Thoughts, Pp. 1058, I.F.B. Publication, 1986.
67. Multiplex Thoughts Pp. 946, B.C.B.S. Ltd. 1990.
68. Family Values Pp. 304, B.C.B.S. Ltd. 1995.
69. The Mosque, Mosque Society, Pp. 44, 1979.
70. Mosque and the Youth, Pp 122, B.C.B.S. Ltd., 1999

www.nagorikpathagar.org

71. Mosque and Youth Activities in Indonesia, Hilful Fudhul Publication, 1999.
72. Abdul Quader Jilani R. Pp. 32, I.F.B. Publication, 1980
73. Al Hizra Centenary Celebrations Pp. 32, I.F.B. Publication, 1980
74. Islamic Public School Pp. 90, Hilful Fudhul Publication, 1991.
75. English Haraf Pp. 32, I.F.B. Publication, 1984
76. Islam & Family Planning Pp. 126, I.E.M., Family Planning Directorate, 1985
77. Consumption Pattern in Islamic Economy, Pp. 47, Hilful Fudhul Publication, 1999.
78. Entrepreneunal Savings Pp. 60, Hilful Fudhul Publication, 2000.
79. Adminstrative Policy Letter of Hazrat Ali (R.) Pp 40, Department of Forms & Publication, 1976.
&
Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 2011
80. Bureaucracy in Bangladesh Perspective Pp. 239, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd., 2011., BPATC, Savar, 1999.
81. Democracy and Election Pp. 239, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd., 1996.
82. Administration and Ethics, Pp. 180, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd., 1997.

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম ও হিন্দুধর্ম

এ.জেড.এম. শামসুল আলম

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম